# কুলদীপ নায়ার

# দি জাজ্‌মেণ্ট

ভাষান্তর ঃ অসীম মিত্র

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট । কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

Originally Published by Vikas Publishing House l
5, Ansari Road, New Delhi 110002, India
in the English language under the title
THE JUDGEMENT
( INSIDE STORY OF THE EMERGENCY IN INDIA )

১২ই আগষ্ট, ১৩৬৫

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

TO

THE PEOPLE OF INDIA

THE ONLY ONES WHO

COULD AND DID

## জরুরী অবস্থার নেপথ্য কাহিনী

উনিশ মাসের রাতের আতঙ্ক ॥ মারুতী কেচ্ছা ॥ টার্কম্যান গেটের বর্বরতা ॥ জরুরী অবস্থার সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের অকথিত কাহিনী ॥ মিসা বন্দীদের হত্যা ও নির্যাতনের কাহিনী ॥ ইনটেলিজেন্স বিভাগের কার্যকলাপ ॥ জে-পির অপ্রকাশিত বক্তব্য ॥ কেন নির্বাচন হল ? ॥ ইন্দিরার ভবিষ্যৎ এবং আরও অজস্র নেপথ্য কাহিনীতে ভরা বর্তমান ভারতের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চিত্র ।

# ১। স্বৈরতান্ত্রিকতার পথে

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের ভেতর ছোট্ট একটা ঘর। ঘরের আবহাওয়া বেশ ভারী। দু'দুটো টেলিপ্রিণ্টার তারই মধ্যে খট্‌-খট্‌, খট্‌-খট্‌ আওয়াজ করে চলেছে। যেন শব্দের স্রোত বয়ে চলেছে অবিরাম ধারায়। তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। এদিকে প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া ( পি টি আই ) এবং ইউনাইটেড নিউজ অব-ইণ্ডিয়া ( ইউ এন আই ) টেলিপ্রিণ্টারের মাধ্যমে খবর দিয়েই চলেছে। সাধারণতঃ ও বাড়ীতে টেলিপ্রিণ্টারের খবর বড় একটা কেউ দেখে না—দেখলেও ঐ রকম একটা বেখাপ্পা সময়ে তো নয়ই।

কিন্তু ১২ জুন ১৯৭৫-এ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানতম ব্যক্তিগত সচিব নীভুলনে কৃষ্ণ আগার শেষান অস্থির-ভাবে একবার এ-মেশিন আরেকবার ও-মেশিনের খবর দেখে চলেছেন। আর ঐ ছোট্ট ঘরটায় তখন বিরাজ করছে এক ভীতিজনক নীরবতা। টেলিপ্রিণ্টারের খট্‌-খট্‌ আওয়াজ কিম্বা টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং ধ্বনি যেন কিছুতেই ঐ ভীতিজনক পরিবেশকে সহজ করে তুলতে পারছিল না।

একটা বিশেষ খবর আজ আসবে এবং সেই খবরটি পাওয়ার জন্য শেষান অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তখনও সেই খবর আসে নি। তাই অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন শেষান। এটাই ছিল সেই ঐতিহাসিক দিন, যেদিন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জগমোহনলাল সিন্‌হা ১৯৭১ সালে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনের বিরুদ্ধে রাজনারায়ণ যে মামলা করেছিলেন তার রায় দেবেন। সকাল তখন প্রায় দশটা বাজে। এমন সময় এলাহাবাদ থেকে একটা জরুরী টেলিফোন কলে খবর এল যে, বিচারপতি এখনও তাঁর বাড়ী থেকে রওনা হন নি।

শেষানের মনে হয়, সিন্‌হা এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। প্রত্যেক মানুষেরই একটা মূল্য আছে, কিন্তু সিন্‌হা যেন সেই মূল্যের ঊর্ধে। তাঁর মূল্যায়ণ সহজ নয়। সিন্‌হাকে আকৃষ্ট করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোন চাপের সামনে তিনি কিছুতেই নতি স্বীকার করেন নি।

শ্রীমতী গান্ধীর নিজ রাজ্য উত্তরপ্রদেশ থেকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্য এলাহাবাদ গিয়েছিলেন। কথায় কথায় তিনি বিচারপতি সিন্‌হার কাছে প্রস্তাব করেছিলেন লাখ পাঁচেক টাকার বিনিময়ে তিনি ঐ রায়ের হেরফের করতে পারবেন কি না। সিন্‌হা ঐ প্রস্তাবের জবাব দেবার প্রয়োজনবোধ করেন নি। পরে তাঁর নিজস্ব বেঞ্চের সহযোগী একজন বিচারপতি সিন্‌হাকে বলেন, তিনি আশা করেছেন যে এই ঐতিহাসিক "রায় দানের পর" সিন্‌হার জন্য সুপ্রীমকোর্টের আসন পাকা হয়ে যাবে। সিন্‌হা কেবল রাগতভাবে ওই সহকর্মীর দিকে তাকালেন।

এই রায় যাতে দেরীতে দেওয়া হয় সেজন্যও অনেক চেষ্টা চলে, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব প্রেমপ্রকাশ নারায়ণ দেরাদুনে গিয়ে উত্তরপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করেন। শ্রীনারায়ণ তাঁকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ার কথা আছে। তার আগে যেন নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার রায় দান করা না হয়। কেননা মামলার রায় যদি প্রতিকূল হয় তাহলে বিদেশে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে। উত্তরপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এই অনুরোধের কথা সিন্‌হাকে জানিয়ে দেন। বিচারপতি সিন্‌হা এতে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আদালতের রেজিস্ট্রারকে ফোন করে বলেন, '১২ জুন ওই মামলার রায় দেওয়া হবে। একথা যেন ঘোষণা করা হয়।' সিন্‌হা এর আগেই কংগ্রেস দলের একটি অনুরোধ রেখেছেন। তাঁরা বলেছিলেন, গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচন হবে ৮ জুন তারিখে। তার আগে রায় বেরোলে নির্বাচনের উপর তার প্রভাব পড়তে পারে। অতএব রায় যেন তার পরে দেওয়া হয়। সিন্‌হা সে অনুরোধ রেখেছিলেন।

এই ঐতিহাসিক বিচারের রায় কী হবে সেকথা সেখানে বা অন্য কেউ জানতেন না। জানতেন কেবল বিচারপতি সিন্‌হা এবং তাঁর স্টেনোগ্রাফার। গোয়েন্দা বিভাগের সব চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের কয়েকজন লোক দিল্লি থেকে এলাহাবাদে এসেছিল। ভেবেছিল সিন্‌হার স্টেনোগ্রাফার নেশিরাম নিগমের কাছ থেকে কথা আদায় করবে। চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু পারে নি। যেমন গুরু তার তেমনি চেলা। এমন কি ভয় দেখিয়েও কোন কাজ হয় নি। ১১ জুন রাত থেকে নিগম এবং তাঁর স্ত্রী নিজ বাড়ী থেকে অন্তর্ধান করেছিলেন। তাঁদের কোন ছেলেপুলে ছিল না। তাই গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা নিগমের বাড়ীতে গিয়ে কারোই দেখা পায় নি। সব ফাঁকা।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সামনে তখন একটিই মাত্র আশার আলো ছিল। তা হ'ল সিন্‌হার বাড়ীর সামনে মোতায়েন করা একজন সাধুবাবা। ঐ গোয়েন্দা সাধুবাবা বিচারপতি সিন্‌হার ধর্মীয় মনোভাবের কথা জানতো। তাই সে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে জানিয়েছিল যে, "সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।" ওই গোয়েন্দা সাধুবাবা আরও কয়েকজন সাকরেদকে নিয়ে সিন্‌হার বাড়ীর পাঁচিলের বাইরে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু সিন্‌হা স্টেনোগ্রাফারকে কী টাইপ করতে বলেছেন সেকথা ঐ গোয়েন্দা জানতেই পারেনি; রায়ের যে অংশে 'করণীয় কাজের' নির্দেশ থাকে সেই অংশ ১১ জুন সিন্‌হা নিজে উপস্থিত থেকে টাইপ করান। তারপরই তিনি নিগমকে বলেন, তিনি যেন বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করেন।

সিন্‌হা মামলা সংক্রান্ত শুনানির সমস্ত নথিপত্র নিজের কাছেই রেখেছিলেন। মামলার শুনানি যখন চলে তখন মামলার গতি কোন দিকে যেতে পারে সেটা নির্ধারণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি দেখেন একদিক সম্পর্কে যদি তিনি দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন তাহলে অপর দিকেও আপনা হতেই সমসংখ্যক প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। চার বছর ধরে এই মামলার শুনানী হয়েছে এবং শুনানী শেষ হয়েছে ১৯৭৫-এর ২৩শে মে। তিনি এই সময় বাড়ীর বাইরে যান নি, এমন কি টেলিফোনেও কারও সঙ্গে কোন কথা বলেন নি।

শেষান আবেকবাব নিজের ঘড়িতে সময় দেখে নিলেন। তখনও টেলিপ্রিন্টারে খট্‌-খট্‌ করে যাজেবাজে খবর ছাপা হয়ে চলেছে। দশটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকী। এতক্ষণে সিন্‌হা নিশ্চয়ই হাইকোর্টে পৌঁছে গেছেন। কেননা তাঁর সময়ানুবর্তিতার কথা সকলেই জানে। তিনি সত্যিই তখন হাইকোর্টে পৌঁছে গিয়েছিলেন। পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক পাতলা গড়নের বিচারপতি সিন্‌হা বাড়ী থেকে গাড়ী চালিয়ে সোজা আদালতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আদালতের চব্বিশ নম্বর ঘরের সামনে গিয়ে বসতেই নিখুঁতভাবে পোষাক পরিহিত পেশকার—দর্শক-শ্রোতায় উপচে পড়া আদালত কক্ষে গিয়ে ঘোষণা করলেন, "শুনুন, রাজনারায়ণের আবেদনক্রমে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনসংক্রান্ত মামলার রায় যখন জজসাহেব পাঠ করবেন তখন যেন কেউ হাততালি দেবেন না।"

সিন্‌হা তখন ২৫৮ পৃষ্ঠার 'রায়' নিয়ে বসে আছেন। বললেন, "এই মামলায় যে সব বিভিন্ন ধরণের বিষয় উত্থাপিত হয়েছে কেবলমাত্র সেই সব বিষয়ে আমি আমার মন্তব্য এখানে পাঠ করবো।

তারপর তিনি বললেন, "আবেদন গৃহীত হয়েছে।" একমুহূর্তের জন্য আদালত কক্ষে দেখা গেল এক বিস্ময় বিহ্বল নীরবতা। তার পরেই সবাই আনন্দে ফেটে পড়লো। সংবাদপত্রের লোকেরা ছুটলো টেলিফোনের দিকে আর গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা ফিরে গেল নিজের অফিসে।

ঠিক দশটা বেজে দুই মিনিট। ইউএনআইয়ের টেলিপ্রিণ্টারে খবর আসতে শুরু করেছে। খবরের প্রথম কটি কথা "শ্রীমতী গান্ধী আসনচ্যুত।" শেষান টেলিপ্রিণ্টারের কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে ছুটলেন সেই ঘরের দিকে যেখানে প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন। ঘরের বাইরে তাঁর সঙ্গে রাজীবের দেখা হল। রাজীব ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পাইলট। শেষান রাজীবকে খবরটা জানালেন। রাজীব তাঁর মাকে বললেন, "ওরা তোমাকে আসনচ্যুত করেছে।"

শ্রীমতী গান্ধী খবরটা শুনলেন। তাঁর চেহারায় কোনরকম ভাবের অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো না। এমনও হতে পারে যে অস্বস্তিকর প্রতীক্ষার অবসান ঘটায় তিনি খানিকটা স্বস্তি পেলেন।

গতকাল সারাটা দিন তাঁর গভীর দুশ্চিন্তায় কেটেছে। তার উপর আবার এই কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দুর্গাপ্রসাদ দার যিনি প্রথমে ছিলেন তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য এবং মস্কোতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসাবে গিয়েছিলেন তিনি পরলোক গমন করেছেন। কিন্তু ঐ সকালটায় যেন তিনি বেশ খুশী খুশী ছিলেন।

টেলিপ্রিণ্টারে আবার খবর এল: আগামী ছয়বছর তিনি কোন নির্বাচিত পদে প্রার্থী হতে পারবেন না। এই খবর পেয়ে তিনি যেন বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে এবার তিনি তাঁর ভাবাবেগকে গোপন করার চেষ্টা করছেন। ধীর পদক্ষেপে তিনি তাঁর বসার ঘরের দিকে এগোলেন।

নির্বাচনে দুটি ব্যাপারে অসৎ পন্থা অবলম্বন করায় সিন্‌হা তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন। প্রথমতঃ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বিশেষ অফিসার যশপাল কাপুরকে তিনি "নিজের নির্বাচনী প্রচারে কাজে লাগিয়েছেন।" সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাকে এই কাজে নিযুক্ত করা উচিত হয়নি। সিন্‌হা উল্লেখ করেছেন যে কাপুর ১৯৭১ সালের ৭ই জানুয়ারী থেকেই প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করে দেন। অথচ তিনি সরকারী কাজে ইস্তাফা দেন ১৩ই জানুয়ারী তারিখে। কিন্তু তিনি সরকারী অফিসে কর্মরত ছিলেন ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত। বিচারপতির বক্তব্যে আরও প্রকাশ পায় যে শ্রীমতী গান্ধী ১৯৭০ সালের ২৯শে ডিসেম্বরই "নিজেকে নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা

করেন।" ঐ দিন নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী ঐ কথা ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় অশোভন কাজ হল শ্রীমতী গান্ধী উত্তর প্রদেশের সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতায় মঞ্চ তৈরী করেছেন এবং সেই মঞ্চ থেকে তিনি তাঁর নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করেছেন। সরকারী অফিসাররা সভাস্থলের জন্ম লাউডস্পীকার ও বিদ্যুতেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

নির্বাচনে রাজনারায়ণ এক লক্ষেরও বেশী ভোটেব ব্যবধানে হেরে গিয়েছিলেন। এই অন্যায়গুলি এমন কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যা একজন প্রধানমন্ত্রীকে আসনচ্যুত করতে পারে। এতো ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করায় প্রধানমন্ত্রীত্ব খোয়াবার মতই ঘটনা।

কিন্তু আইন—সে তো আইনই। আইনে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোন একজন নির্বাচন প্রার্থীব ভবিষ্যতকে সুনির্দিষ্ট কবা ও তাকে বিজয়ী কবার জন্ম যদি কোন সবকাবী কর্মচারীর সাহায্য নেওযা হয় তবে তা দুর্নীতিমূলক আচরণ হিসাবেই পবিগনিত হবে। সিন্‌হা তাঁর রায়দান প্রসঙ্গে বলেছেন, এছাড়া তাঁব কোন উপায় ছিল না। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর জন্ম বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই তাঁব পক্ষে অন্য কোন প্রকাব রায়দান সম্ভব ছিল না। এমন কি এই সংক্রান্ত আইন ভঙ্গকারীর জন্ম শাস্তিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে যেখানে বিচাবপতির নিজস্ব বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের অবকাশ পর্যন্ত নেই।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সদা উত্তেজিত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং কংগ্রেস সভাপতি একান্ত ভক্ত দেবকান্ত বড়ুয়া সবার আগে প্রধানমন্ত্রীব বাসভবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁরা যেতেই শ্রীমতী গান্ধী যখন বললেন যে, তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে তখন উভয়েব মুখের যেন বিপদের কালোছায়া নেমে এল।

খবরটা ছড়িয়ে যেতেই একে একে মন্ত্রীসভার সদস্যরা এবং অন্যান্যরা বিক্ষিপ্ত চিত্তে এবং বিষণ্ণ হৃদয়ে এক নম্বর সফদরজং রোডে এসে হাজির হতে থাকলেন। দেখতে দেখতে বসার ঘর-ভরে গেল। কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী ঘরে ঢুকেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। উপস্থিত সকলকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন শোকার্ত মানুষের সমাবেশ হয়েছে। তার মধ্যে যদি কেউ শক্ত ছিলেন তিনি শ্রীমতী গান্ধী। খানিকটা বিরক্তি সহকারেই শ্রীমতী গান্ধী শ্রীমতী পূরবী মুখার্জীকে ধৈর্য হারাতে বারণ করলেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখাবয়ব খানিকটা ফ্যাকাসে দেখালেও তিনি বেশ শান্ত ছিলেন। তিনি জানতেন পদত্যাগ করা ছাড়া তাঁর সামনে আর কোন রাস্তা খোলা নেই।

কেউ একজন বললেন। তিনি সুপ্রীম কোর্টে আপীল করতে পারেন। কিন্তু সে তো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি হিসাবে যিনি নিজেকে দাবি করে থাকেন সেই সিদ্ধার্থ রায় এবং আইনমন্ত্রী হরি রামচন্দ্র গোখলের তখনও এই বিষয়ে আলোচনা চলছিল। এমন সময় আবার টেলি-প্রিণ্টারে খবর এলো যে সিন্‌হা এই মামলার রায়ে ২০ দিনের 'স্টেঅর্ডার' দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ায় পরিবর্তন এল। সকলেই মনে মনে স্বস্তি অনুভব করলেন। গোখলে নিশ্চিত হবার জন্য এলাহাবাদে ফোন করলেন (তিনি অবশ্য আধঘণ্টা পরে ভ্যাকেশন জজ কৃষ্ণ আয়ারকেও ফোন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোন কথা হয় নি)। খবরটা ঠিক। শ্রীমতী গান্ধীকে আর এই মুহূর্তে পদত্যাগ করতে হচ্ছে না।

তবে খুব শীঘ্রই তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। সিন্‌হা তো স্টে অর্ডারের জন্য যে আপীল করা হয়েছিল তা প্রায় বাতিল করে দিয়েছিলেন। রায়দানের পূর্ব দিন গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর স্টেনোগ্রাফারকে যেভাবে উত্যক্ত করেছিল তাতে সিন্‌হা খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর নিজস্ব উকিল ডি. এন. খারে যিনি রায়দানের মাত্র বারো ঘণ্টা আগে শ্রীনগর থেকে বিমান যোগে এখানে এসে পৌঁছেছিলেন তিনি সিন্‌হাকে বুঝিয়ে বললেন যে তাঁর স্টেনোগ্রাফারের প্রতি পুলিশ যে আচরণ করেছে সেজন্য আপনি নিশ্চয়ই শ্রীমতী গান্ধীর দোষারোপ করতে পারেন না। সিন্‌হা তাঁর যুক্তি মেনে নিলেন।

'স্টে অর্ডারের' পক্ষে খারে যুক্তি দেখালেন যে, পার্টির নতুন নেতা নির্বাচন করতে কিছুটা সময় লাগবে। তাছাড়া এক্ষুনি যদি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন তাহলে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রধানমন্ত্রীর বাড়ী এখন মন্ত্রী, ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ অফিসারে গিজ্‌গিজ্‌ করছে। সিন্‌হা সম্পর্কে কটু শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে 'স্টে-অর্ডার' দিয়েছেন তাতেও সবাই সন্তোষ প্রকাশ করছেন। এবার ভবিষ্যত কর্মসূচী নিয়ে ভাববার জন্য হাতে কিছু সময় পাওয়া গেছে। যে করেই হোক এই বটবৃক্ষকে বাঁচাতেই হবে। কেননা এই লোকগুলো ঐ বৃক্ষের তলাতেই আশ্রয় নিয়ে বেঁচে আছে। তাঁর পিতাও এইভাবে বহুজনকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

মায়ের এই সঙ্কট মুহূর্তে রাজীব তাঁর কাছে কাছে ছিল। শ্রীমতী গান্ধীর দ্বিতীয় পুত্র সঞ্জয় তখন ফ্যাক্টরীতে। মারুতি লিমিটেডের ফ্যাক্টরী—যেখানে "জনতা গাড়ী" তৈরী হওয়ার কথা। (মারুতি লিমিটেড সম্পর্কে পুরো কাহিনী

এই পুস্তকের পরিশিষ্টে সংযোজিত হল)। হৈচৈ ও বিভ্রান্তিকর পরিবেশের মধ্যে সঞ্জয়কে এই সঙ্কট সংক্রান্ত খবরটি দেবার কথা কারো মনেই আসে নি। অথচ এই সঞ্জয়ই পরবর্তী সময়ে কম্যুনিষ্টদের হাত থেকে মাকে "বাঁচানোর" জন্য সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন। কেন না কম্যুনিষ্টদের তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করেন। রাজীব কিন্তু রাজনীতিতে নামেন নি।

সঞ্জয় যখন তার আমদানী করা বিদেশী গাড়ীতে চেপে দুপুরবেলায় বাড়ীতে ফিরলেন তখন দেখলেন বাড়ীর বাইরে ভিড় জমে রয়েছে। কী হতে পারে তা তিনি আগেই ভেবে নিয়েছিলেন, তাই তিনি সোজা মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। সঞ্জয় কোন কথা না বললেও তাকে দেখে মায়ের মুখমণ্ডল যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সঞ্জয়ের বয়স মাত্র আঠাশ বছর হলে কী হয় মা তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে জানেন সঞ্জয়ের পরামর্শ কত বেশী পরিণত বুদ্ধির পরিচায়ক।

শ্রীমতী গান্ধী একটি ঘরে কেবলমাত্র পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি গোপন রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হলেন। দুই পুত্রই—রাজীব এবং সঞ্জয় পদত্যাগের বিরুদ্ধে ছিলেন—এমন কি সেই পদত্যাগ যদি সাময়িক কালের জন্য হয় তবুও। এ বিষয়ে সঞ্জয়ের জোরটা যেন আরও বেশী ছিল। সঞ্জয় বললেন—যা শ্রীমতী গান্ধী নিজেও বেশ ভালো মতই জানতেন যে, বিরোধী দলগুলির চেয়ে তাঁদের নিজেদের দলেই এমন উচ্চাভিলাষী মানুষ প্রচুর আছেন যাঁদের সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধীর ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে।

শ্রীমতী গান্ধী ঐ ঘর থেকে সোজা চলে গেলেন তাঁর বাড়ীর স্টোর রুমে। এটাই তাঁর অভ্যাস। যখনই তিনি কোন দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হন তখনই তিনি ঐ ঘরে গিয়ে ঢোকেন। এই ঘরই হয় তাঁর আশ্রয়। এখানে এলে তিনি নিজের মত করে কিছুটা সময় পান—পান চিন্তা করার অবকাশ।

অনেক কিছুই তাঁকে এখন চিন্তা করতে হবে। তিনি যদি এই মুহূর্তে পদত্যাগ করেন এবং সুপ্রীম কোর্টের "অভিযোগ থেকে মুক্তি লাভের পথ" তিনি আবার ফিরে পাবেন। তাহলে বিরূপ সমালোচকরা আর এ অভিযোগ করতে পারবে না যে, যেভাবেই হোক না কেন তিনি ক্ষমতার গদি আঁকড়ে থাকতে চান। কিন্তু যদি সুপ্রীম কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারকেই তুলে ধরে বা সমর্থন করে তাহলে চিরতরে ঐ আসন ত্যাগ করে তাঁকে চলে যেতে হবে। শুধু তাই নয় একটি কলঙ্কচিহ্ন ললাটে ধারণ করে তাঁকে বিদায় নিতে হবে।

তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না যে আদালতে তিনি যে, আপীল করবেন তার দশা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে। অতীতে হাইকোর্ট যেসব সদস্যকে পদচ্যুত বা অযোগ্য বিবেচনা করেছে তাদের হয়তো সংসদ কক্ষে বসতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের কোন ভোটাধিকার নেই, আলোচনাতেও তারা অংশ নিতে পারবে না এবং ভাতাবাবদও কোন কিছু তারা পাবে না। তিনি যদি বিশেষ ধরণের "স্টে অর্ডার" পান তাহলেও কী এমন এসে যাবে?

তাঁর পরামর্শদাতারা সংবিধানের ৮৮নং ধারা তুলে ধরে খানিকটা আশ্বস্ত হতে চাইলেন! ঐ ধারায় বলা আছে যে, মন্ত্রী বা অ্যাটর্নী জেনারেলের 'ভোট দেবার অধিকার' না থাকলেও সংসদের উভয় কক্ষে বলার ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করাব পূর্ণ অধিকার তাঁদের আছে। 'স্টে অর্ডার' যেমনই হোক না কেন—কোন আদালতই মন্ত্রীর ঐ অধিকার কেড়ে নিতে পারে না।

এ কথা ঠিক যে এই মুহূর্তে তিনি যদি পদত্যাগ করেন তাহলে সারা পৃথিবী তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। প্রকৃত গণতন্ত্রবাদী হিসাবে তাঁর সম্মান এত বেশী বাড়বে যে তিনি যে কোন নির্বাচনে ১৯৭১ সালের মতই সুনিশ্চিত ভাবে বিজয়ী হবেন। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টই যদি ছয় বছরের জন্য তাঁকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেন তাহলে কী হবে? সে এক বিরাট অবকাশ। সে অবকাশে মানুষ তাঁর সমস্ত ভালো কাজের কথা ভুলে যাবে। ততদিনে তাঁর নিজের দলের বাইরের যেসব উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আছে তারা তাঁর কবরের জন্য মাটি খুঁড়তে শুরু করবে।

এখন সঞ্জয়ই তাঁর আশ্রয় স্থল। প্রয়োজনের এই মুহূর্তে সঞ্জয়ই যে তাঁকে সাহায্য করবে এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। কেন না ১৯৭১ সালে নির্বাচনে জয় লাভের চাবিকাঠি যে স্লোগানটি সেটি সঞ্জয়ই দিয়েছিল: "তারা বলে ইন্দিরা হটাও, আমি বলি গরীবী হটাও।" এখন অবশ্য তাকে একটা স্লোগান আবিষ্কারের চেয়ে বেশী কিছু করতে হবে। সে জানে যে তার মা কোন জিনিষ সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। কিন্তু তখন একটা সময় এমন ছিল যখন তিনি ঐ কাজটাই প্রায় করতে চলেছিলেন। সেটা করতে দিলে কিছুতেই চলবে না। সুতরাং তাঁর স্বপক্ষে জনসমর্থন তাকে গড়ে তুলতে হবে। যার ফলে তিনি নিজে এই ভেবে গদিতে থাকবেন—যে দেশ এখনও তাঁকে চায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শত্রুরাও এই জনসমর্থন দেখে ভয় পাবে।

দুন স্কুল থেকে বিতাড়িত এবং ইংলণ্ডের রোলস্ রয়েস কোম্পানীর অ্যাপ্রেন্টিস সঞ্জয় দীর্ঘ পথপরিক্রমা করে নিজেকে রাজনীতিতে "প্রতিষ্ঠিত"

করতে এগিয়ে এসেছে। অর্থ এবং ক্ষমতা দুইটি বস্তুই তাকে এই দিকে বিশেষ ভাবে আকর্ষিত করেছে। এবং ঐ দুটি বস্তু সে পেতেও শুরু করেছিল।

সঞ্জয়ের প্রধান পরামর্শদাতা হল পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক রাজিন্দর কুমার ধবন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে তার কাজ হল অতিরিক্ত ব্যক্তিগত সচিবের। মাত্র বছর দশেক আগেও ধবন ছিল রেলের সাড়ে চারশ' টাকা মাস মাইনের করণিক। ধবন আজ যা হয়েছে এসবই সঞ্জয়ের কৃপায়। কেন না এরা দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বহু উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ ঘটনাতেই ধবন ছিল সঞ্জয়ের একান্ত সহযোগী। ধবন ছিল শ্রীমতী গান্ধীর 'ম্যান ফ্রাইডে', কেউ কেউ আবার তাকে দ্বিতীয় এম-ও-মাথাই বলেও বর্ণনা করে থাকে। নেহরুর স্টেনোগ্রাফার মাথাই একসময় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে ওঠে।

পুরো সরকারী যন্ত্রকে নিজের কাজে ব্যবহার করার জন্য সঞ্জয় ঐ ক্ষুদে অফিসারটিকে কাজে লাগাতো। অন্য প্রকারেও সঞ্জয় নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতো। ধবন এত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল যে কনিষ্ঠ মন্ত্রী অথবা অভিজ্ঞ অফিসার উভয়কে সে দাবড়ে কথা বলতো। প্রধানমন্ত্রী নাম করে সে ধমকাতো। একদিন ধবন একজন মন্ত্রীকে পর্যন্ত ডেকে খুব বকে দিয়েছিল। মন্ত্রীর অপরাধ কোন একটা জরুরি ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে তিনি একখানি 'রিমাইণ্ডার' পাঠিয়েছিলেন।

এছাড়া সঞ্জয়ের আরও একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন। বয়সে অবশ্য তিনি সঞ্জয় গান্ধীর তুলনায় বেশ প্রবীন। তিনি হলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী বাহান্ন বছর বয়স্ক বংশীলাল। হরিয়ানা যেন তাঁর নিজস্ব জায়গীর এইভাবেই তিনি তার শাসন করতেন। আদালতে মক্কেল বিহীন উকিল হিসাবে তাঁর পরিচিতি থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীত্বের আসনে উঠতে তাঁর পুরো এক দশকও সময় লাগে নি। মুখ্যমন্ত্রীত্বই তাঁর অন্তিম লক্ষ্য নয়, তিনি আরও ওপরে উঠতে চান। তিনিই সঞ্জয়কে নামমাত্র মূল্যে মারুতি ফ্যাক্টরীর জন্য ২৯০ একর জমি দেন এবং জমি কেনার টাকা শোধ করতে যাতে সুবিধা হয় সেজন্য একটি সরকারী ঋণেরও ব্যবস্থা করে দেন। এর প্রতিদান হিসাবে সঞ্জয় বংশীলালকে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব পরিষদের মধ্যে নিয়ে আসেন। মা এবং ছেলে উভয়েই তার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে শুরু করলেন। কারণ বংশীলাল ছিলেন একজন আত্মসমর্পিত তাঁবেদার। তাঁকে যে কোন কাজ দেওয়া হোক—তা ন্যায় অন্যায় যাই হোক না কেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা করতে রাজী।

শ্রীমতী গান্ধীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তখন এই তিন মূর্তি। তিনিও এদের

উপর অবিচল আস্থা রেখে ছিলেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর হয়ে তাঁরই নাম নিয়ে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, দলীয় ব্যাপারে এবং সামগ্রিকভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে কাজ করতেন। তিনি জানতেন যে এই ত্রিমূর্তি মাঝে মাঝে দুরভিসন্ধিপূর্ণ পথ বেছে নেয়। কিন্তু তা নিলেও ঐ সবের কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি তাদের যা খুশী তাই করার অধিকার দিয়েছিলেন। কারন এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব ভূমিকা অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠছিল।

এই ত্রিমূর্তি ছাড়া আরেকজন ব্যক্তি খুব কাছাকাছি ছিলেন। তিনি হলেন কংগ্রেসের সভাপতি পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক দেবকান্ত বড়ুয়া। তিনি ছিলেন রাজসভার ভাঁড়ের মত। সর্বদা তাঁর মুখে শ্রীমতী গান্ধীর প্রশস্তি লেগেই থাকতো। শ্রীমতী গান্ধীই তাঁকে আসামের রাজনীতি থেকে বের করে এনেছিলেন এবং বিহারের রাজ্যপাল করে দিয়েছিলেন। তারপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হলেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। এই মুহূর্তে বড়ুয়াকেও তাঁর বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে তাঁর পরলোকগত স্বামী ফিরোজ গান্ধীর বন্ধু হিসাবেই জানতেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব থাকায় মাঝে মধ্যেই তাঁদের মন কষা-কষি হত তখন এই বড়ুয়াই গিয়ে মধ্যস্থা করে তাঁদের ঝগড়া মিটমাট করে দিতেন। বড়ুয়া দক্ষিণ পন্থী কমুনিস্টদের সঙ্গে একটু বেশী মাত্রায় ছেনালী করতেন। কারণ এর ফলেই—তিনি আদর্শবাদের একটা ছদ্মবেশ ধারণ করে নিতে পেরেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, দক্ষিণ-পন্থী কমুনিস্টরা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। সঞ্জয়ের আবার এটা ভালো লাগতো না। সঞ্জয় তাকে 'কমি' বলেই ডাকতো। কিন্তু বিরোধী পক্ষ থেকে যখন বিপদ এসে উপস্থিত হল তখন সাময়িক কালের জন্য হলেও বড়ুয়া সঞ্জয় মিলিত হয়েছিলেন।

তাঁরা কাজ আরম্ভ করে দিলেন। পৃথিবীর সামনে তাঁরা এই যুক্তি তুলে ধরলেন যে, বিচারপতি যা-ই বলুন না কেন জনসাধারণের মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে শ্রীমতী গান্ধী হলেন নির্বাচিত নেতা এবং তিনি নেতাই থাকবেন। তাঁদের প্রথম পদক্ষেপ হল প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা "প্রমাণের" জন্য তাঁর আশেপাশে লোক জড়ো করা। এর আগে একাধিকবার তাঁরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ট্রাক জোগাড় করে সেগুলি গ্রামে পাঠানো হতে লাগলো যাতে করে গ্রামের লোক এনে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এক

নম্বর সফদরজং রোডের সামনে এনে উপস্থিত করা যায়। গ্রাম থেকে আসা এইসব লোকেদের কাজ হবে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। নিখরচায় ভিড় জড়ো করার জন্য দিল্লির সরকারী বাসগুলিকে ( দিল্লি ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন ) পর্যন্ত কাজে লাগানো হয়েছিল। অবশ্য এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার যে, ভিড় করে আনুগত্য প্রকাশের পর গ্রামবাসীদের বাড়ী ফেরার জন্য নিখরচায় বাসের ব্যবস্থা করার কোন দায়িত্বই তাদের ছিল না।

প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীতে বসেই ধবন প্রতিবেশী রাজ্যগুলির যেমন পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীদের ফোনে জানিয়ে দিল যে, তাঁরা যেন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে সমাবেশের জন্য লোক পাঠান। প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কী ভাবে লোক জড়ো করতে হয় সে বিদ্যায় এইসব মুখ্যমন্ত্রীও বেশ পারদর্শী। এ ব্যাপারে তাঁদের অভিজ্ঞতাও কিছু কম নয়। ১৯৬৯ সালে তাঁরা এর প্রমাণ দিয়েছেন। তখন শ্রীমতী গান্ধী নিজের গায়ে "প্রগতিবাদী" ছাপটি লাগাবার জন্য ব্যাঙ্ক জাতীয় করণের প্রস্তাব করেছিলেন এবং তাঁর চুয়াত্তর বছর বয়স্ক প্রতিদ্বন্দ্বী মোরারজী দেশাই ছিলেন দক্ষিণপন্থী—কেন না তাঁর প্রস্তাব ছিল ব্যাঙ্কগুলির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রন আরোপ করা।

দেশাই দু'দু'বার প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। একবার ১৯৬৬ সালে, শ্রীমতী গান্ধীর পূর্বসূরী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর তাশখন্দে পরলোক গমনের পর। আরেকবার ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস যখন ৫২০ সদস্যের লোকসভায় মাত্র ২৮৫টি আসন নিয়ে খোঁড়াতে শুরু করেছিল তখন।

শ্রীমতী গান্ধীর জন্য "জনসমর্থন" জোগাড়ের কাজ ধবন নিজের কাঁধে নিয়েছিল। যদিও যশপাল কাপুরের অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে অনেক বেশী। তবু তাঁকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। কেননা তিনি তখন সুনজরে নেই। সবার ধারণা কাপুরের জন্যই শ্রীমতী গান্ধীকে নির্বাচনী দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়েছে। কিন্তু ধবন আর কেউ নয়—সে কাপুরেরই ভাগে এবং মামার কাছ থেকে সে অনেক কিছু শিখেছে। যশপাল কাপুরের ইতিহাসও এক কথায় সাফল্যের ইতিহাস। একজন স্টেনোগ্রাফার থেকে রাজ্যসভার সদস্যপদ পর্যন্ত তিনি সাফল্যের মই বেয়ে এগিয়েছেন। তিনি শ্রীমতী গান্ধীর রাজনৈতিক পরামর্শদাতা এবং গোয়েন্দার কাজ করেন। ভাবমূর্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে কাপুর সিদ্ধহস্ত। শ্রীমতী গান্ধীর জনপ্রিয়তা যখনই কমেছে কাপুরের সহযোগিতা তখন বিশেষ কাজে লেগেছে। কাপুর বেশ ভালোমতই

জানতেন যে জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠা করতে কখন কোন্ পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

কিছুদিনের জন্য তিনি বাড়ীতেই ছিলেন। চাপা রাগে নিজের মনেই গুমরেছেন। বাইরে তার কোন প্রকাশ ঘটে নি। এলাহাবাদ কোর্টের রায়দান প্রসঙ্গে যেভাবে কাপুরের নাম কালিমালিপ্ত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে কাপুরকে বলাই হয়েছিল যে তিনি যেন কিছুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন। পরে আবার তাঁকে জনসমক্ষে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি এসেই নতুন স্লোগান দিলেন, "দেশ কী নেতা ইন্দিরা গান্ধী, এই স্লোগানকেই আরেকটু জোরদার করার উদ্দেশ্যে বড়ুয়া বললেন, "ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া"। বড়ুয়া অবশ্য প্রথমটায় বুঝতেই পারেন নি এর ফলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হবে। কেননা নাৎসী তরুণদের অনেকটা এই রকম ভাষাতেই শপথ গ্রহণ করানো হত: "অ্যাডলফ হিটলার ইজ জার্মানী অ্যাণ্ড জার্মানী ইজ অ্যাডলফ হিটলার।"

আশেপাশের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের পক্ষে বাস ও মানুষ যোগাড় করা এবং তাদের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে যে ট্রাফিক আইল্যাণ্ড আছে সেখানে পৌঁছে দেওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ১৯৬৯ সাল থেকেই একটা স্থায়ী মঞ্চ তৈরী করাই ছিল। তার সামনেই সকলে সমবেত হতে থাকলো। সে বছর ভি ভি গিরি রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কংগ্রেসের নিজস্ব প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডীর বিরোধিতা করেছিলেন স্বয়ং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। যাই হোক তাঁর বাড়ীর সামনে যারা আসছিল তারা ছিল "প্রতিক্রিয়া ও প্রগতির" লড়াইয়ে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থক।

জনসাধারণের সুবিধার জন্য রাজনীতিকে অনেক সময় সহজ সরল করে উপস্থাপন করতেই হয়। আদর্শবাদ অথবা আদর্শবাদের কারবারীরা হ'ল এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসপার্টি বহুদিন আগে থেকেই "গণতন্ত্র" ও "সমাজতান্ত্রিক নীতি" প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। কংগ্রেসের 'সমাজতান্ত্রিক নীতি' অবশ্য 'সমাজবাদ' বলতে যা বোঝায় তা থেকে পৃথক। সমাজবাদ নামক যে শব্দটির চল ইদানিং খুব বেশী তার প্রকৃত অর্থ হল প্রগতিশীলতা যা প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরোধী। শ্রীমতী গান্ধী হলেন, প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রী আর রাজনারায়ণ হলেন, প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল আইন যে বিচারশক্তি মেনে চলেন তিনিও প্রতিক্রিয়াশীল।

অচিরেই সেই গুরুত্বপূর্ণ রায় যবনিকার অন্তরালে চলে গেল। সকলকে জানিয়ে দেওয়া হল যে শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর আসন ছাড়ছেন না। কারণ জনসাধারণ তাঁর উপর এই আস্থা স্থাপন করেছেন। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য এবং নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন। কংগ্রেসপার্টির ছাত্র শাখা ন্যাশানাল স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়া যা পরে সঞ্জয় গান্ধীর শক্তির উৎস যুব কংগ্রেসের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় তারা বলে, "শ্রীমতী গান্ধী হলেন ভারতের লক্ষ লক্ষ পিছিয়ে পড়া শোষিত মানুষের নেতা। সাম্য এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সমাজের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনকল্পে যে সংগ্রাম তিনিই তাঁর নেতৃত্ব দিচ্ছেন।" তারা কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যে রায় দিয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করে নি।

শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি সমর্থন জানাবার এই প্রদর্শনী এমনই অমার্জিত রুচির পরিচায়ক ছিল যে কংগ্রেস দলভুক্ত বেশ কিছু সংসদ সদস্যও এতে খুব বিরক্ত হন। কিন্তু তাঁর উত্তর হল, "এসব স্বতঃস্ফূর্তভাবে হচ্ছে।"

দেশের পাঁচটি বনিকসভা এবং প্রথম শ্রেণীর শিল্পপতিরাও শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি তাঁদের সমর্থন জানালেন। শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যেই তাঁরা তাঁদের সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন যদিও শ্রীমতী গান্ধী প্রকাশ্যেই তাঁর "সমাজতান্ত্রিক" নীতির কথা বলতেন। তাঁর নীতিসমূহ যে সমাজতান্ত্রিক নীতির চেয়েও অনেকক্ষেত্রে ভালো সে কথা বহু বিরোধী সদস্যও স্বীকার করেছেন। তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার (সি পি আই) সমর্থনও পেয়েছিলেন। ১৩ জুন তারিখে সি পি আই কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, "তথাকথিত নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের ছাত্ররা যে চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত এর মধ্যে তাদের অশুভ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি কিন্তু চাপা পড়তে পারে নি।" রুশপন্থী এই দলটি ভেবেছিল যে কংগ্রেসের ঘাড়ে চেপে তারা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের তোরণদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া এবং ভারতীয় ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস লীগের মত সংস্থাগুলিও শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি তাদের অকুণ্ঠ আস্থার কথা জানাবার কাজে পিছিয়ে পড়লো না। বছরের পর বছর ধরে তিনি এবং তাঁর পিতা এদেশে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে এসেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁরা বিরোধীদের উপরই বা আস্থা রাখেন কেমন করে? কেননা বিরোধীদের মধ্যে জনসঙ্ঘ নামক যে দলটি আছে সেটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের (আর-

এস-এস ) সংসদীয় শাখা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর ঐ হিন্দু সংস্থাটি হিন্দু সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ গঠনে বিশ্বাসী।

তাঁর ছেলের ভাড়া করা লোক যদি না-ও থাকতো তবু যে শ্রীমতী গান্ধীর বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল এ বিষয়ে কারো মনেই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বিরোধী দলসমূহের বক্তব্য ছিল এই যে, একজন দোষী প্রধানমন্ত্রী স্বপদে বহাল থাকা উচিত কি না এবং তারা জনসাধারণকেও সেই সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিতে চায় যারা বিচার বিভাগের রায়কে প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে বিরোধিতা করে গণতন্ত্রের বনিয়াদকেই ধ্বংস করে দিতে চায়। কিন্তু তাদের সেই আওয়াজ শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থকদের হৈ চৈয়ের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

সমাজতান্ত্রিক দলের কিছু তরুণ বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা করে ছিল। পুলিশ কর্ডন ভেঙ্গে কয়েকজন সমাজবাদী যুবক প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে যখন ঢুকে পড়েছিল এবং স্লোগান দিয়েছিল: 'ইন্দিরা গান্ধী' পদত্যাগ করুন তখন সঞ্জয়ের অন্যতম সহযোগী দীর্ঘাঙ্গী এবং ফটোসুন্দরী অম্বিকা সোনী নিজে এগিয়ে এসে একটি যুবকের মুখের উপর চড় মেরেছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছরের অম্বিকা যিনি পরে যুবকংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি নিজেকে বেশ করিৎকর্মা ম'হলা হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন। পুলিশ মোটেই পিছিয়ে পড়ে নি। অম্বিকা যা করলেন সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পুলিশ সেখানেই ঐ বিক্ষোভকারী যুবকদের প্রচণ্ড মার মারলো এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করলো।

এতে কিন্তু বিরোধীরা দমে গেলেন না। একমাত্র রুশ সমর্থক সি পি আই যারা শ্রীমতী গান্ধীকে শুধু এইজন্য সমর্থন করতেন যে রাশিয়ার দিকে তাঁর ঝোঁক আছে—একমাত্র এরা ছাড়া বিরোধী সকল দলই ঘোষণা করলো যে, শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁরা আর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্বীকার করেন না। হাইকোর্টের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্বেও গদী আঁকড়ে থাকায় বিরোধীরা তাঁর তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন।

পুরাতনপন্থী কংগ্রেসদল, হিন্দুজাতীয়তাবাদী জনসঙ্ঘ, কৃষকপন্থী ভারতীয় লোকদল, ভেঙ্গে আসা কমুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া বা সি পি আই (এম) এবং সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় যেন ভগবৎ প্রেরিত আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল। তাঁরা বহু দিক দিয়েই শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিলেন—যেমন দুর্নীতি, গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতি তার

অবমাননা যা স্বৈরতন্ত্রেরই পথপ্রদর্শক। কিন্তু এ সবে কোন কাজই হল না।

এত বছর ধরে তারা যা করতে পারে নি, আদালতের রায়ে তা এক কথায় হয়ে গেল। তারা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে ধর্ণা দিতে শুরু করলেন। যদিও রাষ্ট্রপতি তখন ছিলেন কাশ্মীরে। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে তাঁরা আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এবং সব দল তাদের রাজ্য শাখাগুলিকে এই নির্দেশ দিল যে তারা যেন ইন্দিরা-বিরোধী সভা সমাবেশ ও বিক্ষোভ শোভাযাত্রা আরও বেশী সংখ্যায় আয়োজিত করে।

সংসদে বিরোধীদের সব মিলিয়ে ষাটটি আসনও ছিল না। কিন্তু এখন তারা বিশেষ সুযোগ লাভ করলো। এবার তারা যে বিষয়টি তুলে ধরলো তা হল নৈতিকতা ও যৌক্তিকতার প্রশ্ন। তারা জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে এক বার্তা পাঠিয়ে তাঁর নেতৃত্ব চাইলো। মহাত্মাগান্ধীর পর জয়প্রকাশ নারয়ণই—সমগ্রদেশের নৈতিকতাকে উজ্জীবিত করে রেখেছিলেন। তাঁর কাছেই গেল বিরোধীদের এই আবেদন।

জেপিকে বেছে নেওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর কোন ভালো পথ খোলা ছিল না। কেননা তাদের নেতা হবার পক্ষে জেপি ছিলেন বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। ইতিপূর্বে ১৯৭৪ সালে অবশ্য জেপিকে তারা বিফল মনোরথ করেছিল। কেননা জেপি তখনই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সকল বিরোধীদলের সমন্বয়ে একটি দল গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাতে কেউ কান দেয় নি। একজন প্রকৃত গান্ধীবাদী এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম নায়ক জেপি সব সময়েই লক্ষ লক্ষ দলিত-পীড়িত ও বঞ্চিত মৌনমূক মানুষের কথা সবার সামনে তুলে ধরেছেন দীর্ঘদিনের সাধনায় তিনি নিজেকে জনজীবনের চারিত্রিক সততার প্রতীক স্বরূপ করেছিলেন। নিজ রাজ্য বিহারের জনজীবনে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি যে আন্দোলন গড়ে তোলেন নিঃসন্দেহে তার সুদূরপ্রসারী ফল দেখা গেছে। এমন কি রাজ্য বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার মত জাগতিক ব্যাপারেও এর প্রভাব দেখা গেছে, যদিও এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তিনি যে উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তা তখন বিস্মৃত হয়েছিল। সুবিধাবাদের রাজনীতিকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করার জন্য এবং জনসাধারণের প্রয়োজন সম্পর্কে সদা সচেতন প্রকৃত গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা

করতে গেলে ঐ আধ্যাত্মিক আদর্শের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু দু'বছর পরে বিহার আন্দোলন পরিণামে ফলবতী হতে থাকে।

বহুদিন যাবৎ তাঁর এবং শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যে কাকা-ভাইঝির সুমধুর সম্বন্ধ ছিল এবং জেপি তাঁকে ইন্দু বলেই ডাকতেন। কিন্তু বেশ কয়েক বছর যাবৎ বিশেষ করে গত দু'বছরে তাঁরা একে অপরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। এখন জেপি তাঁকে দুর্নীতির শিরোমণি এবং মৌল নীতিগুলির ধ্বংসকারী বলেই মনে করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় প্রকাশের পর জেপি ঘোষণা করেন যে, প্রধানমন্ত্রী থাকবার তাঁর আর কোন নৈতিক অধিকার নেই। অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। তাঁর গদী আঁকড়ে থাকা জনজীবনের সমস্ত প্রকার শোভনতা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরোধী।

শ্রীমতী গান্ধী জেপিকে বিরাট শক্তি হিসাবেই স্বীকার করেন। ডি পি-ধারের তত্ত্বাবধানে ১৯৭৪ সালের ১লা নভেম্বর জেপির সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বিহার-বিধান সভা একটি সর্তে ভেঙ্গে দিতে রাজী হয়েছিলেন, তা হল জেপি যেন আর কোন দাবি উত্থাপন না করেন। জেপির পক্ষে এ সর্ত মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

১৭ জুন তারিখে জেপি বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে এক জরুরী বার্তা পেলেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে দিল্লীতে চলে আসেন। কেন না সেখানে তাকে বিরোধীদের সমাবেশে নেতৃত্ব দিতে হবে। জেপি এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। যুদ্ধে নামার আগে শ্রীমতী গান্ধীর আপীলের তিনি সুপ্রীম কোর্টের রায় দান পর্যন্ত অপেক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন।

বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হলে যে বিপুল শক্তি উৎপন্ন হবে সে বিষয়ে জে-পি সুনিশ্চিত ছিলেন। গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে জনতা-ফ্রন্টের জয় (১৮২ আসনের বিধানসভায় ৮৭টি আসন লাভ) এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। জনতাফ্রন্ট যাতে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায় সেজন্য ছয় জন নির্দল সদস্য জনতা ফ্রন্টে যোগদান করেন। গুজরাট বিধানসভায় ১৯৭২ সালের নির্বাচনে ১৪০টির মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৭৪টি আসন। তখন কিন্তু বিরোধী দলগুলি মোটেই ঐক্যবদ্ধ ছিল না।

নির্বাচনের আগেই 'সম্পূর্ণ বিপ্লব' সংক্রান্ত জেপির পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের প্রচার-হয়ে গিয়েছিল। জেপি সারা ভারতে গুজরাট ধরণের পরিবর্তন চাইছিলেন। সময়ও খুব ভালো ছিল। কিন্তু শ্রীমতীগান্ধীর আপীলের উত্তরে সুপ্রীম কোর্ট কী জবাব দেয় তিনি আগে সেটা জানতে চাইছিলেন। তিনি

আশা করছিলেন যে এদেশের সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষে সিন্‌হার রায়কেই সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

শ্রীমতী গান্ধীও প্রতীক্ষায় ছিলেন। এবং তাঁর মনেও আশা ছিল না তা নয়। তিনি আশা করছিলেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত আইনের ভাবাগত অর্থের চেয়ে ভাবগত অর্থের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করবেন।

এখন অকম্যুনিষ্ট বিরোধী-দলগুলি প্রকাশ্যে ঘোষনাই করে দিয়েছে যে, শ্রীমতী গান্ধীকে তারা আর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্বীকার করে না। সুতরাং তিনি এখন সবচেয়ে খারাপ পরিণামের জন্যই প্রস্তুত হতে পারেন। এই সময়ে সংসদের অধিবেশন তাঁর পক্ষে বিশেষ অস্বস্তির কারণ হতে পারে।

বেশ কিছুদিন ধরে সংসদেও তাঁর খুব একটা ভালো সময় যাচ্ছিল না, কারণ রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রের আশ্রিত সংসদ সদস্য তুলমোহন রামকে প্রদত্ত একটি পারমিট সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর বিরূপ রিপোর্ট নিয়েই সংসদে তখন ঝড় উঠেছিল। এই পারমিট কে দিয়েছে সেকথা প্রমাণের আগেই ১৯৭৫-এর ৩রা জানুয়ারী তারিখে ললিতনারায়ণকে হত্যা করা হয়।

এক সময়ে মোরারজীও সংসদে বসে সত্যাগ্রহ করার হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সিবিআই রিপোর্ট সকলকে দেখানোর জন্যে বিরোধী দলসমূহের সর্বসম্মত দাবি মেনে না নিলেই আমি সত্যাগ্রহ করবো। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী নিজে স্পীকার গুরুদয়াল সিং ঢিলোঁর কাছে আবেদন করলেন যে মোরারজীকে সভাকক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হোক। স্পীকার তাঁর আবেদনে কান না দিয়ে পরে সম্পূর্ণ বিপরীত এক রুলিং দিয়ে বললেন, প্রধানমন্ত্রী এবং মোরারজী উভয়ে যেন স্পীকারের সঙ্গে তাঁর চেম্বারে গিয়ে দেখা করেন। এখানে তাঁকে একটু আঘাত পেতে হয়, কারণ স্পীকার যখনই শুনতে পান যে প্রধানমন্ত্রী তাঁর রুলিং পছন্দ করেন নি তৎক্ষণাৎ তিনি পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। তিনি যাতে পদত্যাগ না করেন সেজন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁকে অনুরোধ জানান।

এদিকে একসাংঘাতিক গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে মিশ্রকে ইহজগত থেকে বিদায় দেবার ব্যাপারে নাকি তাঁর হাত আছে। একথা ঠিক যে ইমপোর্ট লাইসেন্স কেলেঙ্কারীতে মিশ্রের সম্ভাব্য সংযোগ থাকায় আশঙ্কায় প্রধানমন্ত্রী তাকে পদত্যাগ করতে বলেছিলেন। কেননা সংসদে তখন এ নিয়ে বিশ্রী রকম বিতর্ক চলছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি রীতিমত অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং একটা অপরাধী মনোভাব তাঁর ভেতর দেখা দিয়েছিল। মিশ্র নিজের

সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকেও জড়াতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্যই তাঁকে মূল্য দিতে হল। সঞ্জয় এবং ধবন রেলভবনে মিশ্রের অফিস সীল করে দিয়েছিলেন। মারুতি সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র মিশ্রের কাছে ছিল এবং সে কাগজপত্র অন্যের হাতে পড়ুক এটা সঞ্জয় বা ধবন কেউ-ই চাইছিল না। ইন্দিরা ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন এবং অতীতে তিনি কখনও মারুতি সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নি। তেমন করার কোন কারণও তখন ছিল না।

এই বিষয়টিও সংসদে উপস্থাপিত হত, সুতরাং শ্রীমতী গান্ধী সংসদের জুলাই-আগষ্ট অধিবেশন স্থগিত রাখলেন। বিরোধীরা যদি ইমপোর্ট লাইসেন্স কেলেঙ্কারী নিয়ে এত হৈচৈ বাধিয়ে দিতে পারেন যাতে সংসদে অন্য কাজকর্ম করতেই দেওয়া হয় নি, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরুবার পর তো তা হলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে। এবং এটা মোটেই জানা ছিল না যে একজন 'অস্থায়ী' প্রধানমন্ত্রী কীভাবে বিভিন্ন ধরণের চাপের সম্মুখীন হবেন।

তার চেয়ে নিজের অফিসে বসে বরং তিনি ঘটনার গতিকে নির্দিষ্ট খাতে বইয়ে দেবার জন্য নির্দেশাদি দেবার অবকাশ পাবেন। কেননা পদত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু অপরকে একথা জানতে দিলে চলবে না। তার চেয়ে বরং এমন একটা হাওয়া সৃষ্টি করতে হবে যাতে লোকে মনে করে যে অপরের ক্রমাগত অনুরোধের জন্যই তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে এখন রয়েছেন, নইলে মরীয়া হয়ে গদী আঁকড়ে থাকার ইচ্ছা মোটেই তাঁর নেই। লোকে যাতে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে না পারে সেদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। হয়তো উত্তরটা আগে ভাগে জেনেই তিনি মন্ত্রিসভার প্রধান সদস্য জগজীবনরাম, যশবন্তরাও চবন এবং স্বরণ সিংকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তাঁর আপীলের ব্যাপারে সুপ্রীমকোর্টের চূড়ান্ত রায় পাওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা উচিত হবে কি না। তিনজনেই বললেন, তিনি যদি পদত্যাগ করেন তাহলে সর্বনাশ হবে। প্রত্যেকে এক সিদ্ধান্তে এলেও এই কথা বলার পেছনে প্রত্যেকের অবশ্য পৃথক পৃথক যুক্তি ছিল।

জগজীবনরাম বলেছিলেন, বিচার বিভাগের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁর অপেক্ষা করা উচিত। তবে রামের মনে হয়েছিল যে সুপ্রীমকোর্ট হয়তো এক্ষেত্রে সর্তসাপেক্ষ স্টে অর্ডার মঞ্জুর করবে। কেননা এই ধরণের মামলায় 'ক্লিয়ার স্টে' কখনই মঞ্জুর করা হয় না। তিনি মনে করেছিলেন বিদ্রোহ করার সেটাই হবে উপযুক্ত সময়। সেই সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, "আমরা সুপ্রীমকোর্টের বিচার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি।"

বেশ কয়েক বছর ধরে জগজীবনরামের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিশেষ অবনতি ঘটেছিল। শুধু তাই নয় অতি সম্প্রতি অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে ছোটখাট বিষয়েও যার গুরুত্ব খুবই কম—সেগুলি নিয়েও তিনি রামের সঙ্গে পরামর্শ করতেন না। দলের মধ্যে রামকে তিনি সব সময়ে তাঁর সবচেয়ে বড প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেছেন। সেইজন্য ১৯৬৯ সালে যখন জাকির হোসেনের মৃত্যু হয় তখন তিনি জগজীবনরামকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। কেননা রাষ্ট্রপতি পদ হল নাম-কে-ওয়াস্তে রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু তিনি যদি বাইরে থাকেন তা হলে সবসময়ই কেবিনেটে উচ্চতর পদলাভের জন্য তিনি চেষ্টা করে যাবেন।

একথা ঠিক যে তিনি বছর দশেক ধরে 'ভুলক্রমে' আয়কর দিতে না পারায় শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে মোরারজী দেশাই-এর বিরুদ্ধে তিনি ইন্দিরার পক্ষ সমর্থন করেই ঐ ঋণ চুকিয়ে দিয়েছেন। কেননা রাম চিরকালই মোরারজীর সঙ্গে ছিলেন। বিশেষ করে ১৯৬৩ সালে কংগ্রেসকে পুনর্গঠনের নাম করে কামরাজ প্ল্যানের মাধ্যমে নেহরু যখন মোরারজী এবং জগজীবন উভয়কেই মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন —সেই দুঃখের দিনে উভয়ে পারস্পরিক বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি যে একজন চতুর উচ্চাকাঙ্খী মানুষ শ্রীমতী গান্ধী এটা বেশ ভালোমতই জানতেন। সুপ্রীম-কোর্ট যদি শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে রায় দেয় তাহলে বিদ্রোহ করার ঝুঁকি না নিয়েই প্রধানমন্ত্রীত্বের মুকুট তাঁরই শিরোপরি স্থাপিত হবে। কাজেই ঐ বিচারের জন্য তিনি অপেক্ষা করতে পারেন।

চবনের পক্ষে অবশ্য শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষমতা রক্ষা হওয়ার অর্থ তাঁরও ক্ষমতা রক্ষা হওয়া। (চবনকে সিণ্ডিকেট বলেছিলেন, ১৯৭২ সালের নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত মোরারজীকে প্রধানমন্ত্রী করার বিষয়টি যেন তিনি অনুমোদন করেন।) তাঁর উচ্চাকাঙ্খা ছিল শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভায় দু-নম্বর স্থান পাওয়া। ১৯৬৯-য়ের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় চবন সিণ্ডিকেটের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন। কেননা তখন তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আশা ছিল। পুরাতনপন্থীরা যখন দরকষা-কষি শুরু করলেন তখন তিনি আবার শ্রীমতী গান্ধীর দিকে ভিড়লেন। বিরোধীদের কাছে তাই তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা খুবই কম। শ্রীমতী গান্ধীকে ছেড়ে দিলে তাঁর কোন লাভই নেই কেননা জে-পি (১৯৭৪ সালে এক সাক্ষাৎকার জেপি একথা আমাকে বলেছিলেন) ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য তিনি চবনের চেয়ে জগজীবনরামকে বেশী পছন্দ করবেন।

স্বরণ সিংয়ের এই খ্যাতি ছিল তিনি কোন বিতর্কিত মানুষ নন। কিন্তু তাঁরও মনে আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল যখন তিনি প্রধানমন্ত্রীরই এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর কাছে শুনেছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রীকে যদি পদত্যাগ করতেই হয় তাহলে অন্তবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁকে মনোনীত করা হবে। তিনি ভেবেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী নিজের থেকেই পদত্যাগ করবেন। যদিও তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রীকে বলে এসেছিলেন যে তিনি পদত্যাগ করলে সর্বনাশ হবে। তবু এই ধারণা ও সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়েছিলেন যে পদত্যাগ করাটা তাঁর পক্ষে অন্যায় হবে না।

শ্রীমতী গান্ধীর আইন বিষয়ক পরামর্শদাতারা বিশেষ করে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং গোখলে (এলাহাবাদের মামলায় এঁরাই শ্রীমতী গান্ধীকে ডুবিয়েছিলেন) উভয়েই তাঁর পদত্যাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁরা বোঝালেন যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের মত সুপ্রীমকোর্ট 'জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে' রায় দেবে না। সুতরাং তার বিচারের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। অপর যাদের আইন সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে তাঁরা বললেন, যে অপরাধের জন্য তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সেটা একটা 'টেকনিক্যাল' ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর ফলে পুনরায় তাঁর মনে প্রত্যয় জন্মায়। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের কোন্ অপরাধটা যে 'টেকনিকাল' আর কোন্টা মেটিরিয়াল সেটা অনেকের কাছেই খুব একটা পরিষ্কার নয়। ১৯৫১ সালে এই সংক্রান্ত বিষয়ে দুই রকমের অপরাধ ছিল বড় এবং ছোট। বড় রকমের অপরাধ হলে তবেই নির্বাচন বাতিল করা হত। কিন্তু ১৯৫৬ সালে নেহরুর সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা হয় এবং সহজও করা হয়। নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক আচরণের যে তালিকা ছিল তা কেটে-ছেঁটে অনেক সংক্ষিপ্ত করা হয়। তবে নির্বাচনে সরকারী কর্মচারীকে কাজে লাগানো অপরাধ হিসাবেই নথিভুক্ত থাকে। এই অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় রাজ্যসমূহের বহু মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং বিধানসভা সদস্যকে নিজেদের আসন হারাতে হয়েছে। নির্বাচনে দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় শ্রীমতী গান্ধী নিজে তাঁর কেবিনেট মন্ত্রী চেন্না রেড্ডীকে পদত্যাগ করতে বলেছিলেন।

তিনি যদি এই পূর্ব নজীর অনুযায়ী কাজ করতে চান তাহলে তো তাঁকেই পদত্যাগ করতে হয়। কিন্তু তিনি দলের নেতাদের কাছে ক্রমাগত ঐ একই প্রশ্ন করে চলেন যে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত হবে কি না। এর ফলে তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে তিনি হয়তো এই প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

ফলে তারাও নিজ নিজ রাজ্যের সংসদ সদস্যদের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রজিত যাদবের বাড়ীতে। কম্যুনিস্টদের প্রতি যাদবের প্রীতি সর্বজনবিদিত। সে বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বড়ুয়া। কয়েকজন মাত্র আস্থাবান কংগ্রেস নেতাকেই ঐ বৈঠকে ডাকা হয়। এদের মধ্যে প্রণব মুখার্জীও ছিলেন। তখন তিনি শুধু একজন কনিষ্ঠ মন্ত্রী। সাময়িকভাবে হলেও শ্রীমতী গান্ধীকে যদি পদত্যাগ করতেই হয় তাহলে তাঁর উত্তরসূরী কে হবেন এই নিয়েই তাঁরা আলোচনা করেন।

জগজীবন রাম এবং স্বরণ সিংয়ের মধ্যে কাকে বেছে নেওয়া হবে তাই নিয়েই চিন্তা হচ্ছিল। দুজনের মধ্যে শেষের জনকেই সকলের পছন্দ। কেননা তিনি নিরাপদ এবং সহজে নমনীয়। কিন্তু জগজীবন রাম হলেন মন্ত্রিসভার প্রবীনতম সদস্য। তাঁর দাবিকে উপেক্ষা করলে জনসাধারণই কংগ্রেস নেতৃত্বের গোপন ভীতির কথা প্রকাশ্যে বলে বেড়াবে। সবাই জেনে যাবে যে জগজীবন রামকে কংগ্রেস নেতৃত্ব বিশ্বাস করে না এবং শ্রীমতী গান্ধীকে যদি সুপ্রীম কোর্ট দোষমুক্ত করে দেয় তাহলে হয়তো রাম প্রধানমন্ত্রীর পদ না-ও ছাড়তে পারেন এমন একটা ধারণা বাসা বাঁধবে। সুতরাং তাঁরা যে কী করবেন সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এই সঙ্কটমুহূর্তে জগজীবন রাম যেভাবে তাঁর পাশে থেকে শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছেন তাতে এমনও মনে হচ্ছে যে শ্রীমতী গান্ধী হয়তো তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না। তাঁকে এড়াতে গেলে তিনি যদি বিদ্রোহ করে বসেন তাহলে কংগ্রেস দলে আবার একদফা ভাগাভাগি হয়ে যাবে। অতএব তাঁদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হল না। প্রণব আমাকে বলেছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যদি কেন্দ্রে থাকতেন তাহলে তাঁকেই হয়ত অন্তবর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেছে নেওয়া হত। (উল্লেখযোগ্য: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে রায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন)। এমন কি জগজীবন রামের পক্ষেও বোধহয় তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো শক্ত হত।

কিন্তু এ সবই হল পুঁথিগত আলোচনা। আসলে শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী পদেই রইলেন এবং যখন তিনি ঐ পদে আছেন তখন যে বিপুল জনসমর্থন যা তিনি সর্বদাই পেয়ে থাকেন তা তাঁর দিকেই থাকবে।

কেবিনেট মন্ত্রীগণ, মুখ্যমন্ত্রীগণ এবং রাজ্যের মন্ত্রীগণকে একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে

স্বাক্ষর করতে বলা হল। ঐ স্বাক্ষর দ্বারা তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি পুনরায় তাঁদের আস্থার কথা জানাতে পারবেন। নথিপত্রের রচনায় বিশেষ পটু পরমেশ্বরনাথ হাকসারকে (হাকসার একদা প্রধানমন্ত্রীর খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু এখন আর ততটা নেই। তাঁকে এখন পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান করে দেওয়া হয়েছে কারণ—সঞ্জয় ও কাপুরকে 'ফাঁপিয়ে' তোলার তিনি বিরোধী ছিলেন।) এই প্রতিজ্ঞাপত্রটি তৈরী করতে বলা হল। ১৯৬৯ সালে যখন কংগ্রেস ভাগ হয় তখন তিনিই কংগ্রেসের অপর পক্ষের কাছে প্রেরিতব্য চিঠিগুলি লিখে দিতেন। যাই হোক যে খসড়া তৈরী করে দিলেন তাতে খানিকটা আবরণের আড়াল দিয়ে বিচার বিভাগের সমালোচনা করা হল। কিন্তু এই জায়গাটা এমনভাবে পরিবর্তন করা হল যাতে বিচারপতিরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে যান। তখনও সুপ্রীম কোর্টে প্রধানমন্ত্রীর আপীল-সংক্রান্ত মামলায় শুনানী হতে বাকী। তবে ঐ খসড়ার কার্যকর অংশে লেখা হল: 'শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীপদে আসীন থাকছেন। এটা আমাদের দৃঢ় এবং সুনিশ্চিত অভিমত যে দেশের সংহতি, সুস্থিতি এবং প্রগতির জন্য তাঁর ক্রিয়াশীল নেতৃত্ব অপরিহার্য।'

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এটি আনুগত্যের এক নতুন অঙ্গীকার পত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। সঞ্জয় তার মাকে ক্রমাগত জানাতে থাকে যে কে বা কারা এখনও পর্যন্ত ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছে এবং কে বা কারা সই করে নি? সংবাদপত্রেও এই ক্রমবর্ধমান নামের তালিকা প্রকাশিত হতে থাকলো।

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী ভুবনেশ্বর থেকে দিল্লিতে যখন এলেন তখন সন্ধ্যা ঘুরে গেছে। তিনি শুধু ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করার জন্যই দিল্লিতে এসেছেন। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল পরের দিন সকালের সংবাদপত্রে স্বাক্ষরকারীদের নামের যে তালিকা প্রকাশিত হবে তার মধ্যে যেন তাঁর নাম থাকে। সরকারী তথ্য বিভাগের অফিসাররা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণকে ফোনে জানিয়ে দেন যে, নন্দিনীর নাম যেন স্বাক্ষরকারীদের তালিকায় থাকে। শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি আনুগত্যের কথা সকলকে জানিয়ে দেওয়া তখন খুব দরকার ছিল। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে বার বার ফোন করা সত্ত্বেও একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে বেশ কিছুটা দেরী করে ফেলেন। তিনি হলেন স্বরণ সিং। তাঁর মাথায় তখনও এই চিন্তা ঘুরছিল যে শ্রীমতী গান্ধী পদত্যাগ করলে তিনিই হবেন অন্তর্বর্তীকালীন

প্রধানমন্ত্রী। যাই হোক কয়েক মাস পরেই তাঁকে দেশীতে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দেওয়ার মূল্য চুকোতে হয়েছিল।

এদিকে রাজধানীতে এবং দেশের ছোট বড় সহরে আয়োজিত শোভাযাত্রায় হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়ে স্লোগান দিলেন, 'এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় আমরা মানি না!' রাজ্য সরকারগুলি এই সব শোভাযাত্রা সংগঠনের জন্ত খরচ দিতে থাকলেন। এই ধরণের শোভাযাত্রার অর্থ হল এই যে সুপ্রীম কোর্ট যদি এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে সমর্থন করে তাহলে এরা সেই রায়ও মেনে নেবে না। শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সাকরেদরা সম্ভাব্য সব রকম পরিস্থিতির জন্ম প্রস্তুত হতে থাকলেন। নির্বাচন-সংক্রান্ত মামলায় 'টেকনিকাল' বিষয়ের ভিত্তিতে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে আদালত যদি কোন বিরূপ রায় দেয় তাহলে সেটা মানতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কেননা জনসাধারণের অভিব্যক্ত অভিমত আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না।

শ্রীমতী গান্ধী একটি অভাবনীয় ক্ষেত্র থেকে সমর্থন পেলেন। ইনি হলেন টি, স্বামীনাথন। আগে প্রধানমন্ত্রীর কেবিনেট সচিব ছিলেন। অবসর গ্রহণের বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আরও কিছুকাল রাখা হয়। পরে শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ করেন। স্বামীনাথন ঘোষণা করলেন, আইন মোতাবেক তাঁর এ অধিকার আছে যে তিনি প্রধানমন্ত্রী সমেত যে কোন নির্বাচিত পদাধিকারী ব্যক্তির কোন প্রকার অযোগ্যতা থাকলে সেই অযোগ্যতাসূচক সর্ত খারিজ করে দিতে পারেন। আইনে সেই কথাই আছে। যদিও তাঁর পূর্বসূরী সেনবর্মা ১৯৭১ সালের নির্বাচনী প্রতিবেদনে এই পরামর্শ দেন যে নির্বাচন কমিশনারের কোন প্রকার 'বিধিবহির্ভূত ক্ষমতা' থাকা উচিত নয়।

এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছিল যে, সুপ্রীম কোর্টের রায়কেই চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করার কোন দরকার নেই। কিন্তু সেজন্ম তিনি আদালতের যুক্তকে অবহেলা করেন নি।

তিনি বোম্বাইয়ের নামকরা উকিল নমি এ, পালকিওয়ালার সঙ্গে যোগাযোগ করেন যাতে তিনি সুপ্রীম কোর্টে শ্রীমতী গান্ধীর আপীল-সংক্রান্ত মামলা লড়তে পারেন। পালকিওয়ালাকে ইতিপূর্বে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কেননা তিনি চোদ্দটি ভারতীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণকে আদালতের আদেশ দ্বারা বাতিল করিয়ে দিয়েছিলেন। পক্ষপাতিত্বের যুক্তিতে তিনি মামলায় সরকারপক্ষকে হারিয়ে দিয়েছিলেন এবং রাজন্তভাতা বাতিল করা

সম্পর্কেও তিনি প্রশ্ন তুলে ছিলেন যে পূর্বতন ভারতীয় রাজারা তাদের গচ্ছিত সম্পত্তিরই কিছুটা অংশ ভাতা হিসাবে পেয়ে থাকেন। সুতরাং তাদের এই ভাতা কিছুতেই বন্ধ করা যেতে পারে না, কেননা সম্পত্তি করাব ও রাখার মৌলিক অধিকার ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলবাও মাঝে মাঝে কাজে লাগে।

শ্রীমতী গান্ধীর বার্তা পেয়ে পালকিওয়ালা যিনি ভারতের বৃহত্তম শিল্পসংস্থা টাটাজ-এর সিনিয়র ডিরেক্টর—বিমানযোগে দিল্লি চলে এলেন। পালকিওয়ালা বললেন যে তিনি এ মামলায় জয়লাভ করতে পারেন। কিন্তু ততদিন ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রীপদে আসীন থাকবেন কোন্ গণতান্ত্রিক যৌক্তিকতা বলে? কিন্তু ততদিনে শ্রীমতী গান্ধী একথা সকলকে জানিয়ে দিতে মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রীপদে আসীন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সাময়িকভাবেও তিনি পদত্যাগ করবেন না।

তাঁকে এই রকম একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হয়েছিল, কেননা পদত্যাগ করার জন্য দিনের পর দিন তাঁর উপর চাপ বেড়েই চলেছিল। এবং সে চাপ শুধু বিরোধীদেব তরফ থেকেই আসছিল না। গোয়েন্দা বিভাগ তাকে এই খবর দিয়েছিলেন যে, 'মেঘ কেটে যাওযা' পর্যন্ত অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট থেকে দোষমুক্ত হওয়া পর্যন্ত তাঁর পদত্যাগ করে সরে দাঁড়ানো উচিত বলে কিছু কংগ্রেসীও মনেপ্রাণে চাইতো। প্রাক্তন সমাজতন্ত্রীদের একটি ছোট্ট দল যারা 'তরুণ তুর্কী' হিসাবেই বেশী পরিচিত কেবলমাত্র তারাই ইন্দিরাজীর দলে ছিল। এদের ক্ষমতা যে কতদূর তা তিনি জানতেন। একবার তিনি মোরারজী দেশাইয়ের সুনাম নষ্ট করার জন্য তরুণ তুর্কীদের ব্যবহার করেছিলেন। তরুণ তুর্কী চন্দ্রশেখরের হাতে সেই সব ফাইল তুলে দিয়েছিলেন যার সাহায্যে এটা প্রমাণ করা যাবে যে ইন্সিওরেন্স এজেন্ট হিসাবে জীবন শুরু করে মোরারজীর ছেলে কান্তিভাই দেশাই এত বড় ব্যবসায়ী হল কী করে এবং মোরারজীই বা তাকে কতদূর সাহায্য করেছে।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী গান্ধীর কাজকর্মে তরুণ তুর্কীরা অখুশী ছিলেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি এদের দমন করে রাখতে চাইছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে নির্বাচিত হওয়া থেকে তিনি তরুণ তুর্কী চন্দ্রশেখরকে দমন করতে না পারলেও রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে তিনি অপর তরুণ তুর্কী নেতা মোহন ধারিয়াকে মন্ত্রীসভা থেকে বিতাড়িত করেন। কেননা তিনি জেপির সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন।

আর এখন ধারিয়াই প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন। তিনি বললেন, সুপ্রীম কোর্ট যতদিন না তাঁকে দোষমুক্ত করছেন, ততদিন তিনি জগজীবন রাম অথবা স্বরণ সিংয়ের হাতে সাময়িকভাবে প্রধান মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিজে পদত্যাগ করুন। অন্যান্য তরুণ তুর্কীরাও তাঁর সঙ্গেই আছেন। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, এই দাবিই হয়তো শেষ পর্যন্ত তুষার শিলায় পরিণত হবে।

গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে জানা গেল যে তরুণ তুর্কীরা জগজীবন রামের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে এবং তিনি তাদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ছড়াচ্ছেন। তিনি মোটামুটি প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করে দেন যে, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত বিচার-বিভাগীয় রায়কে এত ছোট করে দেখা উচিত নয়।

তিনি সংখ্যা নিয়েও তখন থেকে খেলা শুরু করে দেন—তিনি প্রকাশ্যেই বলাবলি করতে থাকেন যে, তিনি যদি বিদ্রোহ করেন তাহলে কতজন তাঁর পক্ষে আসবেন। হিসাব করে তিনি হতাশই হন—প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকের সমর্থন তখনও তিনি পাবেন না।

কৌশল রচনায় শ্রীমতী গান্ধী খুবই দক্ষ। তিনি সকলকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁকে যদি পদত্যাগ করতেই হয় তবে তাঁর উত্তরসূরী নির্বাচনের অধিকার তাঁকেই দিতে হবে। তিনি যেমন আশা করেছিলেন তেমনই হল। জগজীবন রাম এবং চবন এর বিরোধিতা করলেন।

শ্রীমতী গান্ধী বারেকের জন্য যখন প্রধানমন্ত্রীর পদ সাময়িকভাবে ছেড়ে দেবার কথা ভেবে ছিলেন তখন ওখানে কমলাপতি ত্রিপাঠীকে যাকে তিনি ইউ পি থেকে কেন্দ্রে এনেছিলেন, তাকে বসাবার কথাই ভেবেছিলেন। জগজীবন রামের পক্ষে এ ছিল এক বিষাদময় অভিজ্ঞতা। কমলাপতি ত্রিপাঠীকে 'অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী' করার কথা যখন বলা হল তখন জগজীবন রাম বললেন, 'আমরা একটি সর্তে ত্রিপাঠীকে সমর্থন করতে পারি, আর সে সর্ত হল শ্রীমতী গান্ধীকে আর ঐ আসনে ফিরে আসতে দেওয়া চলবে না। আমাদের যা করতে হবে তা হল তাঁর বিরুদ্ধে অবিলম্বে কয়েকটি তদন্ত কমিশন বসিয়ে দিতে হবে।'

একজন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী আনুগত্যহীন হতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তিনি দ্রুত তদন্ত করারও ব্যবস্থা করতে পারেন। এতকাল খোদ শ্রীমতী গান্ধীই এতে বাধা দিয়ে এসেছেন। একটা তদন্ত তাঁর বিরুদ্ধে হলেই তাঁর সম্মান এমনভাবে ধূলিলুণ্ঠিত হবে যা পুনরুদ্ধার করা আর সম্ভব হবে না। দেরাজে

একটা কঙ্কাল তো রাখাই আছে, আর তা হল তাঁর ছেলের মারুতি গাড়ী প্রকল্প।

আরেকটি হল অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার রুস্তম সোয়াব নাগরওয়ালা নামক বিচারাধীন বন্দীর আকস্মিকভাবে 'হার্টফেল' করা। (নাগরওয়ালার মৃত্যুর পর ময়না তদন্তে কিছুটা হাত ছিল এমন একজন ডাক্তার আমাকে বলেন, হৃদরোগের লক্ষণগুলি সাজানো ব্যাপারও হতে পারে)। নয়াদিল্লির স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া থেকে নাগরওয়ালা একবার প্রধানমন্ত্রীর গলা নকল করে আরেকবার তাঁর সচিব হাকসারের গলা নকল করে ষাটলাখ টাকা তুলে নিয়েছিলেন, এবং চীফ ক্যাশিয়ার বেদ প্রকাশ যিনি ঐ টাকাটা দিয়েছিলেন তাঁর চাকরি যাওয়ার পর তিনি কংগ্রেস পার্টিতে ঢুকে পড়লেন।

শ্রীমতী গান্ধী যে জগজীবন রামকে অবিশ্বাস করতেন তা বিনা কারণে নয়। তরুণ তুর্কীদের সঙ্গে তাঁর ইতিমধ্যেই ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। দলের মধ্যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র এত বাড়ছিল যে সংসদে তাঁর নিজস্ব লোক কতজন আছে সেটা একবার খতিয়ে দেখার প্রয়োজন ছিল। তিনি সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লিতে ডাকলেন যাতে তারা সবাই নিজ নিজ রাজ্যের এম-পিদের 'নিয়ন্ত্রণ' করতে পারেন। প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর শলাপরামর্শ হবার পর ১৮ জুন তিনি কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠক ডাকতে বললেন যাতে তাঁর প্রতি সকলের দৃঢ় সমর্থনের কথা পুনরায় ব্যক্ত হয়। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং অন্ধ্র প্রদেশ থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্য ভি বি রাজুর উপর এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হল। এঁদের দুজনকে বলে দেওয়া হল যে তাঁরা যে প্রস্তাব তৈরী করবেন তার প্রতি জগজীবন রামের পূর্ণ সমর্থন আদায়ের যেন ব্যবস্থা হয়।

তাঁরা যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এটা নিশ্চিত, কংগ্রেস সংসদীয় দলে সুসংহত সমর্থনের এই প্রমাণ দেখলে রাষ্ট্রপতির পক্ষে শ্রীমতী গান্ধীর পদত্যাগ সংক্রান্ত বিরোধীদের দাবিকে এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব হবে। সংবিধান অনুসারে যতক্ষণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন ও আস্থা তাঁর প্রতি আছে ততক্ষণ তিনি প্রধানমন্ত্রীপদে আসীন থাকতে পারবেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় যখন বেরোয় রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ তখন শ্রীনগরে ছিলেন। এই রায়ের কথা শোনা মাত্রই রাষ্ট্রপতি দিল্লি ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী ফোনে তাঁকে নিরস্ত করে ছিলেন। এর পর থেকে তিন দিন পর্যন্ত প্রতিদিনই ফকরুদ্দিন একবার করে ফোন করতেন আর শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সফরসূচীকে এভাবে সংক্ষিপ্ত করতে

মানা করছিলেন কারণ এর ফলে জনমনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে তিনি বুঝি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করার জন্তই তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন। নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনের বাইরে বিরোধীরা ঠিক ঐ একই দাবিতে ধর্ণা দিতে শুরু করলেন।

১৬ জুন তিনি দিল্লি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। খুব সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার—পনেরো মিনিটেরও কম। এলাহাবাদ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে তিনি যে আপীল করেছেন সে সম্পর্কেই রাষ্ট্রপতিকে সব কথা জানালেন।

অপরাহ্নে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে অকম্যুনিস্ট বিরোধী দলগুলির সাক্ষাৎকার বরং অনেকক্ষণ ধরে হল। বিরোধীরা রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করলেন যে তিনি যেন শ্রীমতী গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করার 'আদেশ' দেন। আমেদ বিরোধীদের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখার আশ্বাস দিলেন। স্পষ্টতঃই তিনি কোন পক্ষ নিতে চাইছিলেন না। তিনি প্রথমে বললেন যে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে কি হয় সেটা আগে দেখা দরকার। কিন্তু ঐ কথা বলার পরই তাঁর মনে হল যে তিনি হয়তো ভুল কথা বলে ফেলেছেন। কেননা তিনি যা বলেছেন তার হয়তো ভ্রান্ত অর্থ করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে সংশোধন করে নিলেন এবং বললেন, তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হল সুপ্রীম কোর্টের বিচার হওয়া পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করা উচিত। তাঁর প্রেস সেক্রেটারী সঙ্গে সঙ্গে একটা 'হ্যাণ্ড আউট' পাঠালেন যাতে খবরের কাগজে অন্ততঃ ভ্রান্ত রিপোর্টিং না হয়।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার পর বিরোধীরা তাঁর বাড়ীর সামনে থেকে ধর্ণা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। কিন্তু তাঁরা স্থির করলেন যে, শ্রীমতী গান্ধীকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্ত আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে। এদের মধ্যে অনেকে আবার কংগ্রেসের সাধারণ সদস্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রধানমন্ত্রীপদের সম্মান সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তোলার প্রস্তাব দিলেন। রাষ্ট্রপতির কাছে যে প্রতিনিধিদল গিয়েছিল তাদের মধ্যে সি পি আই (এম) ছিল না। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী পদত্যাগ দাবিতে অকম্যুনিস্ট বিরোধী দলগুলি যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল সি পি আই (এম) তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল।

শ্রীমতী গান্ধীর পদত্যাগ দাবির কথা জানাতে বিরোধীরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাতে শ্রীমতী গান্ধী খুব বিরক্ত হয়ে ছিলেন। অতীতে এমন

ঘটনা কখনও ঘটে নি। এমন কি ১৯৬২ সালের যুদ্ধে পরাজয়ের পর তাঁর পিতার মানসম্মান যখন একেবারে নিম্নতম বিন্দুতে এসে ঠেকেছিল তখনও কিন্তু বিরোধীরা একযোগে রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন নি।

তিনি অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলেন যে তিনি যেন ক্রমশঃ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর প্রধান দুশ্চিন্তা বিরোধী দলগুলি নয়—তাঁর দুশ্চিন্তা নিজের দলকে নিয়ে এবং এই দলেও অসন্তোষের দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। বেশীর ভাগ সদস্যই চিন্তা করতে লাগলেন যে আগামী ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ এ যে নির্বাচন আসছে তাতে তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে মোটেই লড়াই করতে পারবেন না। জগজ্জীবন রাম এবং তরুণ তুর্কীরা যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব সংসদ সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে এই কথাই বলছিলেন যে বিচার বিভাগীয় রায়ের পবিত্রতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁর অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। এ ছিল এমন এক যুক্তি যা সাধারণ মানুষ না বুঝলেও সংসদের বা বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা খুব ভালো মতই বুঝতে পারেন।

এই সব ঘটনা তাঁকে বিশেষভাবে পীড়িত করছিল। তিনি মাঝে মাঝেই মেজাজ খারাপ করতে শুরু করলেন। তাঁর বক্তৃতায়ও সেই ক্রোধ প্রকাশিত হয়ে পড়তে লাগলো। 'আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ, মিথ্যে প্রচার এবং বিদ্বেষপূর্ণ দোষারোপ করা হচ্ছে সে সবই আমি সহ্য করে আসছি।' তাঁর সমর্থনে আয়োজিত সভা সমাবেশগুলিতে তিনি এই ধরণের কথাও উল্লেখ করতে থাকেন।

তিনি বিচারপতি সিন্‌হার রায় সম্পর্কেও প্রকাশ্য বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন। প্রকাশ্যেই তিনি বললেন, ১৪ জানুয়ারীর পর থেকে যশপাল কাপুর আর সরকারী কর্মচারী ছিলেন না এবং ঐ দিনের পর থেকে তিনি আর সরকারী মাইনেও পান নি। সিন্‌হা বলেছিলেন কাপুর ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত সরকারী কর্মচারী হিসাবে কর্মরত ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য সরকারী কর্মচারীরাই চিরকাল মঞ্চ তৈরী করে থাকেন। তাঁর পিতার আমলেও এই রকমই হত।

তাঁর বক্তৃতায় তিনি বার বার ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সেই সময় তাঁর কট্টর বিরোধী জনসঙ্ঘ পর্যন্ত বলেছে যে, তিনি শুধু কংগ্রেস দলের নেতা নন, তিনি সমস্ত দল ও পন্থের উর্ধে সারা ভারতের নেতা।

তিনি তার প্রতিটি বক্তৃতায় অতীতের মত এখনও বিরোধী দলগুলিকেই আক্রমণ করতে থাকলেন। সরকারী নীতিসমূহের ব্যর্থতার জন্যও তিনি দায়ী করলেন বিরোধী দলগুলিকে। তিনি বললেন, এরা সব 'বিশ্বাসঘাতক'। এরাই প্রগতির পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর অবশ্য তিনি বললেন, 'কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট বাধা বিপত্তি' সত্ত্বেও সমাজবাদ অব্যাহত গতিতে সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে।

বিরোধীদের প্রতি তাঁর পিতার যে মনোভাব ছিল এ হল তার সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব। বিরোধীপক্ষের অনেকেই সেইসব দিনের কথা স্মরণ করলেন যখন জাতীয় নীতি বা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সরকারপক্ষ বিরোধী পক্ষের সঙ্গে বিচার বিনিময় করতেন এবং খাদ্য ও জাতীয় সংহতি নির্মাণের কর্মসূচী রূপায়ণে সাধারণরূপে বিরোধীদের সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। এখনও মাঝে মাঝে বিরোধী দলগুলিকে ডাকা হয় বটে তবে সেখানে শুধু কংগ্রেস কোন সমস্যার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই কথাই জানানো হয়। বিরোধীরা জানে যে সংসদে তাদের সদস্য সংখ্যা অল্প। নেহরুর সময়ও এই রকম অল্প সংখ্যক বিরোধী সদস্যই সংসদে ছিল। তবুও কিন্তু তাদের সঙ্গে তখন শলাপরামর্শ করা হত এবং সরকার তাদের কথা শুনতেন। নেহরু কখনও মনে করতেন না যে তাঁকে অথবা তাঁদের সরকারকে কোন প্রশ্ন করবার অধিকার বিরোধীদের নেই। তিনি সব সময় বিরোধী মত পোষণকারীদের উৎসাহ দিতেন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদের ভূমিকাকে তিনি সর্বদা মর্যাদা দিয়ে গেছেন।

শ্রীমতী গান্ধীর কাছে বিরোধীপক্ষের অর্থ হল একটা উটকো ঝামেলা। তিনি বিরোধীদের সম্পর্কে সবসময়ই এই অভিযোগ এনে থাকেন যে, এরা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশকে অচল করে দিতে চায়। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি ১৯৭৪ সালের রেলওয়ে ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করে থাকেন। রেলওয়ের মোট সাড়ে তেরো লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে দৈনিক মজুরীতে খাটে সাড়ে তিন লক্ষ কর্মচারী। এদেরও আবার শতকরা পঁয়ষট্টিজন ধর্মঘটের ডাকে সাড়া দেয়। কিন্তু সরকার চূড়ান্ত দমনমূলক ব্যবস্থার সাহায্যে এই ধর্মঘট ভেঙে দেন। দলে দলে লোককে ছাটাই করা হয়, আটক করা হয়, ধর্মঘটি কর্মীদের পরিবারবর্গকে রেলওয়ের কোয়ার্টার থেকে বিতাড়িত করা হয়। রেলওয়ে ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে ন্যায্য মূল্যে জিনিসপত্র বিক্রী বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্রমিক কলোনীতে বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের লাইন কেটে দেওয়া হয়।

দেশে রাজনৈতিক প্রতারণা ও অরাজকতার প্রসার সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে থাকলেন। একথা ঠিক যে একটা সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন ছিল উত্তপ্ত এবং কারখানা সমূহে অধিক মাত্রায় 'শ্রম ঘণ্টা ও দিন' নষ্ট হয়েছে।

বিরোধীদের কাছে তিনি ছিলেন একজন উচ্চাকাঙ্খী ডিক্টেটর বা স্বৈরাচারী শাসক যাকে পদচ্যুত করাই বাঞ্ছনীয়। জেপি তাঁর আক্রমণকে আরও জোরালো করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনি 'একটি মহিলার সরকার' হিসাবে বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি বলা শুরু করেছিলেন যে, 'গণতন্ত্রের বহিরাবরণে ঢাকা দিকে সেই মহিলাটির সরকার স্বৈরতান্ত্রিক সরকারে পরিণত হয়েছিল।' শ্রীমতী গান্ধীর দলের লোকেদের কণ্ঠে অস্পষ্টভাবে হলেও এই যুক্তিরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

সবকিছুর ওপরে আইনগত মতামতও মোটেই উৎসাহ ব্যঞ্জক ছিল না। আইন বিষয়ে দেশের সবচেয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরাও এই অভিমত দিচ্ছিলেন যে সুপ্রীমকোর্ট থেকে খুব বেশী হলে তিনি সর্তসাপেক্ষ 'স্টে অর্ডার' পেতে পারেন যদিও 'চূড়ান্ত বিচারের' সময় তাঁকে হয়তো দোষমুক্ত করা হলেও হতে পারে। সর্তসাপেক্ষ 'স্টে' বলতে যা বোঝায় সেই বিধ্বস্ত ভাবমূর্তি নিয়ে কি তিনি দেশ শাসন করতে পারবেন?

ইতিমধ্যেই 'রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা' তাঁর পক্ষে বেশ কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠেছে বলে তিনি একজন সম্পাদকের কাছে অকপটে স্বীকার করেছেন। বিরোধীদের চাপ—জেপি'র বক্তৃতা শুনতে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ এবং নিজ দলের মধ্যেও বিদ্রোহের চাপা আগুন সবকিছু মিলিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে ভবিষ্যত অমঙ্গলের পূর্বলক্ষণগুলি যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এলাহাবাদ হাঃকোর্টের বিচার ও তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে তাতে ঐ অমঙ্গলই যেন দানা বেঁধেছে। তাঁর মনে হল সংবাদপত্র কখনই তাঁর সাফল্যকে গুরুত্ব দেয় নি কিম্বা তাঁর অসুবিধা সম্পর্কেও ভেবে দেখার চেষ্টা করে নি। নয়াদিল্লির একটি দৈনিক সংবাদপত্র তো তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে বিরোধীদের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও যুক্ত আছেন বলে বর্ণনা করে দিয়েছে। এবিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ নেই যে আজকের সংবাদপত্র মতবাদদুষ্ট। একবার তিনি সংবাপত্রের সম্পাদকদের কাছে বলেছিলেন, যে তিনি কোন খবরের কাগজ পড়েন না কারণ তিনি জানেন যে কোন কাগজে কী লিখবে'।

সাংবাদিকদের সম্পর্কে তিনি অতি নিম্নস্তরের মনোভাব পোষণ করতেন। এরা যে ক্রয়যোগ্য একথা তিনি জানতেন। প্রকৃতপক্ষে ললিতনারায়ণ মিশ্রের কাছে তিনি শুনেছেন যে কীভাবে তিনি হুইস্কির নগদ টাকা এবং স্যুটের কাটপিসের বিনিময়ে দিল্লির বহু সাংবাদিককেই তিনি নিজের কাজে রেখেছিলেন। তাঁর নির্দেশমত অনেক সময় তাঁর দপ্তর সেই সব 'প্রগতিশীল' সাংবাদিকদের কাছে লাগিয়ে তাঁর বিরোধীদের সমালোচনার পাল্টা জবাব লেখাবার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এখন তারা সবাই, মনে হচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধেই জোট বেঁধেছে।

তিনি তাঁর চৌহদ্দির শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, শত্রুরা তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। তাঁর ছেলে সঞ্জয় এবং ধবন সমেত তার দল ছাড়া আর সকলেই যেন তাঁকে টেনে নামাতে চাইছে।

বিক্ষোভ বাড়ছিল; দারিদ্র্য দূরীকরণের তাঁর যে স্লোগান তার দ্বারা সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের মান মোটেই উন্নত হয় নি। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬৫-৬৫ পর্যন্ত দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির হারও শতকরা সাড়ে তিন ভাগ বেড়েছে। কিন্তু তাঁর শাসন কালে এই বৃদ্ধির গড় হিসাব হল শতকরা ১৫ ভাগ। ইতিপূর্বে তিনি যা কোন দিন দেখেন নি এবার তাঁকে তাই দেখতে হল—বিরোধী পক্ষের অধিকাধিক সদস্য সোচ্চার কণ্ঠে তাঁর বিরোধিতা করলেন।

তিনি উপলব্ধি করলেন যে ঘটনার গতি যে খাতে বইছে সেটা তাঁর পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাইরে তাঁর সমালোচকদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে হলে তাঁকে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং শ্রীমতী গান্ধী এখন থেকেই সেই দিকে চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন। বিরোধী দলগুলি জনমতকে তাদের দিকে টেনে নিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে সবকটি রাজনৈতিক দলও তখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে এবং কংগ্রেসের ভেতর থেকেই দলের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়েছে।

যে বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত শক্তি সংসদে কংগ্রেসের শক্তির এক ষষ্ঠাংশও নয় তাদের সম্পর্কে 'কিছু' একটা করার প্রয়োজন ছিল। একটা বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন যে একবার তিনি কোন কাজ করবেন ভাবলে সেকাজ খুব তাড়াতাড়ি করতে পারতেন। কেননা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেই তো সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল।

আসলে এই পদ্ধতির সূত্রপাত হয় তাঁর পূর্বসূরী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমল থেকে। তাঁর সচিব এল, কে, ঝা সমস্ত বিষয়কে নখদর্পণে রেখেছিলেন।

সেইজন্ত তাঁকে সুপার সেক্রেটারী বলা হতো। ঝা যে পথে চলেছিলেন শ্রীমতীগান্ধীর সচিব সিভিল সার্ভিসের হাকসার তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। সমস্ত পদ্ধতিটাকে তিনি এমনভাবে ঢেলে সাজান যে সমস্ত বিষয়েরই ঘোরাফেরা শুরু হয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে কেন্দ্র করে। এই দপ্তরকে না জানিয়ে একজন ডেপুটি সেক্রেটারী নিয়োগ পর্যন্ত সম্ভব ছিল না। এই একটি দপ্তরের মধ্যেই তিনি একটি মিনি-সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দপ্তরের প্রত্যেক অফিসার কোন একটি বিষয়ে যাবতীয় কাজকর্ম দেখা-শোনা করতেন—তা সে আর্থিক বৈদেশিক অথবা বৈজ্ঞানিক যে বিষয়ই হোক না কেন। অন্যান্য সমস্ত মন্ত্রক এদের কাছ থেকেই নির্দেশ গ্রহণ করতেন। তবে হাকসারের অবদান হল তিনি সম্পূর্ণ বিষয়টি রাজনীতি-করণ করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী যুগে এই প্রথম সরকারী যন্ত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রয়োজনবোধে কংগ্রেস পার্টির স্বার্থেও এর ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। কয়েক বছর পরে অবশ্য তিনি যা করেছেন সেজন্য তাঁকে অনুতপ্ত হতে হয়েছিল।

শ্রীমতী গান্ধী এই দপ্তরকে সেইসব মানুষকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও দেন যারা 'নিরাপত্তা' বিধান করতে পারে। কেন্দ্রে তাঁর অধীনে ছিল সাত লক্ষ পুলিশ। এরা যে সমস্ত সংস্থাভুক্ত ছিল সেগুলি হল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেণ্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ( সি আর পি ), সেণ্ট্রাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স ( সিআইএস এফ ) এবং হোমগার্ড। বিভিন্ন রাজ্যে যত পুলিশ আছে ( বলা হয় এই সংখ্যা প্রায় ৮০,০০০-এর মত ) উপরোক্ত পুলিশের সংখ্যা এ থেকে পৃথক। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনীতে আছে দশলক্ষ মানুষ।

চূড়ান্তভাবে কিছু একটা করার জন্য বিরোধীরা প্রস্তুত হচ্ছিল, কংগ্রেসের ভেতরে তাঁর যে শত্রু ছিল তারা রাজনৈতিক যুদ্ধে যা করতে পারেনি এবার তারা সেই কাজই করবার জন্য এগিয়েছিল অর্থাৎ একজন 'ন্যায় ভ্রষ্ট' বিচারপতির রায়কে কাজে লাগিয়ে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। প্রয়োজন পড়লে তিনিও এসবের বিরুদ্ধে অনেক দূর পর্যন্ত এগোতে পারতেন।

সঞ্জয়ের কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না এবং সেকথা সে বলেও ছিল। হাইকোর্টের রায়দানের পর শ্রীমতীগান্ধী যখন ক্ষমতা ও ন্যায়নীতির দোলায় দুলছিলেন তখন সঞ্জয়ই তাঁকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে। তাই সঞ্জয়ই এখন তাঁর প্রধান পরামর্শ দাতা। এবং একথা সঞ্জয়ই তাঁর মার কাছে

প্রমাণ করেছিলেন যে, দেশ ও দেশের মানুষের কাছে এখনও তাঁর ( শ্রীমতী-গান্ধীর ) প্রয়োজন আছে।

সঞ্জয় ক্রমাগত তার মায়ের কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে একটা কথা তাঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিল যে, বিরোধীদের প্রতি তাঁর আচরণ প্রশ্রয়পূর্ণ এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও তিনি ভয় পান। তাঁর দুর্দিনের বন্ধু বংশীলালও এই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। হরিয়ানায় তিনি বিরোধীদের মারপীট করে, জেলে পুরে এবং পুলিশের দ্বারা উত্যক্ত করে তাদের কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। বংশীলাল তাঁকে বললেন, 'প্রয়োজন পড়লে আমি তাদের সকলকে জেলে পুরে দিতাম। বহেনজী, ( বোন ) বিরোধীদের আমার হাতে ছেড়ে দিন। দেখুন, আমি কীভাবে তাদের শায়েস্তা করি। আপনি বড্ড বেশী গণতান্ত্রিক এবং নরম।' তিনি আরও জানালেন, মানুষ শক্তের ভক্ত। একমাত্র শক্ত মানুষই দেশের ভালো করতে পারে, যেমন আমি আমার রাজ্যে প্রমাণ করেছি।

আসলে সকল মুখ্যমন্ত্রীই তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলছিলেন যে, ঘটনার দ্বারা যদি আবৃত হয়ে পড়তে না চান তাহলে এক্ষুণী তাঁর 'কিছু একটা' করা দরকার। তিনি সবকিছু সঞ্জয়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেননা সবরকম চাপের সামনে মাথা না নোয়ানোর শক্তি সঞ্জয়ই তাঁকে যুগিয়েছিল এবং পদত্যাগের ব্যাপারে তার অন্ধ সমর্থকরা পর্যন্ত যখন দোনামনা করছিলেন তখন সঞ্জয়ই তার মাকে পদত্যাগ করতে নিষেধ করেছিল।

১৫ জুন থেকেই সঞ্জয় সবকিছু ঠিক করে দেবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করে দেয়। পরে একথা সে তার বন্ধুদের জানিয়েছিল। রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক পর্যায়ে সরকারী ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজানোই তার উদ্দেশ্য ছিল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করা তার ঠিক ধাতে ছিল না। পদ্ধতিগত দীর্ঘসূত্রতার ভেতর দিয়ে যাবার মত ধৈর্যও তার ছিল না। তার কিছু সময় দরকার ছিল—অথচ হাতে সময় ছিল খুব অল্প।

প্রথম কাজ সে যা করলো তাহল নিজের ঘরে সে দুটি 'সেক্রোফোন' লাগাবার ব্যবস্থা করলো। এ সেক্রোফোনে কথা বলার অধিকার কেবল মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ আমলার। সকলেই জানতো যে সঞ্জয় প্রধানমন্ত্রীর হয়ে কাজ করছে, তাই চটপট সব কাজ হয়ে যেতে থাকলো। সেক্রোফোনের সাহায্যে সে যে কারও সঙ্গেই সরাসরি কথা বলতে পারতো এবং সেজন্য সেক্রেটারীর মাধ্যমে লাইন পাওয়া বা কথা বলার দরকার ছিল না।

সে কি করতে চলেছে তার কোন ইঙ্গিত ও সে আগেভাগে প্রকাশ করে ফেলেনি। কিন্তু সে বিশ্বাস করতো প্রত্যেকটি বিরোধীকে হয় কেনা যায় আর না হয় ধ্বংস করে দেওয়া যায়। এ ব্যাপারে কোন বিবেক যন্ত্রনা থাকা উচিত নয়। স্বৈরতন্ত্র সে পছন্দ করে। একটি পশ্চিম জার্মানীর সংবাদ-পত্রকে সে বলেছিল, ঐ স্বৈরতন্ত্র ঠিক 'হিটলার ধরণের হোক তা আমি চাই না।' লোকের মনে যদি একবার ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে হয় তারা সবকিছু মেনে চলতে শিখবে, আর না-হয় অযথা কথা বলবে না। সঞ্জয় দেশের মানুষের কাছে আজ্ঞানুবর্তিতা চেয়েছিল এবং সেটা প্রতিষ্ঠার কোন পদ্ধতিই তার কাছে অকিঞ্চিৎকর ছিল না।

তার একনায়কতন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ ছিল সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ করা এবং বিরোধীদের কিছু নেতৃস্থানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মুখ বন্ধ করা। এটা করতে পারলেই দেশে 'শৃঙ্খলা' ফিরে আসবে। সরকারের যা পছন্দ নয় এমন কোন কিছুই সংবাদপত্র প্রকাশ করতে পারবে না, এবং বিরোধীরাও 'অবাঞ্ছিত' বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবে না।

সংবাদপত্রের কণ্ঠ জোর করে রুদ্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীমতী গান্ধী এবং সঞ্জয় বহুবার সকালের প্রাতঃরাশের টেবিলে বসে এই আলোচনা করেছেন যে বিরোধী দলগুলিকে মাথায় চড়াবার জন্য দায়ী হল সংবাদপত্র। এদের জন্যই সারা দেশে 'সরকারের প্রতি একটা অবিশ্বাসের আবহাওয়া' গড়ে উঠেছে। কিন্তু এরা কাগুজে বাঘ ছাড়া আর কিছুই নয়। সঠিক পথে কীভাবে চলতে হয় তার শিক্ষা এদের দিতে হবে।

মারুতি ফ্যাক্টরী স্থাপনের সময় থেকেই সঞ্জয় কখনই সংবাদপত্রের উপর প্রসন্ন হতে পারে নি। ঐ ফ্যাক্টরী এবং তার সম্পর্কে সংবাদপত্রগুলি অযথা অনেক কথা ছেপেছে। এত কথা ছেপেছে যা সঞ্জয়ের মোটেই ভালো লাগে নি। যদিও ঐ নতুন কারখানায় সংবাদপত্রের সম্পাদকদের পরিদর্শনের ব্যবস্থা সে করেছিল।

এজন্য সে বেশীর ভাগ দোষই চাপিয়েছিল তথ্যমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরালের উপর। সে বলেছে, সাংবাদিকদের সঙ্গে গুজরালের বন্ধুত্ব থাকলেও সরকারের প্রতি সমর্থন সূচক কোন কিছু তিনি ঐ সব সাংবাদিককে দিয়ে লেখাতে পারেন নি। এই বিষয়ে তিনি ছিলেন পক্ষপাতদুষ্ট। ১৯৬৯ সালে যখন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয় তার পর থেকে শ্রীমতীগান্ধীকে ঘিরে রেডিও, টি-ভি ও সরকারী প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে যে ব্যক্তি পূজার পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছিল তার

সবটুকুর দায়িত্ব ছিল গুজরালের। সরকারী বিজ্ঞাপন দিয়ে তিনি সংবাদপত্রকে বিশেষ করে ছোট ও দুর্বল সংবাদপত্রকে প্রভাবিত করেছিলেন। দেশের একক বৃহত্তম বিজ্ঞাপনদাতা হিসাবে সরকার চাইলেই ঐ সূত্রে অনেককে অনুকম্পা প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরুবার পর গুজরালকে সেই রকম উৎসাহী মনে হয় নি।

সঞ্জয়ের দুই সহযোগী ধবন এবং বংশীলালও গুজরাল এবং সংবাদপত্র দুটোর কাউকেউ ভালো চোখে দেখে নি। ধবনের মতে গুজরাল সাংবাদিকদের অত্যাধিক প্রশ্রয় দিয়েছেন। সুতরাং তাদের বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনা দরকার। বংশীলাল তাদের জানালেন যে চণ্ডীগড়ের ট্রিবিউন পত্রিকাকে সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে কীভাবে শায়েস্তা করেছিলেন এবং পুলিশের মাধ্যমে কীভাবে তিনি ঐ সংবাদপত্র বহনকারী গাড়ীগুলিকে হরিয়ানার এলাকা দিয়ে যাওয়ার দায়ে জরিমানা করেছিলেন।

কিন্তু একটি ছোট রাজ্যে যা করা সম্ভব, তা কী ভারতের সকল রাজ্যের সকল সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রনের জন্য করা সম্ভব? সঞ্জয়ের বন্ধু কুলদীপ নারাঙ্ (এর গাড়ীতে বসেই সঞ্জয় একদিন রাতে দিল্লির উইমেন্স হোস্টেলের সামনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং নারাঙ্ পরে মামলাটি মিটিয়ে দেন)—দিল্লির এক উদীয়মান ব্যবসায়ী সঞ্জয়ের হাতে সেন্সরশিপের আইন-কানুন সম্বলিত একটি পুস্তিকা তুলে দেন। ফিলিপাইনসে সেন্সরশিপ চালু করার পর কী নীতি অবলম্বিত হয়েছিল এবং ফিলিপাইনস সরকার সেন্সরশিপ কার্যকর করার জন্য সরকারী স্তরে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল সেসব কথাই ছিল ঐ পুস্তিকায়। নারাঙ্ এই পুস্তিকাটি পেয়েছিলেন নয়াদিল্লির মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত একজন বন্ধুর কাছ থেকে।

জেপি এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা জানুয়ারী মাস থেকেই স্থির হয়েই ছিল। এ তথ্য আমি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে কর্মরত এক ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করি। তিনি বলেন, কীভাবে সবকিছু 'অধিগ্রহণ' করা হবে তার জন্য কিছু কিছু পরিকল্পনা করা হয়েছে। এদিক ওদিকের কিছু ছাড়া ছাড়া তথ্য তিনি পেলেও পুরো পরিকল্পনাটি সম্পর্কে তিনি অবহিত হতে পারেন নি। তবে তিনি যে সব তথ্য জেনেছিলেন তার মধ্যে দুটি বিষয় সম্পর্কে তিনি সুনিশ্চিতরূপে উল্লেখ করেন, জে-পি গ্রেপ্তার হবেন এবং আর-এস-এস-কে নিষিদ্ধ করা হবে।

খবরটা জানার সঙ্গে সঙ্গেই যদিও আমি জনসঙ্ঘের দৈনিকপত্রিকা

'স্টেটস্‌ম্যানে' এবং 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে' খবরটা জানিয়ে দিই। 'স্টেটস্‌ম্যানে' পরের দিন নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়—

'নয়াদিল্লি, জানুয়ারী ৩০—ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে (আর এস এস) নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সরকার জয়প্রকাশকে গ্রেপ্তার করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

'আশা করা যাচ্ছে যে আগামী ২-৩ ফেব্রুয়ারী রাত থেকেই আর এস এসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হবে এবং ৩ ফেব্রুয়ারী পাটনা বিমান বন্দরে নামার সঙ্গে সঙ্গেই জয়প্রকাশকেও গ্রেপ্তার করা হবে।

'শ্রীগফুর (বিহারের মুখ্যমন্ত্রী) প্রধানমন্ত্রীর ঐ সিদ্ধান্তে প্রতিধ্বনি করে বলেন, 'যে কোন আদেশ পালনেই আমি রাজী'।

এই দুটি সিদ্ধান্তই এই সপ্তাহের প্রথমদিকে কেবিনেটের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ক কমিটি গ্রহণ করেছে।

'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় (৮ জানুয়ারী সিদ্ধার্থ রায় শ্রীমতীগান্ধীকে একটি চিঠি লিখে অনুরোধ জানানোয় অর্ডিনান্স বলে আর এস এসকে নিষিদ্ধ করা হয়)। ১৯৬৯ সালে ইনি প্রধানমন্ত্রীর জন্য মধ্যরাত্রের বার্তা তৈরী করে দিতেন—অর্ডিনান্সের খসড়া তৈরীতে তাঁরও হাত ছিল।

'অর্ডিনান্সে আর এস এস সম্পর্কে সেই সব মিথ্যা কথাই বলা হয়েছে যার উল্লেখ মাঝে মাঝেই করা হয়ে থাকে যে, আর এস এস একটি গুপ্ত সংস্থা এবং অহিংসায় সে মোটেই বিশ্বাস করে না। এবং এই সূত্রে এল, এন, মিশ্রের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে টেনে এনে বলা হল যে, 'আর এস এস এবং জে-পির আন্দোলনের ফলেই ওখানে একটা হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।...'

'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে জেপির গ্রেপ্তার সম্পর্কে কোন কথা না বললেও তার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়। বাকীটা অবশ্য পুরোপুরিই ছাপা হয়।

নয়াদিল্লি, জানুয়ারী ৩০—রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে নিষিদ্ধ করার জন্য অর্ডিনান্স জারি হতে চলেছে বলে এখানকার রাজনৈতিক মহলে কথা উঠেছে।

এবিষয়ে অনুমানের সূত্রপাত হয় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী আবদুল গফুর কর্তৃক বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত এক বিবৃতি থেকে। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিহারে জয়প্রকাশের আন্দোলনকে দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে।

'উল্লেখ করা যেতে পারে যে মিঃ গফুর শ্রীনারায়ণের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনাকেও

একেবারে উড়িয়ে দেন না। এই সপ্তাহের শেষে কিম্বা আসছে সপ্তাহের প্রথমে সর্বোদয় নেতাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে মনে হয়।

'সংস্থার বিশিষ্ট নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করার পরই আর এস এসকে নিষিদ্ধ করা হবে। গ্রেপ্তারের তালিকা ক্রমশঃ আরও বড় হতে পারে...'

জনসঙ্ঘের প্রতি শ্রীমতীগান্ধীর ঘৃণা সর্বজনবিদিত। ১৯৭৩ সালের মার্চে দিল্লিতে যখন জনসঙ্ঘ এক বিক্ষোভ প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করে তখন শ্রীমতী গান্ধী নিজে দিল্লির ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের হাতে জনসঙ্ঘ নেতৃবৃন্দের নামের একটি তালিকা দিয়ে বলেছিলেন এদের গ্রেপ্তার করা চাই। পুলিশ কতৃপক্ষ সেই সময় অতজনকে গ্রেপ্তারের মত পরিস্থিতি হয়েছে বলে মনে করছিলেন না। কিন্তু ওটা যে প্রধানমন্ত্রীর আদেশ সেকথাও স্বীকার করা যায় না। এর পরেই দিল্লি প্রশাসনের উপর মহলের আমলাদের ব্যাপকভাবে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়। ঠিক এই সময়েই সঞ্জয় ও ধবন কেন্দ্র শাসিত দিল্লি প্রশাসনের মাথায় সেই সব আমলাদের বসিয়ে দেয় যারা ভবিষ্যতে তাদের প্রতি আনুগত্য রাখবে।

সঞ্জয় যখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছিল ঠিক তখনই জানুয়ারী মাসে দিল্লি প্রশাসনকে নিজের কুক্ষিগত করার এই সুযোগ তার হাতে এসে যায়। প্রতিটি ব্যাপারেই শ্রীমতীগান্ধীর সঙ্গে পরামর্শ করা হত। প্রথম দিকে জেপিকে এবং মোরারজীকে গ্রেপ্তার করায় তাঁর মত ছিল না। কিন্তু পরে তিনি এর যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে পারেন। তাঁদের মত নেতাকে মুক্ত রাখা খুবই মারাত্মক, কেন না তাঁরা যে কোন প্রকারের গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক ওম মেহ্‌তা এই ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করলেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দু'নম্বর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও আসল ক্ষমতা তাঁর হাতেই ছিল। কেননা তিনি প্রধানমন্ত্রীর খুব কাছের মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে অনেক সময় ওম মেহ্‌তা না বলে বলা হত হোম মেহ্‌তা। 'সংবিধান বহির্ভূত' যে কোন কাজের জন্য সঞ্জয় তাঁকে ব্যবহার করত।

ধবন আবার মেহ্‌তাকে খুব ভালো চোখে দেখতো না। কেননা মেহ্‌তার সঙ্গে সরাসরি সঞ্জয়ের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগার সময় এটা নয়। সকলকে এখন এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। ধবনের গুরুত্বও কিছু কম ছিল না। কেননা খোদ ইন্দিরা গান্ধী উচ্চপদস্থ আমলা এমন কি মন্ত্রীকে পর্যন্ত খবর পাঠাতে হলেও ধবনকে দূত হিসাবে ব্যবহার করতেন। তিনি যা চাইতেন ধবন তারই প্রতিনিধিত্ব করতো।

শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে বংশীলালের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। বংশীলালকে বলা হল যে তিনি যেন একটা কথা মুখ্যমন্ত্রীদের কানে তুলে দেন যে ১৮ জুন যখন দিল্লিতে তাদের সম্মেলন হবে তখন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে পারে। বংশীলাল সবাইকে একথা বলতে রাজী হলেও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং নন্দিনী শতপথীর সঙ্গে কথা বলতে রাজী হলেন না। কারণ ওরা দুজনেই কম্যুনিস্ট। তিনি এবং সঞ্জয় উভয়েই ঐ দুজনকেই ভালো চোখে দেখেন না। অগত্যা শ্রীমতী গান্ধী বললেন, ঐ দুজনকে তিনি নিজে একথা জানিয়ে দেবেন।

সম্ভাব্য ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ অবশ্য তাদের দিতে বলা হয় নি। তবে প্রতিটি রাজ্যে যে সব বিশ্বাসযোগ্য আমলারা আছেন তাদের জানিয়ে দেওয়া হতে থাকলো যে তাদের অতঃপর কি করতে হবে। দিল্লিতে যেখানে বেশীর ভাগ বিরোধী নেতারাই উপস্থিত ছিলেন তার দায়িত্ব দেওয়া হল কিষণ চাঁদের উপর। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস এবং দিল্লির লেঃ গভর্নর। বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে তাঁকে আবার তুলে আনার জন্য তিনি সঞ্জয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। সঞ্জয়েরর সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ছিল। সঞ্জয়ে দুন স্কুলের সহপাঠী নবীন চাওলা ছিল লেঃ গভর্নরের স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

তখনও কিন্তু জরুরী অবস্থার কোন কথাই ওঠে নি। সংবাদপত্র ও বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে 'কিছু ব্যবস্থা' গৃহীত হবে কেবলমাত্র এইটুকুই তখনও পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থা কি হতে পারে তা নিয়ে কেউ কোন আলোচনা করে নি। বৈধানিক এবং সংবিধানিক নির্দেশাদি কি আছে না আছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু সর্বত্র একটা দৃঢ় প্রত্যয় বর্তমান ছিল : যে করেই হোক এই জটিলতা থেকে মুক্ত হতেই হবে।

সেই 'ব্যবস্থা' কবে থেকে কার্যকর করা হবে তার দিনক্ষণ তখনও স্থির হয় নি। শ্রীমতী গান্ধীর কাছে অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটাই খুব পরিষ্কার ছিল। এলাহাবাদের বিচারের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে তিনি যে আপীল করেছেন তার রায় বেরোবার পরই তিনিই ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাঁর উকিলরা আপীলের জন্ম কাগজপত্র তৈরী করছিলেন। ভ্যাকেশন জজ বিচারপতি ভি. আর, কৃষ্ণ আয়ারের (১৯৭২ সালে আয়ারকে যখন সুপ্রীম কোর্টের জজ হিসাবে নিয়োগ করা হয় তখন প্রধান বিচারপতি এস এম সিক্রি ঐ নিয়োগে এই বলে বাধা দিয়েছিলেন যে আয়ার একজন কম্যুনিস্ট) কাছে

ঐ আপীল পেশ করা হবে। শ্রীমতী গান্ধী মনে করেন যে, 'আদর্শগতভাবে' আয়ার তাঁর পক্ষেরই লোক।

একদিকে তাঁর ছেলে ও অন্যান্যরা মিলে যখন 'যুদ্ধের পরিকল্পনা' রচনায় ব্যস্ত ছিল তখন অপরদিকে তিনি নিজে দলের সকলের সমর্থন পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং মনে হচ্ছিল যে তিনি জয়লাভ করবেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং রাজু 'সমর্থনসূচক প্রস্তাবটি' নিয়ে জগজীবন রামের কাছে গেলেন এবং বললেন, প্রস্তাবটি যেন তিনিই উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাবে শ্রীমতী গান্ধীর উপর যে 'দলের পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস' আছে সেকথা পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছিল এবং একথাও আবার বলা হয়েছিল যে, পার্টি বিশ্বাস করে যে, 'প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশের নেতৃত্বদান করায় তাঁর অবদান অপরিহার্য।' ঐ প্রস্তাবে জগজীবন রাম কোন পরিবর্তনই করলেন না। প্রকৃতপক্ষে রাজুকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বললেন যে তিনি কংগ্রেসকে 'এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দিয়েছেন।'

শ্রীমতী গান্ধী জগজীবনরামের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়ে বললেন যে, তরুণ তুর্কীরা যাতে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কিছু না বলে সেটা যেন রাম দেখেন। তরুণ তুর্কীরা রামকে বললো, এই প্রস্তাব সমর্থন করতে তাদের কোন আপত্তিই নেই—যদি শেষের বাক্যটি প্রস্তাব থেকে বাদ দেওয়া হয়। ঐ বাক্যটি হল, 'প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর নেতৃত্ব প্রদান করতে থাকা দেশের পক্ষে অপরিহার্য।' তাদের ঐ অংশ সম্পর্কে কোন আপত্তিই নেই যেখানে বলা হয়েছে, 'শ্রীমতী গান্ধী আজকের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং পুনরুজ্জীবিত ভারতের প্রতীক স্বরূপ। অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে কংগ্রেস এবং সম্পূর্ণ রাষ্ট্র তাঁর নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শন চায়।' কিন্তু তারা এই অযৌক্তিক কথা মেনে নিতে মোটেই রাজী নয় যে, শ্রীমতী গান্ধী অপরিহার্য।

জগজীবনরাম তাদের এই সিদ্ধান্তকে কিছুতেই পরিবর্তন করাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বোঝাপড়ায় এলেন যে তরুণ তুর্কীরা ঐ সভায় যোগদানই করবে না। কেননা সভায় যোগদান করে তরুণ তুর্কীরা কোন বিষয়ে যদি বিরোধীতা করে বসে তাহলে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হবে। সভায় তরুণ তুর্কীদের অনুপস্থিতিতে কেউ কেউ ভ্রূ কোঁচকান, আবার কারও মধ্যে কানাকানিও হয়। কিন্তু তাতে ৫১৬ সদস্যযুক্ত সংসদীয় দলের আচরণে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। শ্রীমতী গান্ধী সর্বসম্মত সমর্থন লাভ করেন। উইংসে বসে থাকা মুখ্যমন্ত্রীরা নিজ নিজ রাজ্যের এম-পিদের উপর কড়া নজর

রাখছিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হয়ে যাবার পর তারা উইংসের ভেতর থেকেই উল্লাস প্রকাশ করেন। জগজীবনরাম প্রস্তাবটি উত্থাপন প্রসঙ্গে যে বক্তৃতা দেন তার বেশীর ভাগ অংশেই তিনি প্রশাসনিক বিভাগ ও বিচার বিভাগের সম্বন্ধ কেমন হওয়া উচিত তার উপর জোর দেন। এর তুলনায় শ্রীমতী গান্ধীর সদ্গুণ ও কর্তব্যপরায়ণতা সম্পর্কে তিনি অল্প কথাই বলেন। চবন এই প্রস্তাবের সমর্থন করতে উঠে প্রথমেই ইন্দিরা প্রশস্তি শুরু করেন। তিনি বলেন, শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে যে কেবল আমরা জয়ী হয়েছি তাই নয়—আমাদের এই দেশকে তিনি পরবর্তী অর্থ সঙ্কট থেকে মুক্ত করেছিলেন।

পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী শ্রীমতী গান্ধী বাণীর মত দলীয় সভায় এলেন। তাঁকে সম্মানসূচক অভিবাদন জানানো হল। খুব অল্পক্ষণই তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তা সর্বজন পরিচিত : বেশ কিছুদিন ধরেই এই সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছিল; এবং এ হল তাঁর ও কংগ্রেসের বিরোধী 'শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ' হওয়ার ফল। কিন্তু তাঁর শক্তির উৎস হল জনসাধারণ। এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে তিনি সভা থেকে চলে যান।

সভায় প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবার পর সভাপতি বড়ুয়া বললেন, এখান থেকে তাঁরা সবাই শ্রীমতী গান্ধীর ঘরে গিয়ে হাজির হতে পারেন। সভা হচ্ছিল সংসদের সেণ্ট্রাল হলে সেখান থেকে শ্রীমতী গান্ধীর ঘর বেশী দূরেও নয়। কিন্তু জগজীবনরামের বক্তব্য উপস্থাপনের ফলে বড়ুয়ার প্রস্তাব একবারে মাঠে মারা যায়। তিনি বলেন, শ্রীমতী গান্ধী এতক্ষণে বাড়ী রওনা হয়ে গেছেন। রাম অনেকটা মানিয়ে নিয়েছিলেন, পারস্পরিক বোঝাপড়ার চূড়ান্ত শিখরে উঠেছিলেন। তাঁর পক্ষে যতটা করা সম্ভব ছিল তার চেয়ে তিনি বেশীই করেছেন। এর চেয়ে বেশী আজ্ঞাধীনতার পরিচয় আর তিনি দিতে চান নি।

এই প্রস্তাব গ্রহণের পর সুপ্রীম কোর্টের সর্ত সাপেক্ষ অথবা সর্তহীন 'স্টেঅর্ডারের' যেন আর কোন গুরুত্বই রইল না। তখন সকলের ভাবছিল যা খুশী হোক না কেন শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী পদেই থাকছেন। সুপ্রীম কোর্ট যদি তাঁকে ভোটাধিকার না দেয় কিম্বা সংসদীয় আলোচনায় যোগ দিতে না দেয় তাহলে কি হবে? তবু তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন।

শ্রীমতী গান্ধীর পরামর্শদাতারা আবার বসলেন। আইনগত এবং রাজনীতিগত—উভয় দিক নিয়েই তাঁরা আলোচনা করবেন এবং বিষয় হল সুপ্রীম

কোর্ট যদি পূর্ব রায়কে বহাল রেখে আগামী ছয় বছর পর্যন্ত কোন নির্বাচিত পদে তাঁর অধিষ্ঠিত না হবার সর্তটিও বজায় রাখেন তাহলে শ্রীমতী গান্ধীর রেহাই পাওয়ার উপায় কি হবে। প্রথমে তাঁরা চিন্তা করলেন যে একটা আইন করে দিলেই হয় যে নির্বাচন সংক্রান্ত পূর্বোক্ত অযোগ্যতাগুলি আর কার্যকর হবে না এবং বলা হবে যে ১৯৭৫ সালের ১লা জুলাই পর্যন্ত যত সদস্য এইভাবে অযোগ্য বিবেচিত হয়েছে তাদের সকলকে আবার 'যোগ্য' বলে বিবেচনা করতে হবে। মধ্যপ্রদেশের ডি পি মিশ্র এবং অন্ধ্র প্রদেশের চেন্না রেড্ডীর বেলায় এই রকম আইন প্রণয়নের কথা ভাবা হয়েছিল বটে, কিন্তু পরে তা আর কার্যকর করা হয় নি।

একটা এমন প্রস্তাবও এসেছিল যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের পস্তাব মেনে নিয়ে প্রয়োজনবোধে তিনি আবার রায়বেরেলী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

ওদিকে ২১ ও ২২ জুন যথাক্রমে জনতা মোর্চার কর্মসমিতি ও সাধারণ সদস্যের বৈঠক দিল্লিতে ডাকা হল এবং সারা দেশে তারা প্রচণ্ড ধরণের 'ইন্দিরা হটাও' আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হল। জেপি এক বার্তা পাঠিয়ে জানালেন যে, তিনি মোর্চার কার্যক্রমে উপস্থিত থাকবেন এবং জনতা মোর্চার সমাবেশে গিয়ে নেতৃবৃন্দের বক্তৃতাদি শুনবেন। রাজনারায়ণ জেপিকে একথা বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সুপ্রীম কোর্টের চূড়ান্ত রায় দান পর্যন্ত অপেক্ষার কোন দরকার নেই।

বিরোধী পক্ষ সংসদের বাদল অধিবেশন আরম্ভ করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। তাঁদের এ দাবির কথা স্পীকারের কাছেও তারা লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অবশ্য অধিবেশন না ডাকার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে রেখেছিলেন। কেননা অধিবেশনে অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টির যথেষ্ট অবকাশ ঘটতে পারে। তাঁরা যুক্তি দেখালেন যে সংবিধানে কেবলমাত্র এই নির্দেশই দেওয়া আছে যে, দুটি অধিবেশনের মধ্যে খুব বেশী হলে ছয়মাসের পার্থক্য থাকতে পারে। স্পীকার শ্রীমতী গান্ধীর মনোভাব বেশ ভালোমতোই জানতেন, তাই তিনি আর সংসদের অধিবেশন ডাকার প্রস্তাবে সম্মতি দেন নি।

সঞ্জয় এবং তার গোষ্ঠীর কথাই যদি ধরা যায় তাহলে বলতে হয় তারা সংসদের অধিবেশন ডেকে বাজে সময় নষ্ট করার একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তাদের সামনে বড় উদাহরণ হল গত অধিবেশনের সম্পূর্ণ সময়টা খরচ হয়ে গেছে কেবলমাত্র তুলমোহন রাম প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে। তারপর

৪

আরও বড় কথা হল সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নাদির উত্তর তৈরী করতেই যদি বছরের বেশীর ভাগ সময় নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সরকারী কাজকর্ম হবে কখন? সঞ্জয়গোষ্ঠী এই অর্থহীন কার্যকলাপকে সংক্ষিপ্ত করার কথাই বরং চিন্তা করছিল।

সি পি আই পন্থী কংগ্রেস মন্ত্রী চন্দ্রজিত যাদবও একবার এই ধরণের কথা বলেছিলেন। ঐ একই ধরণের মন্তব্য করেছিলেন নয়াদিল্লী থেকে নির্বাচিত অপর এক সি পি আই পন্থী কংগ্রেস সদস্য শশীভূষণ। তখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি এদেশের জন্য সীমিত স্বৈরতন্ত্র পছন্দ করেন। অনেকদিন পরে যখন তাঁকে তাঁর ঐ মন্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখন তিনি বলেছিলেন, "কিন্তু আমি যে শব্দ ব্যবহার করেছিলাম সেটা ছিল 'লিমিটেড" —আমি তো "প্রাইভেট লিমিটেডের কথা বলিনি।"

শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যে এখন বেশ পরিবর্তন এসেছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরোনোর পর তাঁর মনের উপর আত্মবিশ্বাসহীনতার ছাপ পড়েছিল, তা তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। প্রকৃতপক্ষে এখন তিনি এই কথাই বিশ্বাস করেন যে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য যে সর্বাত্মক চক্রান্ত চলছিল এলাহবাদ হাইকোর্টের রায় ছিল তারই অঙ্গ স্বরূপ। এর মধ্যে কেউ এসে আবার তাঁকে বলে গিয়েছিল যে বিচারপতি সিন্‌হা হলেন একজন জনসঙ্ঘ পন্থী ব্যক্তি।

সঞ্জয় ও তার গোষ্ঠীর আস্থা বেশী করে প্রকাশ পাচ্ছিল। শুধু যে শ্রীমতী গান্ধী তাদের খুঁটিনাটি কর্মসূচী সম্পর্কেও খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন তাই নয়, তারাও তাদের কর্মসূচীর প্রায় চূড়ান্ত রূপ দিয়ে ফেলেছিল। প্রতিটি রাজ্যেই কাকে কাকে গ্রেপ্তার করা হবে তাদের নামের তালিকা তৈরী হচ্ছিল। ফিলিপাইন ধরণের সেন্সরশিপ ব্যবস্থা এখানে কীভাবে চালু করা হবে সে সব কিছুই স্থির হয়ে গিয়েছিল।

এইসব কাজ কখন 'কার্যকর' করা হবে তার সময়ও স্থির হয়ে গিয়েছিল। সুপ্রীমকোর্টের রায় বেরোবার পরই এই কাজ শুরু করা হবে বলে স্থির হয়। প্রস্তুতিপর্বের গতিকে তাই আরও বাড়িয়ে দেওয়া হল। যাদের মাধ্যমে এগুলি কার্যকর করা হবে সেগুলিকেও আরেকবার খতিয়ে দেখে নেওয়া হল। যে সব আমলার উপর প্রয়োজনের মুহূর্তে আস্থা স্থাপন করা যেতে পারে—অধিক সংখ্যায় তেমন আমলাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হতে থাকলো।

স্থির হল যে স্বরাষ্ট্র সচিব নির্মলকুমার মুখার্জীকে ঐ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে, কারণ তিনি "বড্ড বেশী আইনের কচকচিতে" সময় নষ্ট করেন। তাঁর জায়গায় রাজস্থানের মুখ্য সচিব সর্দারীলাল খুরানাকে আনা হল। খুরানাকে নিজেদের কাজ করানো অনেক সহজ হবে। ধবন এখন থেকে প্রশাসনের উচ্চপদ সমূহে নিয়োগের একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্যক্তি হয়ে পড়েছিল। তার বক্তব্য ছিল প্রশাসনে দক্ষিণ ভারতীয়দের আধিপত্য বড্ড বেশী। তিনি এই ব্যবস্থা পাল্টে উত্তর ভারতীয়দের বিশেষ করে পাঞ্জাবীদের নিয়োগ করতে লাগলেন।

গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান এ. জয়রামকে সরিয়ে ওখানে আনা হল পাঞ্জাবের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ সুরিন্দার নাথ মাথুরকে। মাথুরকে প্রথমে অতিরিক্ত ডিরেক্টর পদে আনা হয়, পরে তাকে ডিরেক্টর করে দেওয়া হয়। জয় রামের বিরুদ্ধে অবশ্য ওদের একটা বক্তব্য ছিল। তাহল তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও এলাহবাদ হাইকোর্টের কী রায় হতে পারে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই দিতে পারেন নি।

বেশীর ভাগ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই বংশীলাল কথা বলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীরা যেন বিরোধীদল এবং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার জন্য মুখিয়ে বসে ছিল। সুতরাং বংশীলালের প্রস্তাবে তারা এক কথায় রাজী। শ্রীমতী গান্ধী নিজে এই বিষয়ে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং নন্দিনী শতপথীর সঙ্গে কথা বললেন। সিদ্ধার্থ রায়ের কিছু আইন জানা ছিল বলে তিনি জানতে চাইলেন যে কোন আইন বলে তাঁরা এই দুটি কাজ করতে চলেছেন? তিনিও বিশেষভাবে চান যে এ দুটি কাজ হোক, কিন্তু তাঁর মত হল আইন থেকে দূরে সরে গিয়ে যেন একাজ করা না হয়। অবশ্য শ্রীমতী গান্ধীর নিজেরও ইচ্ছা ছিল যে যাই করা হোক না কেন তা যেন সংবিধানের সীমানার মধ্যে থাকে। সেইজন্য তিনি সিদ্ধার্থ রায়কে এই কাজগুলি করার পদ্ধতি কী হতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করতে বললেন। আরও বললেন, কলকাতায় ফিরে গিয়ে সিদ্ধার্থ রায় যেন তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন।

গোয়েন্দা বিভাগ খবর দিল যে বিরোধীরা বিরাট এক আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাছাড়া হাজার হাজার লোকের এক সুবিশাল বিক্ষোভ মিছিলকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের দিকে পরিচালিত করা হবে এবং সম্ভব হলে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনকে ঘিরে রাখা হবে। তারা রেল লাইনের উপর অবস্থান করবে যাতে ট্রেন চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

আদালতগুলিকে কাজ করতে দেওয়া হবে না এবং সরকারী অফিসগুলিতেও কোন কাজকর্ম হতে পারবে না। সবকিছুকে বন্ধ করে একেবারে অচল ক'রে দেবার জন্যই এবার বিরোধী দলগুলি প্রয়াসী হয়েছিল।

প্রমাণের যদি আদৌ কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে এটাই হল সেই প্রমাণ। এখন দেখা যাচ্ছে সঞ্জয়ের কথাই ঠিক ছিল। সে বলেছিল, তাঁর মাকে ক্ষমতাচ্যুত করাই বিরোধী দলগুলির একমাত্র লক্ষ্য। কাজেই শ্রীমতীগান্ধী এখন সম্পূর্ণরূপে ছেলের উপর এবং ছেলের পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তাঁকে বিপদমুক্ত করার জন্য সঞ্জয় কোন না কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেই। সঞ্জয়কে তিনি দিনে আঠারো ঘণ্টা পর্যন্ত পরিশ্রম করতে দেখেছেন।

২০ জুন সরকারী তত্ত্বাবধানে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত সংহতি সমাবেশে তিনি আবার ঘোষণা করলেন যে তিনি আজীবন জনগণের সেবা করে যাবেন তা তিনি যে পদে বা যেমন অবস্থাতেই থাকুন না কেন। সেবা করাই হল তাঁর পরিবারের ঐতিহ্য।

জনসভায় এই প্রথম তিনি তাঁর পরিবারের কথা উল্লেখ করলেন। মঞ্চের উপর সেদিন সত্যি-সত্যিই তাঁর পুরো পরিবার উপস্থিত ছিল। যেমন সঞ্জয়, রাজীব এবং তার ইটালিয়ান স্ত্রী সোনিয়া।

শ্রীমতীগান্ধী আরও বললেন, বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী তাঁকে কেবল ক্ষমতচ্যুতই করতে চাইছে না, তারা তাঁকে ইহলোক থেকে চিরতরে সরিয়ে দেবার ফন্দি আঁটছে। নিজেদের অসদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা বিরাট জাল বিছিয়ে দিয়েছে।

বড়ুয়া তাঁর পুরনো খেলাতেই মশগুল হলেন। ইন্দিরা পূজার একটা পরিবেশ রচনায় তিনি বহু প্রকারে ইন্দিরা প্রশস্তি গাইলেন। শেষে একটি উর্দু কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করলেন।

তেরে সুবহ কী জয়, তেরে শাম কী জয়
তেরে কাম কী জয়, তেরে নাম কী জয়॥

সংহতি সমাবেশ সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন হল। শ্রীমতীগান্ধীর ভাষায়, 'এই সমাবেশ ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ।' কিন্তু এই সমাবেশের ছবি টিভির জন্য তোলা হয়নি। এই না-তোলার জন্য যুক্তি দেখানো হল: এ হল দলীয় সমাবেশ—সরকারী সমাবেশ তো আর নয় যে টিভি ক্যামেরায় এর ছবি তোলা হবে। এই ছবি না তোলার জন্য গুজরালকে তাঁর মন্ত্রিত্বটি খোয়াতে হল।

গুজরালের সঙ্গে সঞ্জয়ের একচোট হয়ে গেল। গুজরাল বললেন, তিনি তার মায়ের মন্ত্রী—তার নয়।

জনসভা থেকে অন্ততঃ তেরোজন মুখ্যমন্ত্রী সোজা রাষ্ট্রপতি ভবনে গেলেন এবং শ্রীমতীগান্ধীর প্রতি তাঁদের আস্থার কথা তাঁরা পুনরায় রাষ্ট্রপতিকে জানিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা একপৃষ্ঠার একটি স্মারকলিপিও রাষ্ট্রপতির কাছে দিয়ে এলেন যাতে বলা হয়েছে যে শ্রীমতীগান্ধীর পদত্যাগ দেশকে দুর্বল করবে এবং জাতীয় পর্যায়ে তার সুস্থিতি নষ্ট করে দেবে। শুধু জাতীয়—পর্যায়েই নয় বিভিন্ন রাজ্যেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

পরের দিন সোমবার ২৩জুন এদের কয়েকজন সুপ্রীমকোর্টেও উপস্থিত ছিলেন যেখানে জাস্টিস কৃষ্ণ আয়ার শ্রীমতীগান্ধীর আপীলের মামলার শুনানী শুনাছলেন। ইন্দিরার আবেদনে সুপ্রীমকোর্টের কাছ থেকে 'সম্পূর্ণ এবং নিঃসর্ত' স্টে-অর্ডার চেয়েছিলেন, শ্রীমতী গান্ধী যে পদে আসীন ছিলেন তার মর্যাদা ও গুরুত্বের দিকে নজর রেখেই ঐ আবেদন করা হয়েছিল। যুক্তি দেখানো হল যে, 'আপীলের মামলায় চলা অবস্থাতে সামগ্রিকভাবে দেশের স্বার্থে স্থিতিবস্থাকে নষ্ট করা উচিত হবে না।'

দু'দিন ধরে আয়ার উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনলেন। তৃতীয় দিনে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। বললেন, শ্রীমতীগান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্টে এই আপীল মামলার নিষ্পত্তি না হয় ততদিন লোকসভায় তাঁর কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

সর্তসাপেক্ষ স্টে অর্ডার দেওয়া হল। সংসদের আলোচনায় অংশগ্রহণের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল না।. প্রসঙ্গক্রমে আয়ার সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'দানবীয় আইন হলেও আদালতের চোখে সেটা আইন, সেক্ষেত্রে সংসদ যেন সদাজাগ্রত ও কর্মদক্ষ সংস্থা হিসাবে কাজ করতে পারে।

সরকার সংবাদ .সংস্থা এবং রেডিও টিভি মারফৎ বিচারকের বক্তব্যের কেবলমাত্র 'ইতিবাচক' দিকটাই প্রচার করলেন। যা প্রচার করলেন তার মোদ্দা অর্থ হল আদালত শ্রীমতী গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করে যেতে বলেছে।

বিরোধী নেতৃবর্গ ততদিনে দিল্লী পৌঁছে গেছেন। জে-পিও পৌঁছেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে সুপ্রীমকোর্টের বক্তব্য নিয়ে কোন প্রকার বিতর্কের মধ্যে যেতে রাজী ছিলেন না। বিরোধী নেতৃবর্গ এক যৌথ বিবৃতিতে সুপ্রীমকোর্টের

রায়কে স্বাগত জানিয়ে বললেন, 'তাঁর (শ্রীমতীগান্ধীর) প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁর সদস্য পদও সীমায়িত করা হয়েছে এবং তাঁর ভোটাধিকার স্থগিত রাখা হয়েছে। এই অবস্থায় তিনি কেমন ধরণের প্রধানমন্ত্রী হবেন? তাঁরা আবার শ্রীমতী গান্ধীর পদত্যাগের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের কথা ঘোষণা করলেন।

সিপিআই (এম) এই সময় অকম্যুনিষ্ট বিরোধী দলগুলির সঙ্গে যুক্ত না হলেও তারা মোটামুটি ঐ একই রকমের মনোভাব প্রকাশ করেছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী যেহেতু শ্রীমতীগান্ধী 'মিথ্যাবাদী' প্রমাণিত হয়েছেন সেই হেতু তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।

সিপিআই অবশ্য তাকে সমর্থন করেই যাচ্ছিল। ঐ দলের সেণ্ট্রাল-সেক্রেটারিয়েট বলেছিল, তিনি যেন 'দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্ল্যাকমেলের' সামনে আত্মসমর্পণ না করেন। কাজেই তিনি যেন প্রধানমন্ত্রীর পদেই থাকেন।

আয়ারের রায় জগজীবনরামের পরিকল্পনাকে ভেস্তে দেয়। তিনি আশা করছিলেন যে শ্রীমতীগান্ধী সর্তসাপেক্ষ 'স্টে অর্ডার' পাবেন এবং তিনি এটা মোটেই ভাবেন নি যে, আদালত সরাসরি তাঁকে প্রধানমন্ত্রীত্ব বজায় রাখার অধিকার দেবে। যাই হোক না কেন, রায় একটু দেরী করে ফেলেছিলেন। একটা নৈতিক প্রশ্নকে বড়ুয়া প্রমুখ ব্যক্তিরা এমনভাবে রাজনৈতিক প্রশ্নে রূপান্তরিত করে ছিলেন যে, 'স্টে অর্ডারের' ব্যাপারটিই সঙ্গতি হারিয়ে ফেলছিল।

জগজীবনরাম এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্যদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বৃন্দগানের অংশীদার হলেন। একটি বিবৃতি এবং একটি প্রস্তাবে তাঁরা বললেন, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করার পথে শ্রীমতীগান্ধীর কোন বাধা নেই। জগজীবন রাম আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, এ হল এক আইনগত প্রশ্ন—এর পেছনে কোন নৈতিক বা রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত নেই। নৈতিকতা রয়েছে শ্রীমতী গান্ধীর দিকেই।

দলের সংসদীয় বোর্ড বৈঠকে মিলিত হয়ে জাতির উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন যে 'কিছু গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি এখনও হয়তো এক ধরণের চেষ্টা চালিয়ে যাবে যার দ্বারা জনসাধারণের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে চাইছে।

দলের মধ্যে যাঁরা এই উল্লাসে বা উৎসবে অংশ নিতে পারেন নি তাঁরা সকলেই তরুণ তুর্কী হিসাবে পরিচিত। যেমন—চন্দ্রশেখর, মোহন ধারিয়া,

রামধন, কৃষ্ণকান্ত এবং শ্রীমতী লক্ষ্মী কান্তাম্পা এবং আরও কয়েকজন। নিজেদের শক্তি যাচাই করার জন্য তাঁর আলাদা বৈঠক করলেন। কিন্তু এটাই যথেষ্ট ছিল না, কেননা তাদের সমর্থকদের সংখ্যা তো আঙুলের ডগায় গোনা যায়।

চন্দ্রশেখর এবং কৃষ্ণকান্ত উভয়েই আমাকে বলেছেন, 'এই সংখ্যা তিরিশের বেশী হবে না। তবে এমন অনেক আছে যারা বলেছে যে দরকার পড়লে তারা আমাদের দিকে চলে আসবে।'

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পর ইন্দিরার পক্ষে প্রচার করার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক নিয়মনীতির প্রতি সামান্য সম্মান পর্যন্ত না প্রদর্শনের যে নজীর কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ স্থাপন করেছিলেন তাতে তরুণ তুর্কীরা বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাদের সবচেয়ে বেশী হতাশ করেছিলেন জগজীবনরাম যিনি কথা দিয়েছিলেন যে তিনি তরুণ তুর্কীদের সঙ্গেই আছেন—শেষ পর্যন্ত তিনিই কি না প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অপর দিকে চলে গেলেন।

তাঁদের সম্পর্কে শ্রীমতীগান্ধীর প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা মোটেই বিচলিত হন নি। কেননা তাঁরা সবাই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। জে-পির প্রতি তাদের শ্রদ্ধার কথা তারা কখনোই গোপন করেন নি। চন্দ্রশেখর একাধিকবার শ্রীমতীগান্ধীকে বলেছেন যে তিনি যেন জেপির সঙ্গে দেখা করে তাঁর সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করেন যাতে রাজনীতিতে একটা স্বচ্ছ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ২৪জুন চন্দ্রশেখর জে-পির সম্মানে নিজের বাড়ীতে এক নৈশ ভোজসভার আয়োজন করেন। গোয়েন্দা বিভাগ জানান আশিজন সংসদ সদস্য তরুণ তুর্কীদের সঙ্গে একমত হয়েছেন। তবে তাদের মধ্যে নৈশ ভোজসভায় যোগদান করেন মাত্র বিশজন সংসদ সদস্য।

তরুণ তুর্কীদের অভ্যন্তরীণ মহলে কী ঘটলো বা কংগ্রেস পার্টির মধ্যেই বা তার কী প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তা নিয়ে সঞ্জয় ও তার গোষ্ঠী মোটেই মাথা ঘামাচ্ছিল না। তারা তাদের পরিকল্পনাকে কীভাবে কাজে লাগাবে সে বিষয়েই ব্যস্ত ছিল। সিদ্ধার্থ তাঁদের জন্য কাজের পদ্ধতি ঠিক করে দিয়েছিলেন।

দুদিন আগে কলকাতা থেকে ফোনে শ্রীমতী গান্ধীকে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁদের 'কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ' 'অভ্যন্তরীণ' জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে করা যেতে পারে। (বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বহির্দেশীয় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়।) তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানান যে, সংবিধানের ৩৫২ ধারায় রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমতা দেওয়া আছে যে, দেশের অভ্যন্তরে যদি

কোন গণ্ডগোল হয় তাহলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এর ফলে সরকারের হাতে ঢালাও ক্ষমতা এসে যাবে।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে অবিলম্বে দিল্লি চলে আসতে বলেন। তাঁর পক্ষে কলকাতা থেকে হঠাৎ প্রস্থান কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। তাঁর সম্পর্কে একটি রসিকতা খুব প্রচলিত আছে। তাহল একটা স্যুটকেস এবং দিল্লির একটি বিমানের টিকিট তাঁর কাছে সবসময়েই প্রস্তুত থাকে। যেদিন থেকে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্ব ছেড়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছেন সেদিন থেকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করার জন্য তিনি সপ্তাহে গড়ে দুবার করে কলকাতা থেকে দিল্লি এসেছেন।

২৪ জুন নয়াদিল্লিতে কথাবার্তা বলার সময় সিদ্ধার্থ তার নিজের বক্তব্যকে বেশ জোরদারভাবেই উপস্থাপন করেছিলেন। পার্লামেন্ট লাইব্রেরী থেকে জরুরী এককপি সংবিধান আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে একজন লোক গেল। সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্য এবং শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধবাদীদের শায়েস্তা করার জন্য 'কিছু একটা ব্যবস্থা' নেওয়ার যে চিন্তা তা এখন শুধু যে একটা রূপ ধারণ করলো তাই নয়—সংবিধানের সমর্থনও জুটলো এর পক্ষে। 'অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা' হল সেই আবরণ যার আড়ালে বসে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব পুষ্ট ব্যবস্থাদি বেশ ভালোভাবেই গ্রহণ করা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর জরুরী অবস্থা জারি সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি আগে থেকেই তৈরী করে রেখেছিল। এই ধরণের অনেক আনুষঙ্গিক প্ল্যানের খসড়াই—এই দপ্তরের দেরাজে জমা থাকে। জরুরী অবস্থাজনিত ক্ষমতা অনুসারে কেন্দ্র যে কোন রাজ্যকে যেকোন ধরণের নির্দেশ দেবার অধিকারী, ইচ্ছে করলে তাঁরা সংবিধানের ১৯ নং ধারা বাতিল করে দিতে পারেন অথবা মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের পুরো অংশটাই তাঁরা নাকচ করে দিতে পারেন। ( উল্লেখযোগ্য : সংবিধানের ১৯ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'সকল নাগরিকের এই অধিকারগুলি থাকবে—বক্তৃতা ও ভাব প্রকাশে স্বাধীনতা, বিনা অস্ত্রে ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হবার স্বাধীনতা, সংস্থা অথবা ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা, ভারতের এলাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করার স্বাধীনতা, জমি সংগ্রহ, ভোগদখল, এবং বিক্রী করার স্বাধীনতা এবং যে কোন কাজকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য করার স্বাধীনতা।) আদালতগুলিকে এই আদেশ দিয়ে দেওয়া যাবে যে, তারা যেন এই অধিকারগুলির প্রতিষ্ঠা করে কৃত মামলাগুলি গ্রহণ না করে। সোজা কথায় কেন্দ্রের ক্ষমতা সবব্যাপী হয়ে গেল।

এই ব্যবস্থা শ্রীমতী গান্ধীর মনে স্বস্তি এনে দিল। নেহরু থেকে তাঁর মনোভাবে কী বিরাট পার্থক্য! ১৯৬২ সালের অক্টোবরে চীনের সঙ্গে হেরে যাওয়ায় সমগ্র দেশ যখন তাঁর বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সময় তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণমেনন অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বিনষ্ট হবে এই যুক্তিতে নেহরু সেদিন কৃষ্ণ-মেননের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন।

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর গোখলেকে ডাকা হল একে বৈধানিক রূপ দেবার জন্য। তখনও কিন্তু তিনি একথা জানেন না যে জরুরী অবস্থা ঠিক কবে ঘোষিত হবে।

স্থির হল ২৫ জুন মধ্যরাত্র থেকে কাজ শুরু হয়ে যাবে। মনে হচ্ছিল সুপ্রীম কোর্টের রায়ও এর মধ্যে জানা যাবে।

এ ব্যাপারে গোপনীয়তাই হল সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কথা। শ্রীমতী গান্ধী, সঞ্জয়, ধবন, বংশীলাল, ওমমেহতা, কিষণ চাঁদ এবং এখন সিদ্ধার্থ—এরা ছাড়া এই যে একটা বিরাট কাজ শুরু হতে যাচ্ছে সে বিষয়ে আর কেউ কিছুই জানে না। তবে হ্যাঁ—ইতিমধ্যেই বিভিন্ন লোকের কাছে করণীয় কাজের নির্দেশাবলী যেতে শুরু করেছে। কাজের মধ্যে বড় কাজ হল তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন লোককে গ্রেপ্তার করা।

বড়ুয়া একটু আধটু আঁচ করলেও আসলে যে কী হতে চলেছে তার কিছুই জানতেন না। জরুরী অবস্থার বিষয়টি তাঁকে প্রথম জানানো হয় ২৪ জুন তারিখে। জরুরী অবস্থার কঠোর পরিণামকে কিছুটা মোলায়েম করার জন্য বড়ুয়া এই সঙ্গে কিছু—'প্রগতিশীল কর্মসূচী' হাতে নিতে বলেছিলেন। তিনি চিনি এবং বস্ত্র শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ যে কী ভাবে সাহায্য করেছিল তার বড় প্রমাণ হল রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেসের নিজস্ব প্রার্থী পর্যন্ত হেরে গিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্পসমূহকে উৎসাহ দানে আগ্রহী সঞ্জয় এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিল।

বড়ুয়া আরেকটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন—তা হল বেকারদের জন্য ভাতা ধার্য করা হোক। সঞ্জয় এই প্রস্তাবও উড়িয়ে দিয়েছিল এই যুক্তিতে যে, এজন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন। কেননা দেশে এখন বেকার সংখ্যা দুই কোটিরও বেশী।

রেড্ডাকে একথা জানানো হয় ২৫ জুন তারিখেই। এমনকি তখনও তাকে

জানানো হয়নি যে সারা দেশে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তিনি একথা জানার চেষ্টাও করেন নি। নিরাপত্তার খাতিরে কিছুকাল যাবৎ তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে সহকারীরূপে কাজ করতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

বিরোধী দলগুলির তো এ বিষয়ে বিন্দু-বিসর্গমাত্র ধারণাও ছিল না। মার্কসবাদী নেতা জ্যোতির্ময় বসু বোধ হয় কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। এক জনসভায় তিনি বলেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী সম্পূর্ণ সংবিধানকেই বাতিল করে দেবার কথা চিন্তা করছেন। প্রধানমন্ত্রীর তরফের কেউ হয়তো তাঁকে ঐ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়ে থাকবেন। নিজের বাড়ীতে তাঁর ইস্পাতের গরাদ দেওয়া জানলা ছিলই। ওদিকে ওড়িশার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান বি এল ডি নেতা বিজু পট্টনায়কও ঐ ধরণের কিছু একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে আঁচ করছিলেন। সে ভয় তিনি প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু বিরোধীদের সকলে সেকথা বিশ্বাস করেন নি। ব্যাপারটা এতই উদ্ভট যে কারো পক্ষে একথা বিশ্বাস করাও খুব কঠিন।

যাই হোক বিরোধী নেতৃবৃন্দ ২৫ জুনের সমাবেশের জন্য প্রস্তুতি কর্মে ব্যস্ত ছিলেন। জে-পি যিনি এখন লোকনায়ক নামে খ্যাত তাঁর বিলম্বে আগমনের জন্য দিল্লীর এই সমাবেশ একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়।

এপর্যন্ত দিল্লি যত বড় বড় সমাবেশ দেখেছে এটা ছিল সেগুলির অন্যতম। তবে শ্রীমতী গান্ধীর সমাবেশের মত এটা তত বড় ছিল না, অন্ততঃ তাঁর সমর্থকরা ঐ সমাবেশে যেমন গর্ব অনুভব করেছিল বিরোধীরা তা করে নি। তবে জেপির সমাবেশে যারা গিয়েছিল তারা নিজেদের ইচ্ছায় এবং নিজেদের চেষ্টায় সেখানে এসেছিল। তাদের আনার জন্য সরকারের ভাড়া করা কোন লরী সেখানে ছিল না। বিরোধী নেতৃবৃন্দ একের পর এক ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালালেন। দুয়েকজন তো একথাও বললেন যে, তিনি স্বৈরতন্ত্রী শাসকের ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁরা একথাও বললেন যে, এমতাবস্থায় তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে কোন কাজ করতে দেবেন না।

মোরারজীকে চেয়ারম্যান এবং নানাজী দেশমুখকে (জনসঙ্ঘের প্রথম সারির নেতা) সেক্রেটারী হিসাবে নির্বাচিত করে জেপি পাঁচ সদস্যের লোক সঙ্ঘর্ষ সমিতি গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। শ্রীমতী গান্ধীকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য ২৯ জুন দেশব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হল ঐ লোক-সঙ্ঘর্ষ সমিতির উপর। এই আন্দোলনের কর্মসূচীতে থাকবে অহিংসা হরতাল, সত্যাগ্রহ এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন।

উপস্থিত জনতাকে আহ্বান জানিয়ে জেপি বললেন, প্রয়োজনবোধে দেশের নৈতিক মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যারা জেলে পর্যন্ত যেতে রাজি আছেন তাঁরা হাত তুলুন। প্রত্যেকে হাত তুললেন। বিস্ময়জনকভাবে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা পরে যখন প্রতিবাদ করার জন্য ডাক এলো এদের বেশীর ভাগ তখন প্রতিবাদ করলো না—জেলে যাওয়ার ডাকে সাড়া দিল আরও কম সংখ্যক ব্যক্তি। জেপি পুলিশ এবং মিলিটারীর উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বললেন যে তারা যেন সরকারের বেআইনী আদেশ পালন না করেন, কেননা তাদের ম্যানুয়ালেই এই রকম আদেশ পালন না করার নির্দেশ আছে।

মজার কথা হল, ১৯৩০ সালে খোদ কংগ্রেসেরও এই নীতি ছিল। শ্রীমতী গান্ধার ঠাকুর্দা মোতিলাল নেহরু ছিলেন এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাশ করানোর ব্যাপারে মূলতঃ উৎসাহী ব্যক্তি। তাঁরই চেষ্টায় সেদিন কংগ্রেস প্রস্তাব নিয়েছিল যে, অতঃপর পুলিশরা যেন বেআইনী আদেশ পালন না করে। এই প্রস্তাবের কপি বণ্টনের দায়ে যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল তারা এলাহাবাদে হাইকোর্টে আপীল করেন। বৃটিশ রাজের অধীন বিচারপতিরা সেদিন আপীলের বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, পুলিশকে বেআইনী আদেশ অমান্য করতে বলার মধ্যে কোন অপরাধ নেই।

কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী, সঞ্জয় এবং তার গোষ্ঠী পুলিশ ও মিলিটারীর উদ্দেশ্যে জেপি'র আহ্বানকে কেন্দ্র করেই তাদের প্রচার অভিযানকে জোরদার করে তুললেন। এখন তারা বলতে পারে যে জেপি সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিলেন যা নাকি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ হিসাবেই চিহ্নিত।

সেটা ছিল একটা অজুহাত। আসলে এই সমাবেশের অনেক আগে থেকেই সঞ্জয় ও তার সাকরেদরা আসল কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মধ্যরাত্রি ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে তীব্র কর্ম ব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যগুলিতে অর্ডার চলে গিয়েছিল। বহু রাজ্য থেকেই আবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যোগাযোগ করে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে সংবাদ পত্রের উপর সেন্সরশিপ আরোপ এবং তালিকা অনুযায়ী ইন্দিরার বিরুদ্ধবাদীদের গ্রেপ্তার করা ছাড়াও তারা আরও কিছু করবে কি না। দিল্লি এবং অন্যান্য স্থানে যাদের গ্রেপ্তার করা হবে তাদের নামের তালিকা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীকে ঐ তালিকা দেখানো হয়। এই তালিকা তৈরীর ব্যাপারে যে গোয়েন্দা সংস্থা সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল তার নাম হল রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যানালিসিস উইং ( বা ছোট্ট করে 'র' )।

চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৬২ সালে 'র' গঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই সংস্থা বিদেশে গোয়েন্দাগিরি করবে। কেননা চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতার জন্যই সেদিন পরাজয় বরণ করে নিতে হয়েছিল। এই সংস্থা গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে বিজু পট্টনায়েক কিছুটা সাহায্য করেছিলেন। কেননা তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি নাকি শত্রুদের পেছনে থেকে কাজ করতে পারেন। তাঁর এই খ্যাতির কারণ হল বহু বছর পূর্বে ইন্দোনেশিয়ায় বিজু নিজে বিমান চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা সুকর্ণকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন।

'র' সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে কাজ করে থাকে। শ্রীমতী গান্ধীই হলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে দেশের অভ্যন্তরে এই সংস্থাকে দিয়ে গোয়েন্দাগিরি করান। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এর ঘন সান্নিবিষ্টতা এবং এই সংস্থায় তাদেরই গ্রহণ করা হয়ে থাকে যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেক উঁচুস্তরের অথবা যাদের সঙ্গে নির্ভরযোগ্য কোন উচ্চস্তরের আমলা বা পুলিশ অফিসারের সম্পর্ক আছে। সরকারের যারা বিরোধী, কংগ্রেস দলের যারা সমালোচনা করে থাকে, ব্যবসায়ী, আমলা এবং সাংবাদিক যারা 'র' তাদের ব্যক্তিগত নথিপত্র রাখতো। বিরোধীদের নামের তালিকা তৈরী করতে তাই কোন অসুবিধাই ছিল না : 'র'-এর ফাইলে সবার নাম আগে থেকেই ছিল।

আটক করার সময় কোন্ আইন প্রয়োগ করা হবে সেটাও কোন আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল না। বছরখানেক আগেই আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন (মিসা) সংশোধন করা হয়েছিল যাতে সরকার যে কোন ব্যক্তিকে আটক অথবা গ্রেপ্তার করতে পারতেন এবং সেজন্য আদালতের কাছে কোন কারণ দর্শাবারও প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য এই সংশোধন যখন পাশ করা হয় তখন সংসদে শাসকপক্ষ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ করা হবে না।

বংশীলাল চাইছিলেন দিল্লিতে যে সব নেতাকে গ্রেপ্তার করা হবে তাদের যেন হারিয়ানার জেলে রাখা হয়। তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে বলেছিলেন, 'আমি রোহতকে এক বিরাট আধুনিক জেল তৈরী করেছি।'

শ্রীমতী গান্ধী সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল রায়নাকে তার সফরসূচী বাতিল করে দিয়ে দিল্লিতে আসতে বলেন। এ ছিল এক সাধারণ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

এই সময় দিল্লি পুলিশের হর্তাকর্তারা জানতে পারলেন যে জে-পি, মোরারজী, অশোক মেহতা (সংগঠন কংগ্রেস সভাপতি), অটলবিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আদবানীর (উভয়েই জনসঙ্ঘ নেতা) মত ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করতে হবে।

কোন্ আইনে এদের ধরা হবে? যেহেতু তারা জরুরী অবস্থার ব্যাপারে কোন কিছুই জানতেন না, তাই তাঁরা বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলেন যে, কোন্ আইনে এঁদের গ্রেপ্তার করা যায়। তাদের বলা হল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৭নং ধারানুসারে তাদের গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ঐ ধারা প্রযোজ্য হয় কেবলমাত্র ভবঘুরেদের ক্ষেত্রে। জে-পি এবং মোরারজীর মত ব্যক্তিকে কি করে ঐ ধারায় গ্রেপ্তার করা যাবে?

দিল্লিতে যাদের গ্রেপ্তার করা হবে তাদের নামের তালিকাটি কিষণচাঁদের সাহায্যে তখনও চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হচ্ছিল। পুলিশ যখন গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেন্ট সই করাতে এল তখন দিল্লির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার যাদের গ্রেপ্তার করা হবে আগে তাদের নাম জানতে চাইলেন। খবর পেয়ে ধবন তৎক্ষণাৎ রাগে গর্ গর্ করতে করতে ওখানে এসে হাজির হল এবং সুশীলকুমার ধবনকে দেখে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে গেলেন এবং বিনা বাক্যব্যয়ে ফাঁকা ওয়ারেন্টপত্রে সই করে দিলেন। ভিণ্ডার পুলিশ থানার একজন 'নির্ভরযোগ্য' পুলিশ অফিসার যাঁকে হরিয়ানা থেকে এখানে আনা হয়েছিল এবং যিনি এখানকার গোয়েন্দা বিভাগের কাজকর্ম দেখাশুনা করে থাকেন তিনিই শেষদিন পর্যন্ত ওই ফাঁকা ওয়ারেন্টপত্রে নাম বসাবার কাজ করেছেন।

রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীরা মোটামুটি জেনারেল অব পুলিশ এবং মুখ্যসচিবকে সঙ্গে নিয়ে বসে যাদের গ্রেপ্তার করতে হবে তাদের নামের তালিকা চূড়ান্তভাবে স্থির করলেন। যদিও ২০ জুনের আশেপাশে মুখ্যমন্ত্রীরা যখন দিল্লি থেকে ফিরে এসেছিলেন তখন থেকেই শুরু হয়েছিল প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্ব। তখনও পুরো ব্যাপারটা কেউ বুঝে উঠতে পারেন নি। সকলের ধারণা ছিল যে কিছু লোককে চুপ করবার জন্য কিছুদিন আটক রাখা হবে এই পর্যন্ত।

মুখ্যমন্ত্রীদের মনে কোন সন্দেহ দেখা দিলেই তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ফোন করতেন এবং সেখানে ফোন ধরতো ধবন। তার কাছ থেকেই জানতে হত সকল প্রশ্নের উত্তর। কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না যে, একটা এমারজেন্সি যখন আগে থেকেই আছে তখন আর একটা চাপানো হচ্ছে কেন। ধবন এ দুইয়ের তফাত তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করেন।

সিদ্ধার্থই হলেন একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি তখনও দিল্লিতে বসেছিলেন এবং সেখান থেকে দূরভাষ যন্ত্রের সাহায্যে কলকাতার আমলাদের নির্দেশাদি দিতে থাকেন। তিনি দিল্লি থেকে গিয়েছিলেন কারণ ইন্দিরা তাকে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতির কাছে যখন জরুরী অবস্থার ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করাবার জন্য যাওয়া হবে তখন যেন তিনি ( সিদ্ধার্থ ) তাঁর সঙ্গে থাকেন।

নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় চার ঘণ্টা আগেই তিনি এবং শ্রীমতী গান্ধী রাষ্ট্রপতি ভবনে যান। সিদ্ধার্থ আভ্যন্তরীন জরুরী অবস্থা ঘোষণার দ্বারা কী হতে চলেছে তার ব্যাখ্যা করতে মিনিট পঁয়তাল্লিশ সময় নেন। রাষ্ট্রপতি দ্রুত বিষয়টি অনুধাবন করেন। কেননা এক সময় তিনিও আইনজীবী ছিলেন। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির অন্যতম সহকারী কর্মচারী কে এল ধবনের কাছ থেকে তিনি আগে থেকেই খানিকটা আচ পেয়েছিলেন। এই কে এল ধবন হল আবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যে ধবন কাজ করে তার ছোট ভাই।

এতে তাঁর ইতস্তত করার কিছু ছিল না। কেননা দেশের সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে নির্বাচিত হবার জন্য তিনি নিজে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে ঋণী ছিলেন। ১৯৬৯ সাল থেকেই শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আমেদের ঘনিষ্ঠতা অনেক বেড়েছিল। কেননা সেই বছর আমেদ এবং জগজীবনরাম তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি এস. নিজলিঙ্গয়াপ্পাকে এই মর্মে চিঠি দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কংগ্রেসের নিজস্ব প্রার্থী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর পক্ষে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের সমর্থন যেন না নেওয়া হয়। আমেদ এখনও স্মরণ করে থাকেন যে সেদিন শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে কীভাবে কংগ্রেসের নিজস্ব প্রার্থীর পরাজয় হয়েছিল এবং সিণ্ডিকেট শায়েস্তা হয়েছিল।

২৫শে জুন রাত বারোটা বাজার পনেরো মিনিট আগে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থার ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করেন। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে খসড়াটি নিয়ে আসে ধবন। সেই সময় থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত সেদিন রাষ্ট্রপতি ভবনের কোন কর্মচারী বিশ্রাম পান নি। ঘোষণা পত্রে বলা হল যে, 'অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের দ্বারা ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ায় এক গুরুতর জরুরী অবস্থা এদেশে বিরাজ করছে।' এই ঘোষণার দ্বারা সরকার প্রেস-সেন্সরশিপ আরোপ করলেন, নাগরিক অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে আদালতে যাবার পথও বন্ধ করলেন এবং এই রকম আরও অনেককিছু করা হল।

বহু বছর আগে জার্মানীতে যা ঘটেছিল তার সঙ্গে এর খুব মিল ছিল।

প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গকে প্রভাবিত করে সেদিন হিটলার 'দেশ এবং দেশের মানুষকে রক্ষার' নামে একটি ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছিলেন যার দ্বারা সংবিধানের একটা অংশকে অকেজো করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেইসূত্রে ব্যক্তিগত ও নাগরিক স্বাধীনতা বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

বিরোধী দলগুলি এবং সংবাদপত্র যে তাঁর ক্ষমতাসীন থাকা সম্পর্কে বার বার প্রশ্ন তুলছিল এবার শ্রীমতী গান্ধী তার বদলা নেবার জন্য নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা পেয়ে গিয়েছিলেন। আইনগুলিকে ইচ্ছামত কাটছাঁট করা, নীতি ও প্রথাকে যেমন খুশী পরিবর্তন করার পূর্ণ অধিকার তখন তাঁর হাতে। ১৯৪৭ সালের আগষ্টে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে যে দেশ কোন মতে টেনে হেঁচড়ে গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে চলেছিল, এবং পশ্চিমীদের সোচ্চার মন্তব্য যে গণতন্ত্র ভারতীয়দের জন্য নয়—তৎসত্ত্বেও যে দেশ ঐ পথেই চলছিল, সেই দেশে এখন প্রায় স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

শ্রীমতী গান্ধী একবার বলেছিলেন যে ইতিহাসে তিনি নিজেকে একটি 'শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব' হিসাবে নিজের নাম রেখে যেতে চান, যেমন নেপোলিয়ন বা হিটলারের নাম চিরকাল লোকে মনে রাখবে।

চল্লিশ বছর আগে তাঁর বাবা নিজের সম্পর্কে যে কথা লিখেছিলেন তা এখন তাঁর নিজের ক্ষেত্রে সত্য হিসাবে প্রতিভাত হতে চলেছে। জওহরলাল নিজেই লিখেছিলেন, একটু এদিক ওদিক করলেই জওহরলাল মন্থর গতিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক পথ ছেড়ে দিয়ে একজন ডিক্টেটর হতে পারতেন। ডিক্টেটর হওয়ার পরেও তিনি গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ধ্বনি ও ভাষা প্রয়োগ করতে পারতেন এবং আমরা সকলেই জানি যে ঐ ভাষার আড়ালে থেকে ফ্যাসিজম কী ভাবে স্ফীতকায় হয়ে ওঠে এবং গণতন্ত্র ন্যাংচাতে থাকে... ...দাপটের সঙ্গে কাজ করিয়ে নেবার ইন্দিরার যে মনোভাব, নতুন কিছু গড়ার এবং অপছন্দের বস্তুকে দৃঢ় ভাবে সরিয়ে দেবার তাঁর যে অভ্যাস তার মধ্যে মন্থরগতির গণতন্ত্রের স্থান ছিল খুব অল্পই। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি নিজে একজন সফল আমলা হতে পারতেন।

যাঁরা নেহরুকে জানতেন তাঁরা নিশ্চয়ই একথাও জানতেন যে নেহরু কোনদিনই সীজার হতেন না। আবার ইন্দিরাকে যারা জানেন তাঁরা একথাও জানেন যে তিনি সীজার হবার কল্পনায় অনেক বেশী মশগুল। সে রাত্রে তার ছেলে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রম্প্‌টারের ভূমিকা করেছে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সে রাতে কেউ ঘুমোয় নি। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ফিরে এসেই

প্রধানমন্ত্রী স্থির করলেন যে ভোর ছ'টায় কেবিনেট মিটিং হবে। ততক্ষণে পরিকল্পনানুসারে জেপি মোরারজী সমেত শত শত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়ে গেছে।

এই কাজ হয়েছে খুব দ্রুত, হঠাৎ এবং নির্দয়ভাবে। হঠাৎ সামরিক শাসন প্রবর্তন হলে যেমনটি হয়, এ ছিল ঠিক সেই রকম ব্যবস্থা।

দিল্লিতে ভোর রাত্রি আড়াইটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে সকল বিরোধী নেতার ঘুম ভাঙিয়ে তাদের সামনে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে ধরা হয়েছে এবং নিয়ে যাওয়া হয়েছে থানায়। বাস্তবের পরিহাস সংসদ ভবনের অবস্থিত হল থানায়। তাঁদের মিসায় আটক করা হল। এ হল সেই আইন যার প্রয়োগ দ্বারা চোরাচালানীদের আটক করা হয়ে থাকে। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সমস্ত পার্টির লোককেই। দক্ষিণপন্থী জনসঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ যেমন ছিলেন তেমনি বামপন্থী সি-পি-আই (এম)-এর নামও ছিল ঐ তালিকায়। একমাত্র পার্টি যাদের একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয় নি সে হল মস্কোপন্থী কমুনিস্ট পার্টি। কংগ্রেসী জোটের অন্যতম শরিক।

জেপি যখন গ্রেপ্তার হন তখন একটি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করেন: 'বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি।' মাত্র ত'দিন আগেই একজন ইটালিয়ান সাংবাদিকের কাছে মোরারজী দেশাই নিজের গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শ্রীমতী গান্ধী এটা কখনই করবেন না। তার আগে তিনি আত্মহত্যা করবেন। তাঁকে এবং জে-পিকে দিল্লির খুব কাছে সোনাভাক বাংলোতে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়। তবে দুজনকেই আলাদা আলাদা ঘরে রাখা হয় এবং দু'জনের মধ্যে কোন যোগাযোগ রাখা হয় না। সেদিন সকালে দিল্লির বেশীরভাগ খবরের কাগজই প্রকাশিত হতে পারে নি। কেননা খবরের কাগজের অফিসগুলিতে সেদিন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যদিও বলা হয়েছিল সরবরাহ ব্যবস্থায় 'গণ্ডগোল' থাকার জন্যই নাকি এমনটি হয়। স্টেট্‌সম্যান এবং হিন্দুস্থান টাইম্‌স প্রকাশিত হয়। কারণ ঐ দুটি কাগজের অফিসে নয়াদিল্লি মিউনিসিপ্যালিটি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে—দিল্লি মিউনিসিপাল করপোরেশন বাকীগুলিতে এবং একমাত্র ঐ করপোরেশনই রাতের দিল্লিকে ব্ল্যাক করে দেওয়ার জন্য অর্ডার পেয়েছিল। পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশেও সংবাদপত্র অফিসের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে অন্যান্য শহরে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ২৬শে জুন সকাল থেকেই অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সংক্রান্ত খবরের উপর সেন্সরশিপ আরোপ

করা হয়। সমস্ত খবরই সরকারের হাতে দিতে হত সেগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার জন্য।

সকাল ছ'টা বাজার আগেই অনেক মন্ত্রীই কেবিনেট মিটিংয়ের জন্য এক নম্বর সফদরজং রোডে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। গ্রেপ্তারের তালিকায় যাদের নাম ছিল তাদের প্রায় প্রত্যেকেই ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মোট ৬৭৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মজার কথা হল, কেবিনেট মিটিংয়ে এই গ্রেপ্তারের কথা তোলাই হল না। এমার্জেন্সীর ঘোষণা পত্রখানা যা আগে থেকেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়া গেছে তা কেবিনেটের অনুমোদনের জন্য সবার সামনে উপস্থাপিত হল। সকলে নীরব। টু শব্দটিও নেই। জগজ্জীবনরাম সামনে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন উদাস দৃষ্টিতে। আবহাওয়া বেশ ভারী হয়ে উঠলো।

একটু বিরতির পর স্বরণ সিং মুখ খুললেন। বললেন, জরুরী অবস্থা ঘোষণার আদৌ কোন দরকার ছিল কি? তবে এ নিয়ে তিনি বেশী ঘাঁটালেন না। শ্রীমতী গান্ধীও কিছু বললেন না। তারপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা হল, সংবিধানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা সম্পর্কে কী বলা আছে সে বিষয় নিয়ে।

আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া এই কেবিনেট মিটিংয়ের আর কোন গুরুত্ব ছিল না। মিটিং শেষ হতেই শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বেতার বক্তৃতা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। ভোর চারটের মধ্যেই ঐ বক্তৃতা লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবে কয়েকটি ইংরাজী শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ খুঁজে না পাওয়ায় একটু দেরী হচ্ছিল।

স্টেট্সম্যান ও হিন্দুস্থান টাইম্স এই বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা বের করবে ঠিক করেছিল। দুপুর এগারোটা নাগাদ হিন্দুস্থান টাইম্সের বিশেষ সংখ্যা রাস্তায় বিক্রী হতে শুরু হয়েছিল। স্টেট্সম্যানের রোটারী তখন সবে চালু হতে যাচ্ছে। এমন সময় টেলিপ্রিন্টারে সেন্সরশিপের খবর এল। গ্রেপ্তার এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সব খবর আগে সরকারের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে তারপরেই ছাপা যাবে। স্টেট্সম্যান তখন ঐ বিশেষ সংখ্যার পেজ-প্রুফ শাস্ত্রীভবনের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো অফিসে পাঠিয়ে দেয়। পি-আই-বি অফিস থেকে যখন ঐ কাগজ ফিরে আসে তখন দেখা যায়, ধৃত নেতাদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের ছবির উপরও ক্রস চিহ্ন আঁকা। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে স্টেট্সম্যানের বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার বিশেষ সংখ্যা আর ছাপা হল না। কিন্তু ঐ কাটাকুটি করা পেজ-প্রুফটা রয়ে গেল এক ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে।

জনসঙ্ঘের মুখপত্র মাদারল্যাণ্ড-ই একমাত্র পত্রিকা ক্রোড়পত্রসহ যার সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কিন্তু মাদারল্যাণ্ড অফিস সীল করে দেওয়া হয়।

সকালের বেতার বক্তৃতায় শ্রীমতী গান্ধী বললেন, সবকারকে বাধ্য হয়ে এই সব ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। কেননা গণতন্ত্রের নামে ভারতবর্ষের সাধারণ পুরুষ ও নারীর কল্যাণার্থে তিনি যে সব প্রগতিশীল ব্যবস্থাদি গ্রহণ করছিলেন তার বিরুদ্ধে সারা দেশে এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত শুরু হয়েছিল। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক কাজকর্মের মূলে কুঠারাঘাত করাই ছিল এই চক্রান্তের মূল লক্ষ্য। ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছিল না এবং কয়েকটি স্থানে আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে নির্বাচিত বিধান সভার সদস্যদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে তাদের পদত্যাগে পর্যন্ত বাধ্য করা হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী ললিত নারায়ণ মিশ্রের হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, এর ভেতরও বিরোধী দলগুলির হাত ছিল।

এই সব বীরত্বব্যঞ্জক কথাবার্তা বলার পরও কিন্তু তাঁর মনের ভয় কেটে গেল না। কেননা এই বক্তৃতাদি করার কিছুক্ষণ পর তিনি একজন সহযোগীকে বলেছিলেন 'এ সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া কী হবে তা আমি সঠিকভাবে জানি না।

জনসাধারণও খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। জরুরী অবস্থা মানে কী সেকথা তারাও কেউ জানতো না। পরে তারা ধীরে ধীরে এ কথা বুঝতে পারে যে গত ২৫ বছর ধরে এদেশে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসারে কাজকর্ম চলেছে এবার তার পরিসমাপ্তি হ'ল। এই মৃত্যু কি চিরতরে ঘটলো? তারা এ নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেল।

শ্রীমতী গান্ধীর কয়েকটি কথা বারবার রেডিও টিভি মারফৎ প্রচারিত হল। সেই কথাগুলি হল, 'এবার আমরা দেখতে পেলাম দেশের স্বাভাবিক কাজকর্মে উৎসাহ দেবার জন্য নতুন ধরনের পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। যে সরকারের সামান্যতম কার্যশীলতা আছে সেই সরকার দেশের স্থিতিশীলতাকে কি করে বিপন্ন করতে পারে?

জরুরী অবস্থার একটা লাভ হল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম স্থিতিশীল হল। স্কুল, দোকান, ট্রেন এবং বাসে দেখা গেল শৃঙ্খলা এমন কি দিল্লির রাস্তা থেকে গোরু এবং ভিখারী উধাও হল।

কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী একটা কথা একেবার ব্যাখ্যা করলেন না। তাহ'ল এলাহাবাদের রায়ের পরেই তিনি এসব ব্যবস্থা নিতে গেলেন কেন, সাধারণ

আইন কেন শিল্প ও স্কুল কলেজের বিশৃঙ্খলা রোধ করতে পারলো না, কেনই বা দেশের অন্যান্য অসুবিধাগুলিকে সাধারণ আইনের সাহায্যে দূরীভূত করা গেল না।

এসব কথা ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন ছিল। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, এসব ব্যাখ্যা করে কোন লাভ নেই। তিনি জানতেন যে তাঁর প্রতি মানুষের বিশ্বাস কম। ললিত নারায়ণ মিশ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "এমন কি আজ যদি আমার হত্যা হয় তাহলেও লোকে বলবে এর পেছনে নিশ্চয়ই আমার নিজের কোন হাত ছিল।"

যাই হোক না কেন, তিনি যা করলেন তা পূর্ব নজীরবিহীন। এ ছিল "সামরিক আইন" জারি করার মতই কঠোর ব্যবস্থা। এ ছিল 'পুলিশী আইন'। তীব্র আঘাত পেলে মানুষ যেমন হতবাক হয়ে যায় সমগ্র দেশের সেই রকম একটা আবহাওয়া পরিব্যাপ্ত ছিল। এমন কঠোর ব্যবস্থা যে গৃহীত হতে পারে তা যেমন কেউ কল্পনা পর্যন্ত করেনি ঠিক তেমনি এই ব্যবস্থাসমূহের পরিণতি যে কী তাও তৎক্ষণাৎ কেউ বুঝতে পারে নি। এ ছিল 'বৃহস্পতিবারের নির্দয় হত্যাকাণ্ড।' এর প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে শ্রীমতী গান্ধী নিজেও এর বাইরে কিছু করতে পারছিলেন না।

দেশের অন্যান্য মানুষের মত তাঁর নিজের দলেরও বেশীর ভাগ লোক হতবাক হয়ে গিয়েছিল, এবং তাঁরাই সবচেয়ে বেশী গুটিশুটি মেরে গিয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে তাঁর আবির্ভাবের পর তিনি যে ক্ষমতার পিরামিড ধীরে ধীরে গড়ে তুলছিলেন তাতেই অবশ্য তাদের হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখন তাঁর কথা মানেই আইন। সে বিষয়ে কারও সন্দেহ করার কিছু ছিল না। কেবিনেট মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে কনিষ্ঠতম একজিকিউটিভ কাউন্সিলার পর্যন্ত প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছায় বাঁধা ছিল। সামান্যতম বিদ্রোহের মনোভাবও যাঁর মধ্যে দেখেছেন তিনি তাঁকেই সরিয়ে দিয়েছেন। পরে যাঁরা পদাধিকারী ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের রাজনৈতিক ভূত ভবিষ্যত তাঁর কাছে বন্ধক দেওয়া ছিল। তাদের মধ্যে প্রতিবাদ করার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত ছিল না।

মাত্র দুজন লোক শ্রীমতী গান্ধীকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন। এঁরা দু'জন হলেন চবন এবং জগজীবন রাম। কিন্তু তাঁরা দুজন কখনই হাত মেলাতে পারবেন না। কেন না পৃথক পৃথক ভাবে তাঁরা দুজনই প্রধানমন্ত্রী হতে চান। তাঁদের দুজনের কেউই শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ঝুঁকি নিতে চান নি।

কেননা চ্যালেঞ্জ করার আগে তাঁরা যাচাই করে নিতে চান যে এর ফলে তাঁদের ক্ষমতার আসন অক্ষুণ্ণ থাকবে তো? এবং সেই সময় তাঁরা দেখেছিলেন যে বিদ্রোহী হলে ক্ষমতায় টিকে থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই।

শ্রীমতী গান্ধী জানতেন, এই দুটি লোকের উপর কড়া নজর রাখতে হবে। এবং তিনি সে নজির রেখেছিলেনও।

২৬ জুন আমি যখন চবন এবং জগজীবনরামের সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন দেখি বাইরে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা গাড়ীর নম্বর এবং গাড়ীতে যারা আসছে তাদের নাম লিখছে। চবন আমার সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। জগজীবনরাম মাত্র এক মিনিটের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে বড্ড বেশী অস্থির মনে হচ্ছিল। জগজীবনরাম আমাকে যা বলেছিলেন তা হল, যেকোন মুহূর্তে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারে। আমাকে এই কথা বলার আগে তিনি টেলিফোনের রিসিভারটি নামিয়ে রেখেছিলেন। টেলিফোনে আড়ি পাতার সর্বাধুনিক পদ্ধতি হল রিসিভার টেলিফোন বক্সের উপর থাকা অবস্থায় ঘরের ভেতরকার কথাবার্তা টেপ হয়ে যাওয়া।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ২৬ জুন রাত থেকে যে বিজয় উৎসব আরম্ভ হয়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ কি। কোন রকম ঝামেলা না করেই সব ঠিকঠাক মত হয়ে গেল। কাজেই এ বিষয়ে গান্ধীর আত্মতুষ্টি থাকবেই। এর বিরুদ্ধে কোথাও কোন বিরোধ এক রকম হয়নি। কয়েকটি যে ঘটনা ঘটেছিল তা সংখ্যায় অতি নগণ্য এবং শীঘ্রই সেগুলিকে সঠিক পথে চালিত করে দেওয়া হয়। মাত্র কয়েকজন আত্মগোপনে সমর্থ হলেন যেমন শ্রমিক নেতা জর্জ ফার্নাণ্ডেজ এবং জনসঙ্ঘের দুই নেতা নানাজী দেশমুখ এবং সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়। (কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি শেষ রাতে নানাজীকে ফোনে জানায় যে পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছে। খবর পেয়েই নানাজী পালিয়ে যান। পুলিশ আর তাকে ধরতে পারে না।)

সঞ্জয় তার মাকে বললো, "আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, কিছুই হবে না।" বংশীলাল বললেন, তিনি যেমন আশা করেছিলেন তেমনই হয়েছে। রাস্তায় একটা কুকুরও ঘেউ ঘেউ করে নি। এলাহাবাদে খবর চলে গেল যে, বিচারপতি সিন্‌হাকে যেন উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ তার পেছনে ছায়ার মত লেগে রইল। তাঁর অতীত কার্যাবলী খতিয়ে দেখা হতে থাকলো এবং তার আত্মীয়স্বজনকে হেনস্থা করা হতে থাকলো।

গুজরালের জায়গায় এলেন বিদ্যাচরণ শুক্লা। ২৮ জুন গুজরালকে পাঠিয়ে দেওয়া হল পরিকল্পনা কমিশনে। শুক্লা জানালেন সেন্সরশিপ ব্যবস্থা অতি দ্রুত কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে। খবর দেখে খুব খুশী হলো যে দিল্লিতে সেন্সরশিপের কোন প্রয়োজনই নেই। দিল্লির সমস্ত সংবাদপত্র অফিসে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে খবর একবার তাদের শিক্ষা দিয়েছিল। যতদিন না খবর আবার বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করতে বলেছে ততদিন পর খবরের কাগজ বন্ধ ছিল।

শ্রীমতী গান্ধী একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে এবং ঠিকঠাক মত চলছে একথা এত শীঘ্র তিনি বলতে চাইছিলেন না। যদিও বিভিন্ন রাজ্য থেকে মুখ্যমন্ত্রীরা খবর পাঠাচ্ছিলেন, "পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে।"

দিল্লির রাস্তায় কবর ঢাকার চাদরের মত যেন 'ভীতি' নামক পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছিল। জনসঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকেরা দলে দলে গ্রেপ্তার বরণ করছিলেন, সেই সূত্রে কিছু ঘটনাও ঘটেছিল। তাছাড়া আপাতদৃষ্টিতে দিল্লির জীবন ছিল শান্ত। বিখ্যাত ফটোগ্রাফার রঘুরাই-এর তোলা একটি ছবি তখন স্টেটসম্যানে ছাপা হয়েছিল। ছবিতে ছিল চাঁদনী চৌক এলাকায় একটা লোক তার দুটি বাচ্চাকে সাইকেলে বসিয়ে সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে একটি মহিলা হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। আর চারিদিকে দলে দলে পুলিশ। ছবির ক্যাপশান ছিল: 'চাঁদনী চৌকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা।' (সেন্সর এ ছবিতে খারাপ কিছু না দেখে 'পাকা' করে দেন! ছবিটি ছাপা হওয়ায় পরের দিনই সেন্সর বদলি হয়ে যায়।)

উত্তর প্রদেশের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে 'মিসা' অর্ডারের সাইক্লোস্টাইল করা কপি সব সময়ই মজুত থাকতো। ঐসব 'ব্ল্যাঙ্ক' বা ফাঁকা অর্ডার পত্রের নীচে তারা (কাজের সুবিধার জন্য) আগেই সই করে রাখতেন এবং সেগুলি চলে যেত পুলিশের হাতে। গোয়েন্দা বিভাগের পুরনো রেকর্ড দেখে তৈরী করা গ্রেপ্তারের তালিকা অনুসারে পুলিশ গ্রেপ্তার অভিযান চালাচ্ছিল। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে পুলিশ আগ্রায় এমন একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে যায় ১৯৬৮ সালে যার মৃত্যু হয়েছে।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল। সাপ্তাহিক পাঞ্চজন্য, দৈনিক তরুণ ভারত, মাসিক রাষ্ট্রধর্ম এ তিনটিই জনসঙ্ঘের পত্রিকা। এদের দরজায় পুলিশ তালা লাগিয়ে দিয়ে যায়। কোন রকম সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই একটি পুলিশ পার্টি উপরোক্ত কাগজগুলির অফিসে ঢুকে পড়ে এবং অফিসে যারা কাজ

করাছল তাদের একরকম ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে পুলিশ অফিসে তালা লাগিয়ে দিয়ে যায়। উদ্দেশ্য কাগজগুলির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া। এই পত্রিকাগুলির প্রকাশক রাষ্ট্রধর্ম প্রকাশন লখনৌতে এমন একজন উকিল পান না যিনি এই নিয়ে মামলা করবেন। উকিলরা সকলেই ভীত। একটু সাহস দেখিয়ে যে উকিলই এদের মামলা গ্রহণ করেছেন, তাঁকেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতরক্ষা বিধিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পাঞ্জাব সরকার প্রথমে আকালীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। তাঁদের ধারণা ছিল আকালীরা সরকার পক্ষ সমর্থন করবে কেননা শিখ-হিন্দু প্রশ্নে জনসঙ্ঘের সঙ্গে আকালীদের বিরোধ আছে। কিন্তু সরকার ভুলে গিয়েছিলেন যে গত কয়েক বছরের ব্যবধানে উভয় দলের ভিতর যে বিরোধ ছিল তা মুছে গেছে। লুধিয়ানায় জেপি'র সফর উপলক্ষে আকালীরা প্রায় পাঁচ লক্ষ শিখের সমাবেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলো যে আকালী দল জাতীয় স্তরে বিরোধী দলগুলির অনেক কাছে এসেছে। যাই হোক সরকারের স্বেচ্ছাচারিতামূলক অত্যাচারের চেয়ে আকালীদের কাছে বরং জনসঙ্ঘের অস্বস্তিকর সাহচর্যও অনেক শ্রেয়।

পাঞ্জাব পুলিশও খবরের কাগজের উপর বর্বর আক্রমণ চালায় এবং মোটামুটি ভাবে জলন্ধরেই এই বর্বরতা তীব্ররূপ ধারণ করে। সেখানে ট্রেনের সময়ের সুবিধার জন্য মধ্যরাত্রেই সব কাগজ ছাপা হয় এবং সেই সময় পুলিশ গিয়ে সমস্ত কাগজ নষ্ট করে দেয়। কেন্দ্রশাসিত চণ্ডীগড়ের ট্রিবউন পত্রিকার অফিসে ঢুকেও পুলিশ তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দেয়। ট্রিবউন অফিসে ঢোকার জন্য অনুমতির দরকার ছিল। চীফ কমিশনার পুলিশের কাজে আপত্তি করেন। পরে ধবন ঐ কমিশনারের বুদ্ধিকে সঠিক পথে চালিত করে দেয়।

হরিয়ানায় 'মিসা' এবং ডি আই আর-এ গ্রেপ্তার করা যেন অফিসারদের একটা খেলায় পরিণত হয়েছিল। বড় অথবা ছোট, বন্ধু অথবা শত্রু কাউকে আটক করার জন্যই এখানে কোন অজুহাত সৃষ্টির পর্যন্ত প্রয়োজন পড়তো না। জরুরী অবস্থা জারির সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দল সমূহের নেতা ও কর্মীরা ছাড়াও হরিয়ানায় হাজার হাজার লোককে অযথা আটক করা হয়েছিল। আটক থাকা অবস্থাতে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে সেখানে ক্রিমিনালদের মত আচরণ করা হয়েছে।

সারা দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্র হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনই হল প্রথম যারা শ্রীমতী গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরোধিতা করে। অল ইণ্ডিয়া বার

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রামজেঠমালানি শ্রীমতী গান্ধীকে হিটলার ও মুসোলিনীর সঙ্গে তুলনা করেন। যদিও জেঠমালানি আগে থেকে এ কথাই বলেছিলেন যে সুপ্রীম কোর্টে যখন শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে 'স্টে অর্ডার' দিয়েছে তখন তার প্রতি সম্মান দেখানো উচিত।

অন্য অনেক রাজ্যের বার অ্যাসোসিয়েশনও এই সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক পশ্চিমবঙ্গ বার অ্যাসোসিয়েশন এ বিষয়ে নীরব থাকে।

জরুরী অবস্থার দাপট গুজরাটকে তত পোয়াতে হয়নি। কারণ গুজরাটে তখন যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বাবুভাই প্যাটেল রেডিও মারফৎ কিছু বলতে চেয়েছিলেন। কেন্দ্র তাঁকে সে সুযোগ দেন নি। জরুরী অবস্থার সঙ্গে সেই তাঁর প্রথম সঙ্ঘর্ষ। কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন রাজ্যে নির্দেশ গেল যে জনসঙ্ঘ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের যেন গ্রেপ্তার করা হয়। বাবুভাই প্রথমে সে আদেশ মানেন নি। পরে গ্রেপ্তার করলেও ডি আই আর অনুসারে আটক করেছেন যাতে ধৃত বন্দীরা জামিনে মুক্ত হতে পারে। মিসা আটক বন্দীরা জামিনের সুযোগ পেত না।

এক সাক্ষাৎকারে বাবুভাই বলেন, নাগরিক স্বাধীনতাকে তিনি ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না এবং সভা ও শোভাযাত্রার উপরও তিনি কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন না।

রাজ্যের সর্বত্র জরুরীর অবস্থার প্রতিবাদ হতে থাকলো। বড় বড় শহরগুলিতে প্রতিবাদ আরও তীব্র রূপ ধারণ করতে থাকলো। নাগরিকরা কালো ব্যাজ ধারণ করলো। বাড়ীতে বাড়ীতে উড়তে দেখা গেল কালো পতাকা। ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে যে মানবিক অধিকারের কথা লেখা আছে অনেকে বাড়ীর দরজায় সেই কথাগুলিও লাগিয়ে রাখতে লাগলো।

প্রকাশ্য বিক্ষোভ দেখানো হল বিভিন্ন ভাবে—যেমন মৌন মিছিল, ছাত্র শোভাযাত্রা, অনশন, ধর্মঘট এবং ধর্ণা। এই রাজ্য ক্রমেই শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধবাদীর আশ্রয় স্থলে পরিণত হল এবং এই ধরণের বহুলোক সারা ভারত থেকে গুজরাটে এসে আশ্রয় নিতে লাগলো।

রাজ্য সরকার সেন্সরশিপ ব্যবস্থাকে অনুমোদন করেন নি এবং তথ্য দপ্তরের ডিরেক্টরকে চীপ সেন্সর হিসাবে নিয়োগ করেন নি। কিন্তু আমেদাবাদের কলেজ অধ্যাপকরা এই সময় এক আন্দোলন করেন এবং এ নিয়ে একটা পুরোদিন বিধান সভায় আলোচনা হয়। এটা সঠিক ভাবে জানা যায় নি যে তথ্য দপ্তরের ডিরেক্টর রাজ্য সরকারের নির্দেশানুসারে না নিজের থেকে

বিধানসভায় ঐ বিতর্কের রিপোর্ট প্রকাশ করতে সংবাদ পত্রগুলিকে নিষেধ করেন।

কিছুদিন পরে কেন্দ্রীয় সরকার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রধানকে চীফ সেন্সর পদে নিয়োগ করেন। এই ভদ্রলোক সেন্সর করা এমার্জেন্সী বিরোধী খবর কেটে ছেঁটে দিলেও রাজ্য সরকারের অসুবিধা হতে পারে এমন কোন খবরের ওপর তিনি ভুলেও কাঁচি চালাতেন না।

তামিলনাড়ুও প্রেস সেন্সরশিপ মানে নি। এম করুণানিধির নেতৃত্বে রাজ্যে ডি এম-কে সরকার অবশ্য কেন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধীতায় লিপ্ত হতে চান নি। তাঁরা বলেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সেই সমস্ত নির্দেশই আমরা মেনে চলবো যা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। বেসরকারী ভাবে ডি এম-কে ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ বিরোধী।

পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রী থেকে শুরু করে কনস্টেবল প্রত্যেকেই দেখল এই হল সুযোগ যখন ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিরোধগুলি জরুরী অবস্থার নামে মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। আনন্দবাজার পত্রিকার দু'জন সাংবাদিক যাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লিখেছিলেন তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ঘোষ রাজনৈতিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে কলকাতা নামক একটি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং সেনগুপ্তর আক্রমণ ছিল ব্যক্তিগত। মিসায় তাদের গ্রেপ্তারের অর্ডার দেওয়া হয়। ঘোষকে সহজেই গ্রেপ্তার করা গেলেও সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালিয়ে দিল্লী চলে যান। সেখানে বেশ কিছুদিন তিনি নামী লোকের আশ্রয়ে থাকেন। এর দ্বারা বেশ বোঝা যায় যে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা বেশ খারাপ হয়ে এসেছিল। কিন্তু পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয় এবং জেলে তার প্রতি বিশেষ দুর্ব্যবহার করা হয়, কেননা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করায় তিনি সেনগুপ্তর উপর খুব রেগে যান।

অসুস্থ মাকে দেখার জন্য প্রজা সমাজতন্ত্রী নেতা অশোক দাসগুপ্তকে হাতে-হাতকড়া লাগিয়ে চার ঘণ্টার প্যারোলে বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়েছিল। তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, তিনি রাজনৈতিক বন্দী। হাতে হাতকড়া দেখলে অসুস্থ মা মনে কষ্ট পাবেন। কিন্তু পুলিশ কোন কথায় কান দেয় নি। মনে হয় ওপর থেকে কড়া নির্দেশ ছিল যে, জরুরী অবস্থাকালে ধৃত ব্যক্তিদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন এলেই হাতকড়া পরাতেই হবে। বহু আয়োজনের পর এই কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল হয়।

সংগঠন কংগ্রেস নেতা রাজকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল প্রাইভেট বাসে ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেছিলেন বলে। সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ. বি. এ, গনিখান চৌধুরী তাঁর নিজস্ব জেলা মালদায় মিসা মন্ত্রী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। যাকেই তিনি অপছন্দ করতেন তাকেই তিনি মিসায় আটক করবেন বলে হুমকি দিতেন।

প্রেস সেন্সরশিপকে দলীয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করা হত। এমন ভুরি-ভুরি উদাহরণ আছে যেখানে বহু রিপোর্ট এমন কি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিবৃতি পর্যন্ত সেন্সরের কাঁচিতে কাটা পড়েছে কেননা রাজ্যের তথ্য মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী ব্যক্তিগতভাবে সেগুলি অপছন্দ করেছেন। সেন্সরে অফিসারদের তথ্য-মন্ত্রী সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে রেখে ছিলেন যে তাঁর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কোন খবরই যেন ছাপা না হয়।

বিহারে জরুরী অবস্থাকাল ছিল এমন একটা সময় যখন সেখানে বহু আমীর ওমরাহের উত্থান হয়েছে। তাদের মুখের বাণীই ছিল আইন। কোন কোন ওমরাহ থাকতো গুণ্ডাদের স্টাইলে, কারও সার্কিট হাউসে ঘর রিজার্ভ করা থাকতো এবং ডাকবাংলোগুলি থাকতো পান ভোজন করার জন্য। জেলা-গুলিতে জেলাশাসকের চেয়ে এরাই ছিল বেশী ক্ষমতাবান। মুখ্যমন্ত্রীর-মতই ভালো মানুষের ভূমিকা ছিল তাদের। অফিসাররাও জানতেন যে আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কাজ করার সম্ভাবনা খুবই কম।

প্রতিটি আইনের ব্যাখ্যাই এমনভাবে করা হত যাতে শাসকদলের মধ্যেও গোষ্ঠী স্বার্থ অথবা ক্ষেত্র-বিশেষে ওমরাহদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধিতে সুবিধা হয়। জমিদাররা ভূমিরাজ আইন দ্বারা তখনই দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন যখন জানা যাবে যে ঐ জমিদার বিরোধী দলের প্রতি কিম্বা কংগ্রেসেরই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল।

সরকারী প্রচার বিভাগ মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ভীষণভাবে ব্যস্ত ছিল। সেন্সর অফিসাররা কড়া নজর রাখতেন যাতে সংবাদপত্রে সমালোচনা মূলক কিছু বেরিয়ে না যায়। সেন্সরশিপের অর্থই ছিল এমন কোন সংবাদ প্রকাশিত হতে না দেওয়া যাতে মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের ভেতর যে গোষ্ঠী শাসন ক্ষমতায় আছে তাদের বিচলিত না হতে হয়। বিহারে এবং ভারতের আর কোথাও সংবাদপত্রে পুর্নিয়া এবং মুঙ্গেরের দাঙ্গার কথা প্রকাশিত হয়নি। ঠিক সেইরকম ভাগলপুর জেলের মধ্যে যে গুলীচালানো হয়েছে সে খবরও কোথাও প্রকাশ করতে দেওয়া হয় নি। ভাগলপুর জেলের আটক বন্দীদের অপরাধ

ছিল তাঁরা জেল কোডের বক্তব্য অনুসারেই সুযোগ সুবিধা দাবি করেছিলেন। গুলী চালিয়েই যাদের আনন্দ সেই ধরণের পুলিশ এবং ওয়ার্ডাররা হাতে সুখ করে বারোটি প্রাণকে সেদিন খতম করে দিয়েছিল।

সারা ভারত থেকে দুর্নীতি ও অগণতান্ত্রিক অপশাসন নির্মূল করার জন্য জেপি এই রাজ্যটিকেই প্রাথমিক কর্মস্থল হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। ছাত্র সংঘর্ষ সমিতি ও লোক সংঘর্ষ সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত যুব শক্তিও জনশক্তির উপর নির্ভর করে জে-পি তাঁর 'সম্পূর্ণ বিপ্লবের আদর্শকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেন। এছাড়া গ্রাম পর্যায় থেকে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে জনতা সরকার গঠনের জন্যও তিনি চেষ্টা চালান। জেপি এগুলিকে বিকল্প প্রশাসন ব্যবস্থা হিসাবে মোটেই গড়তে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন এই সংস্থাগুলি যেন সরকারী কাজকর্মে সাহায্য করতে পারে।

বিহার, গুজরাট অথবা দিল্লি যেখানেই হোক না কেন ভারতের সর্বত্র, সামান্যতম আনুগত্য হীনতা দেখলেও বর্বর শক্তি প্রয়োগ ও নির্দয় দমন-নীতি চালনো হত। সর্বত্র পুলিশ বিরোধীদেরই গ্রেপ্তার করতো। ওয়ারেন্ট কোন ব্যাপারই ছিল না। থাকলেও হয়, না থাকলেও হয়। মিসা বা ডি আই আর এ গ্রেপ্তার ছিল বাঁধা।

যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল অর্থাৎ বিরোধী দলনেতাদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা এ দুটি কাজই বেশ সুষ্ঠুভাবে এবং দ্রুত সম্পন্ন হয়েছিল। বিনা রক্তপাতে শাসন ব্যবস্থার অন্যায় পরিবর্তন হয়ে গেল।

সারা ভারতে তখন যাকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে বলা হয়েছে, জনসাধের খাতিরে গ্রেপ্তার করা হল। ঠিক তেমনি বিদেশী সাংবাদিকদেরও বহিষ্কারের আদেশ টাইপ করে ঠিকঠাক মত রাখা ছিল। লণ্ডন টাইমসের পিটার হ্যাজেলহার্স্ট যিনি বাংলাদেশ সঙ্কটের সময় পাকিস্তানি অত্যাচারের কথা সারা পৃথিবীকে জানিয়েছিলেন, নিউজ উইকের লোরেন জেনকিন্স এবং লণ্ডনের ডেলী টেলিগ্রাফের পিটার গিল—এঁরা তিনজন প্রথম বহিষ্কার আদেশ সম্বলিত চিঠি পান যাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্মসচিব এস এস সিধুর স্বাক্ষর ছিল। ভারতের রাষ্ট্রপতির নামে প্রদত্ত ঐ আদেশ পত্রে লেখা ছিল যে তাঁরা আর ভারতে থাকতে পারবেন না, ঐ আদেশ পাওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাদের এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং তাঁরা আর ভারতে প্রবেশ করতে পারবেন না। জেনকিন্স লিখেছিলেন, 'গত দশ বছরে ফ্রাঙ্কোর স্পেন

থেকে শুরু করে মাও-এর চীন পর্যন্ত বহু স্থানে রিপোর্টিং করেছি—কিন্তু ভারতের মত এমন কঠোর এবং সর্বব্যাপী সেন্সরশিপ কোথাও দেখি নি।'

এদের তাড়ানোর পদ্ধতিটাও ঐ একই রকম ছিল। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের দরজায় ধাক্কা দেওয়ায় তিনি বেরিয়ে এলে বহিষ্কারের আদেশটি তাকে দিয়ে দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সর্বত্র খানা তল্লাসী করার শেষে বলা হয় যে এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী ছেড়ে এবং এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ভারতের বাইরে যাঁরা থাকতেন তাঁরা এই বহিষ্কারের আদেশে বিশেষ আহত হন। যদিও তাদের অনেকে মনে করতেন যে গণতন্ত্র এবং বৃটিশ সংসদিয় পদ্ধতি ভারতে ঠিক খাপ খায় না। এই মনোভাব ভারতের শাসকদের পক্ষে কিঞ্চিত উৎসাহব্যাঞ্জক হলেও তারা কিন্তু ব্যাপকভাবে ও বিনা বিচারে লোকজনকে আটক রাখায় এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেওয়ায় বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কেননা এমনটি আগে কখনও হয় নি।

দেশের প্রশাসনে যদি বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটতো তাহলে বিদেশে যে তার কী প্রতিক্রিয়া ঘটতো তা সহজেই কল্পনা করা যায়। কেননা শ্রীমতী গান্ধী যা করেছেন পশ্চিম তাতে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। পিতা যা তৈরী করেছিলেন কন্যা তা হত্যা করলেন।

কিন্তু কোন বিদেশী রাষ্ট্রই সরকারীভাবে কিছু বললেন না। তাঁরা একে ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলেই বর্ণনা করলেন। পশ্চিমী সংবাদপত্রগুলি ভারতের জরুরী অবস্থাকে সমালোচনা করায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেও বিদেশী সরকারগুলি যে ভারতের ব্যাপারে কোন কিছু মন্তব্য করলেন না তাতে ভারত সরকার বেশ খুশীই হয়েছিলেন।

স্বভাবতঃই দেশের ভেতর থেকে প্রচণ্ড চাপ আসায় প্রেসিডেন্ট ফোর্ড তাঁর ভারত সফর অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। ওয়াশিংটনস্থ ভারতের রাষ্ট্রদূত ত্রিলোকিনাথ কল দিল্লিকে জানালেন যে, ফোর্ডের এখন ভীষণ কাজের চাপ তাই আসতে পারছেন না। ওদিকে মার্কিন অফিসাররা জানালেন যে এ কথা ঠিক কার্যসূচীর ভিড়ে ক্যালেণ্ডার ভারাক্রান্ত, তবুও ভারতে যে অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থা রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের এখন ভারত ভ্রমণ স্থগিত রাখা হয়েছে।

এর পরেই ফোর্ড বলেন, 'আমার মনে হয় এটা খুবই দুঃখের কথা যে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ভারতের ৬০ কোটি মানুষ যা ভোগ করে আসছিল আজ তারা সে বস্তু হারিয়েছে। আশাকরি অচিরেই ভারতে সেই

রকম গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পুণঃপ্রতিষ্ঠা হবে যার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা পরিচিত আছি।' ফোর্ড চীন সফরে যাবার প্রাক্কালে এই মন্তব্য করেছিলেন বলে আমাদের সরকারের একটু সুবিধা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত অমার্জিত এবং স্বেচ্ছাচারী মহম্মদ ইউনুস বিদেশী সাংবাদিকদের বলেন, এটা খুব কৌতুককর ব্যাপার যে চীন সফরের প্রাক্কালে ফোর্ড ভারত সম্পর্কে ঐ ধরণের মন্তব্য করলেন।

ওয়াশিংটনে ভারতীয়রা ইণ্ডিয়ানস্ ফর ডেমোক্রেসী নামে একটি সংস্থা তৈরী করেছিল এবং ৩ জুন তারা ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অস্থায়ী রাষ্ট্রদূতগণ সালভেজ ১২০০ ভারতীয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি তো গ্রহণ করলেনই না, উপরন্তু তাদের চীন এবং পাকিস্তানের দালাল বলে গালাগালি দিলেন।

মার্কিন ট্রেড ইউনিয়ান সংস্থা এ এফ এল-সিআই ও বলে, 'ভারতবর্ষ এক পুলিশ রাজে পরিণত হযেছে এবং গণতন্ত্রকে সেখানে গলাটিপে মারা হয়েছে।' এই সংস্থা মার্কিন সরকারের কাছে দাবি জানায় যে ভারতীয় জনগণের জন্য গণতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত ভারতকে দেয় অর্থ সাহায্য যেন না দেওয়া হয়।

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের একটা ভাবগত সম্বন্ধ আছে। তারা তো ভারতের অবস্থা জেনে রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। যাই হোক না কেন ভারতে তো বৃটিশ সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। তারা সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ হয়েছিল ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করে নেওয়ায়। লণ্ডন তার প্রতিবাদ জানাতেই প্রিন্স চার্লসের ভারত সফর সেই সময় বাতিল করে দেন। বিবিসি যারা এক সময় তাদের নয়াদিল্লি অফিস বন্ধ করে দিয়েছিল তারা ভারত সম্পর্কিত খবরের প্রচারের সময় বাড়িয়ে দেয় এবং ভারতের মানুষ এমন কি যারা জেলে ছিল তারা পর্যন্ত জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত দেশের খবরাখবর বিবিসির মাধ্যমে পেতে থাকে। এরপরেই বিবিসির সংবাদদাতা বন্ধু-বৎসল মার্ক টুলীকেও এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। কারণ সরকার এদেশ থেকে বিবিসি'র জন্য যে খবর যেত সেগুলি সেন্সর করানোর ব্যাপারে বিশেষ চাপ সৃষ্টি করছিলেন।

যাই হোক সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি থেকে যে খবর আসতো তা ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি সমর্থন-সূচক। 'প্রভেদা' দেখলো জরুরী অবস্থা জারি করার ফলে ভারতে কিছু ইতি বাচক ফল পাওয়া গেছে।

ঐ পত্রিকায় বলা হল, 'কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ-পন্থী দলগুলির নেতৃবৃন্দকে যে গ্রেপ্তার করেছেন দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি তা অনুমোদন করেছে। সেন্সরশিপ ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সংবাদপত্রের একচেটিয়া মালিকরা যে ক্রমাগত সরকার বিরোধী প্রচার করে যেত সেটা আর সম্ভব হবে না।'

চীনও সমালোচকের ভূমিকাই নিয়েছিল। ভারত সম্পর্কে চীন বরাবরই সমালোচনাপূর্ণ কথাবার্তাই বলে থাকে। এবারেও চীন যে প্রতিবাদ করলো তাতে জরুরী অবস্থার প্রতিবাদের চেয়ে ভারতকে হেনস্থা করার ইচ্ছাই যেন বেশী প্রকট।

জুলফিকার আলি ভুট্টো এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন যে শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচনের গণ্ডগোল মেটাতে আদালতের উপর বিশ্বাস রেখেছেন। পরে তিনি একটি সংবাদপত্রকে বলেন, এই উপমহাদেশের অপর প্রান্তে সম্প্রতি যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে তো মনে হয় দ্রুত পরিবর্তনশীল এলাকায় অবস্থিত হলেও পাকিস্তান অনেক বেশী সুস্থিত।'

গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশগুলিও মনে করে যে ভারত গণতান্ত্রিক পথ ছেড়ে মাঝামাঝি ধরণের এক নায়কতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছে।

শ্রীমতী গান্ধী সরাসরি পশ্চিমের বিরুদ্ধে কোন কথা না বললেও তাদের প্রতি তাঁর রাগ চাপা ছিল না। তিনি বলেছেন, তারা ভারতের প্রতি বিরোধী-ভাবাপন্ন। কোন দেশের নামোল্লেখ না করে তিনি রীতিমত রাগতভাবে বলেন, পশ্চিমী শক্তি এবং পশ্চিমী সংবাদ পত্র আমাদের 'গণতন্ত্র শেখাতে আসে'। যদিও তারা নিজেরাই সারা পৃথিবীতে অগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার ইন্ধন যুগিয়ে থাকে। তিনি পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করে বলেন, গণতন্ত্র নিয়ে তাদের কথা বলা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন না তারা নিজেরাই লাটিন আমেরিকার প্রায় সব দেশে বিভিন্ন প্রকারের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছে। শ্রীমতী গান্ধী এ প্রশ্নও উত্থাপন করলেন যে, পশ্চিমী সরকার ও পশ্চিমী সংবাদপত্রগুলি কি একই সূত্রে গাঁথা, তা যদি না হবে তাহলে তারা এক যোগে ভারতের গোপন আন্দোলনে ইন্ধন যোগাচ্ছে কেন?

তিনি বার বার এই কথা বলতে থাকেন যে আজ যে সব পশ্চিমী দেশ ভারতের নিন্দা করেছে সেই দেশগুলিই কিন্তু কিছুদিন আগে পাকিস্তানে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকারকে সমর্থন করেছিল এবং বাংলাদেশে মানবতার প্রতি যে পীড়ন হয়েছিল তাকেও তারা সমর্থন করেছিল। সেই

একই শ্রেণীর দেশ চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্ম এখন প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। 'অন্তকে উপদেশ দেবার পূর্বে এই দেশগুলির উচিত নিজেদের দিকে একবার তাকানো।'

যে সব বিদেশী সংবাদপত্রে ভারত বিরোধী সংবাদ অথবা অন্য কোন লেখা থাকতো সেগুলিকে ভারতে ঢুকতেই দেওয়া হত না। শুক্লার নির্দেশে দেশে সেন্সরশিপ ব্যবস্থাকে আরও কঠোর করা হয়।

নতুন করে সংবাদপত্রের জন্ম নির্দেশাবলী দেওয়া হল। তাতে বলা হল, গুজব ছাপা চলবে না, ভারতীয় বা বিদেশী কোন খবরের কাগজের আপত্তিজনক বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করা চলবে না, এবং যে সব লেখা ছাপলে সরকার বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হতে পারে সেগুলিও ছাপা হবে না। সমস্ত কার্টুন, ফটো, বিজ্ঞাপন সামগ্রী প্রভৃতি সবকিছু আগে থেকে সেন্সর করিয়ে নিতে হবে।

সংবাদ সরবরাহ সংস্থার অফিসগুলিতেই সেন্সর অফিসারদের বসিয়ে দেওয়া হল যারা সংবাদের উৎসমূলেই 'আপত্তিকর' সংবাদ না দিতে থাকলেন। বিদেশী সংবাদ সরবরাহ সংস্থা থেকে যে সব সংবাদ আসতো তার উপরও নজর রাখা হল। এমন কি বন্ধু দেশ সোভিয়েট ইউনিয়ন-বিরোধী কোন খবর এলেও তা কেটে দেওয়া হত। জেপি'র 'এভ্রিম্যান' এবং 'প্রজানীতি', জর্জ ফার্ণাণ্ডেজের 'প্রতিপক্ষ' এবং পিলু মোদির 'মার্চ অব ইণ্ডিয়াকে' প্রকাশন বন্ধ রাখতে হয়। জনসঙ্ঘের 'মাদারল্যাণ্ড' এবং 'অর্গানাইজার'কে নিষিদ্ধ করা হয় এবং তাদের প্রেস ও অফিস সীল করে দেওয়া হয়।

শুক্লা সাংবাদিকদের শায়েস্তা করবেন বলে সঞ্জয়কে কথা দিলেন—যা গুজরাল পারেন নি। দিল্লির সম্পাদকদের তিনি একটি সভায় ডাকলেন। সেখানে একেবারে কাঠখোট্টা ভাষায় তিনি সকলকে জানিয়ে দিলেন যে সরকার কোন প্রকার 'বেগড়বাই' সহ্য করবেন না। এ সরকার এখন থাকবে এবং শাসন করবে সে কথা মনে রেখে কাজ করবেন।

তিনি আমাকে বললেন, সম্পাদকীয় যেখানে ছাপা হয় সেখানে সাদা জায়গা ছেড়ে দেওয়াকেও সরকারের প্রতি অবজ্ঞা বলে ধরে নেওয়া হবে। (বৃটিশ আমলে সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্ম এইভাবে ফাঁকা জায়গা রেখে দেওয়া হত।) তিনি সম্পাদকদের গ্রেপ্তার করবেন বলেও ভয় দেখালেন। বেশীর ভাগ সম্পাদকই ভয় পেয়ে গেলেন, কিন্তু কেউ কোন প্রতিবাদ জানালেন না। এর চেয়ে আরও ভয়ের কথা হল ওখানে বেশ কয়েকজন ছিলেন যাঁরা সেন্সরশিপকে সমর্থন করলেন এবং এমন ভাবার্

সরকারের প্রশংসা করতে থাকলে যে একমাত্র শুক্লা ব্যতীত আর সকলেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

সংবাদপত্রের জন্য এখানে কেবল চাবুকটাই দেখানো হল। না, উৎসাহ পাবার মত কোন কথাই ছিল না। শুক্লা দেখলেন এদের শায়েস্তা করার এটাই পদ্ধতি। সেইজন্য তিনি ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের ( আই পি এস ) কে, এন, প্রসাদকে নিজের দপ্তরে নিয়ে এলেন। আসলে তিনি হলেন শুক্লার ডান হাত, যিনি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের পথ বাৎলে দিতেন। শুক্লা আদেশ জারির এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। কোন আদেশ দিতে হলে তিনি প্রথমে সেন্সরকে ফোন করতেন, সেন্সর অফিসার সে কথা আবার সংবাদপত্র অফিসে জানিয়ে দিতেন।

২৯ জুন কয়েকজন সম্পাদকসহ প্রায় ১০০ জন সাংবাদিক দিল্লির প্রেস ক্লাব অব ইণ্ডিয়ায় মিলিত হলেন সেন্সেরশিপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য এবং সরকারের কাছে এই দাবি জানাবার জন্য যে তাঁরা যেন এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেন। তাঁরা আরও দাবি জানালেন যে, জলন্ধরের হিন্দ সমাচার পত্রিকার জগৎ নারায়ণ এবং দিল্লির মাদারল্যাণ্ড পত্রিকার কে আর মালকানিকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। জরুরী অবস্থা জারির দিনেই এদের গ্রেপ্তার করা হয়। আমি এই সংক্রান্ত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং তথ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাই।

বিদেশী সাংবাদিকরা অবশ্য যে সংবাদই ছাপুক না সেজন্য তাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব ছিল না। হ্যাঁ, তাদের দেশত্যাগ করার আদেশ দেওয়া যেত। এদেশ থেকে প্রথম বিদেশী সাংবাদিক যিনি বিতাড়িত হন তিনি হলেন ওয়াশিংটন পোস্টের লুইস এম, সাইমনস্। তাঁর অপরাধ তিনি একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। "সঞ্জয় গান্ধী ও তার মা"। সেই লেখায় মন্তব্য করা হয়েছিল, 'ভারতের এই গভীর সঙ্কট কালেও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীদের বিশ্বাস পর্যন্ত করতেন না এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি তাঁর বিতর্কিত পুত্র সঞ্জয়ের সাহায্য চাইতেন···বেশ কয়েক মাস আগে এক ভোজসভায় যেখানে সঞ্জয় এবং শ্রীমতী গান্ধী উভয়ে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে সঞ্জয় তার মায়ের মুখের উপর পর পর ছয়টি চড় কষিয়েছিল! ঐ পরিবারের এক বন্ধু সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে বলেছেন, চড় খাওয়ার পর তিনি কিছুই করতে পারলেন না। বন্ধুটি বলেন, ইন্দিরা নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ান। ছেলে তাঁকে মেরে ফেলতে পারে এই ভয়ে তিনি আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন।'

সঞ্জয়ই তার মা'র সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। দল অথবা সরকার—সঞ্জয়ের কোথাও কোন স্থান ছিল না। তবু কিন্তু সঞ্জয়ই উভয়ের 'বস্'। সারা দেশের সম্পূর্ণ প্রশাসন ব্যবস্থাই ছিল তার হাতে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বসেই সঞ্জয় তার কাজ চালাতো। সেখান থেকেই সে কেবিনেট মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সিভিল সার্ভিসের লোক প্রভৃতি সকলকে অর্ডার দিত এবং তাঁরা সকলে তার অর্ডার মানতেন। অনেক সময় তাঁরা নিজেরা যখন কোন বিষয় নিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে যেতেন তখনই তিনিই অনেক সময় বলতেন, 'সঞ্জয়ের সঙ্গে একটু কথা বলে নেবেন।' এবং সে তখন নিজের বিচার-বুদ্ধিমত তাদের অর্ডার দিয়ে দিত।

সঞ্জয় কী করছে না-করছে সে কথা সে তার মাকে সব সময়ই বলতো এবং কাকে কী নির্দেশ দিল সে কথা জানাতেও ভুল করতো না। জরুরী অবস্থা জারির প্রথম দিকে প্রতি রাতেই সঞ্জয় ও তার সাকরেদরা যেমন বংশীলাল, ওম মেহতা, শুক্লা এবং ধবন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এসে কাজকর্মের হিসাব নিকাশ করতো। ঐ সময় আরেকজন লোকও ঐ গোষ্ঠীতে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি হলেন ইউনুস। (এঁর বাড়ীতেই সঞ্জয়ের বিয়ে হয়েছিল এবং ইন্দিরা পবিবারের সবাই ওঁকে 'বুক্কুচাচা' বলে ডাকতো)। ইউনুস জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর প্রথম প্রথম প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের চারদিকে ঘোরাফেরা করলেও কিছুদিন তাকে ঐ অভ্যন্তরীণ কাউন্সিলের সদস্য করা হয় নি। নেহরু পরিবারের সঙ্গে ইউনুসের সম্বন্ধ বহুদিনের এবং নেহরু একবার তাঁকে রাষ্ট্রদূত পদেও মনোনীত করেছিলেন। তাঁর মতে শ্রীমতী গান্ধীর বিপদের জন্য আসলে হাকসারই দায়ী।

এমার্জেন্সী কাউন্সিলের যে সভা হত তাতে শ্রীমতী গান্ধী যোগদান করতেন। সেখানে গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট, 'র'-য়ের সমীক্ষা, মুখ্যমন্ত্রীদের কাছ থেকে ধবন ফোনে যে সব খবর সংগ্রহ করতো সেগুলি এবং এছাড়া অন্যান্য সদস্যরা যে সব খবর আনতেন তার উপর আলোচনা হত। বিদেশের সংবাদদাতারা যে সব খবর পাঠাতেন তার টাইপ করা কপিও বৈঠকে সবার সামনে রাখা হত।

এখানেই স্থির হত যে কোন্ অর্ডারটা কোন্ মন্ত্রকে কিম্বা কোন্ রাজ্যে যাবে এবং সেখানকার কোন্ অফিসারের কাছে ঐ অর্ডার যাবে। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সেনাপতির যেমন একটি নির্দিষ্ট ঘর থাকতো প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের ঐ ঘরটাও সেই রকম 'অপারেশন রুমের' মর্যাদা পেয়েছিল যেখানে শ্রীমতী গান্ধীর উপস্থিতি সত্ত্বেও সঞ্জয়ই ছিল সব কিছুর মুখ্য পরিচালক।

ধবন এবং ওম মেহতার পারস্পরিক সম্পর্ক মাঝে মাঝেই বেশ খারাপ হয়ে যেত কেননা ইন্দিরাগান্ধী তাঁর ব্যক্তিগত কাজে ওম মেহতা ও তাঁর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপর বেশী নির্ভর করতেন। ধবন মাঝে মাঝে দিল্লির কিষণ চাঁদ এবং দিল্লি পুলিশের ডি আই জি ভিণ্ডারের মাধ্যমে ওম মেহতা ও স্বরাষ্ট্রসচিব খুরানার নাকের ডগা দিয়ে হয়তো কারও পদোন্নতি করিয়ে দিত। এ দুটো গোষ্ঠীই একেবারে আদায় কাঁচকলায় ছিল, বিশেষ করে দিল্লির কাজকর্মের ব্যাপারে। সঞ্জয়ই মাঝে মাঝে ওদের বিরোধ মিটিয়ে দিত এবং ওদের জন্য পৃথক পৃথক কাজ দিয়ে দিত।

নিজের ছেলে ও তার সাকরেদদের প্রতি শ্রীমতী গান্ধীর পূর্ণআস্থা ছিল। তিনি সঞ্জয়ের মধ্যে এমন একজন কর্মঠ মানুষ দেখেছিলেন যে নাকি তাঁকে ভ্রান্ত পথে চলার হাত থেকে রক্ষা করেছিল। নিজের লক্ষ্য এবং সেখানে পৌছনো সম্পর্কে সঞ্জয় সুনিশ্চিত ছিল। শুধু বড় বড় ব্যাপারেই নয়, ছোট ছোট ক্ষেত্রেও সঞ্জয়ের প্রখর নজর ছিল। কোন্ অফিসারকে ট্রান্সফার করতে হবে, কোন্ অনুগত কর্মচারীর পদোন্নতি করতে হবে, আবার কার শাস্তি হবে—এ সবই ছিল সঞ্জয়ের নখদর্পনে। আবার কখনও কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অফিসার নিয়োগ করতে হলে তার জন্য ইণ্টারভিউ পর্যন্ত সঞ্জয়ই নিচ্ছে। তার মার সঙ্গে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন এমন বহুজন সম্পর্কেই সঞ্জয়ের মনে সন্দেহ ছিল। বিশেষ করে কাশ্মীরী, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতীয়দের সম্পর্কে তার মনে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না।

সঞ্জয় উত্তরের বিশেষ করে পাঞ্জাবীদেরই বেশী পছন্দ করতো। সঞ্জয় মনে করতো, এরাই হল সেই শ্রেণী যাদের ব্রত প্রকৃতপক্ষে করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। অথবা অপরকে মারার ব্যবস্থা করবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মায়ের বিশ্বাসভাজন কাশ্মীরীগ্রুপটা বিতাড়িত হয়ে গেল এবং সেখানে এল পাঞ্জাবীগ্রুপ। খুব বেশী দিন আর এটা গ্রুপ হিসাবে রইল না। অচিরেই এরা গুণ্ডা দলে রূপান্তরিত হল।

'অপারেশন এমার্জেন্সীর' অন্যান্য দিকগুলির রূপায়ণের জন্য সঞ্জয় তার পরিকল্পনা অনুযায়ী আস্থাভাজন লোকেদের কাজে লাগায়। অত্যন্ত কর্তব্য পরায়ণতার সঙ্গে রাষ্ট্রপতি যে আদেশগুলির উপর স্বাক্ষর দিচ্ছেন সেগুলি দিয়ে প্রশাসনের সর্বত্র কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণতা প্রবর্তিত হচ্ছিল। ভারতীয় নাগরিক ও বিদেশীদের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য আদালতে যাওয়াও নিষিদ্ধ হয়েছিল। আরেক ধাক্কায় মিসা আইনকে আরও কঠোর করা হয়। যে সব

লোককে ঐ আইনে জেলে আটক রাখা হয়েছে তাদের বা আদালতকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আটক রাখার কারণ জানাতে সরকার বাধ্য থাকবেন না। আদালতে আপীল করার আর কোন ব্যাপারই রইল না।

শ্রীমতী গান্ধী দাবি করলেন যে তিনি যা করেছেন তা সংবিধানের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই করেছেন এবং গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্যই যে তিনি এ সব করছেন তা-ও তিনি বুঝিয়ে দেন। প্রশাসনে স্বেচ্ছাচারিতা যতই আসুক না কেন তার গণতান্ত্রিক ভড়ংটা বজায় রাখা খুব দরকার। জর্জ অরওয়েল যেমন বলেছিলেন, 'এটা এ রকম সর্বজন স্বীকৃত যে যখন কোন দেশকে গণতান্ত্রিক বলা হয়, তার অর্থ সেই দেশের প্রশংসা করা হচ্ছে। সেইজন্য যত রকমের স্বৈরতন্ত্রী শাসকই এ পৃথিবীতে থাকুক না কেন সকলেই নিজেদের শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলে প্রচার করে থাকেন।

প্রেসসেন্সরশিপ জারি করে, মৌলিক অধিকারগুলি বাতিল করে এবং হাজার হাজার লোককে জেলে পুরে শ্রীমতী গান্ধীই একমাত্র বলতে পারেন যে, ভারতে এখনও গণতন্ত্র বজায় আছে। এ তো সেইরকম কথা হল অরওয়েলিয়ণ ভাষায় যাকে যুদ্ধ দপ্তর না বলে বলা হয় শান্তি দপ্তর।

আন্তর্জাতিক প্রেস ইন্সটিট্যুট শ্রীমতী গান্ধীর কাছে দাবি জানায় যে তিনি যেন প্রেস সেন্সরশিপ প্রত্যাহার করে নেন, 'কেননা এর দ্বারা বিশ্ব জনমতের কাছে ভারতের ভাবমূর্তিটাই কেবল নষ্ট হচ্ছে।'

সোস্যালিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল স্থির করে যে ১৫ জুলাই তারা একটি প্রতিনিধিদল জে-পির কাছে পাঠাবেন। ঐ দলে অন্যান্যদের মধ্যে থাকবেন পশ্চিম জার্মানীর ভূতপূর্ব চ্যান্সেলার উইলি ব্রাণ্ট্ এবং আইরিশ ডাক ও তার মন্ত্রী কনর ক্রুইজ ও'ব্রিয়েন। কিন্তু নয়াদিল্লি তাদের অনুমতি দেন নি। তাঁদের বক্তব্য এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং বিদেশ থেকে ঐ ধরনের প্রতিনিধিদলকে আসতে দেওয়া মানে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাদের নাক গলাতে দেওয়া।

পশ্চিমী দেশগুলির সরকারী অভিমত শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ালো যে, ভারত চিরকালের জন্য গণতন্ত্র হারিয়েছে এবং যত দুঃখেরই হোক না কেন ভারতের মানুষকে এই অবস্থাটা মেনে নিতে হবে। এমতাবস্থায় শ্রীমতী গান্ধীকেও বিরক্ত করা উচিত হবে না। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার নিজের দপ্তরে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, নয়াদিল্লির সঙ্গে এখন থেকে যোগাযোগ রক্ষা করা অনেক সহজ হবে।

কিসিঞ্জারের একজন সহকারী বললেন, শ্রীমতী গান্ধীর নীতি হবে 'বাস্তবধর্মী'। এতে কিসিঞ্জার মন্তব্য করলেন, 'আপনি বোঝাতে চাইছেন, ক্রয়যোগ্য' কেউ একজন বললেন, 'স্বেচ্ছাচারী'।

তখনও বোধহয় তিনি নিজেকে ডিক্টেটর ভেবে নেন নি। তখনও তাঁর একার সম্পর্কে কোন কথা বলা হলে তিনি অপমানিত বোধ করতেন। তার চেয়েও বড় কথা ভারতে তখনও বহু লোক ছিল যারা বিশ্বাসই করতো না যে, নেহরুর মেয়ে ডিক্টেটর হতে পারে। তারা এই বিশ্বাসই করতো যে, এক অস্বাভাবিক অবস্থার মোকাবিলার জন্য তিনি কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন। এ হল একটা সাময়িক ব্যাপার।

কিন্তু অন্ততঃ একজন ব্যক্তি এমন ছিলেন যিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, শ্রীমতী গান্ধী কোন্ দিকে এগিয়ে চলেছেন। তিনি জানতেন যে শ্রীমতী গান্ধী মোটেই গণতন্ত্র মেনে চলেন না এবং তিনি সেকথা বলেও ছিলেন। আর সেইজন্যই তিনি এখন জেলে আছেন।

## ২। ঘনীভূত অন্ধকার

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

২২ জুলাই জেপি তাঁর জেল ডায়েরীতে লিখেছেন, 'আমি সব সময়ই জানতাম যে শ্রীমতী গান্ধীর গণতন্ত্রে বিশ্বাস নেই। তিনি বিশ্বাস এবং অনুরাগবশতঃ একজন ডিক্টেটর।'

এর একদিন আগে তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে একটি বিরাট চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতেও তিনি উপরোক্ত মনোভাবই ব্যক্ত করেন। তিনি লেখেন: 'দয়া করে এই দেশের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেবেন না, যার প্রতিষ্ঠায় এদেশের পূর্বপুরুষদের মধ্যে আপনার মহান পিতাও আছেন। আপনি যে পথ অবলম্বন করেছেন সে পথে বিবাদ এবং বিষাদ ছাড়া আর কিছুই নেই। আপনি বংশানুক্রমে মহান ঐতিহ্য, উদার আদর্শ এবং গণতান্ত্রিকতার অধিকারী হয়েছেন। আপনার অবর্তমানে সেখানে এক বেদনাদায়ক ক্ষতচিহ্ন রেখে যাবেন না। কেননা পুনরায় সেগুলিকে স্বস্থানে স্থাপন করতে অনেক সময় লেগে যাবে। আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, ঐ মূল্যবোধগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবেই। যে দেশের মানুষ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং তাদের পরাজিত করেছে, তারা কখনও একনায়কতন্ত্রবাদের অসম্মান ও লজ্জাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মেনে নিতে পারে না। যত কঠোরভাবে দমন করা যাক না কেন মানুষের মন থেকে আদর্শ কখনও চিরতরে বিলুপ্ত হয় না। ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে আপনি ঐ মহান আদর্শগুলিকে অনেক গভীরে কবর দিয়েছেন। কিন্তু কবর থেকে এর আবার অভ্যুত্থান হবে। এমন কি রাশিয়ার মত দেশেও ধীরে ধীরে এর পুনরুজ্জীবন হচ্ছে।

'আপনি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। ঐ কথা কটি শুনলে মনের মধ্যে কী সুন্দর এক প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু আপনি পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপে দেখেছেন যে এর রূপ কী ধরনের কুৎসিত হতে পারে। নগ্ন একনায়কতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যায় দেখা যাবে যে রাশিয়ার দাদাগিরি তারই নামান্তর। দয়া করে, ভারতকে ঐ ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের গর্তে ঠেলে ফেলে দেবেন না।'

গ্রেপ্তারের পর জে-পিকে প্রথম সোনায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তিনি

অসুস্থ হলে তাঁকে দিল্লির অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিটুট অব মেডিকেল সায়েন্সে-এ নিয়ে আসা হয়। সেই সময় অবশ্য এটা বোঝা যায় নি যে তাঁকে দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। বেশীদিন থাকতে হলেও দিল্লিতে তাঁকে রাখা হবে না। কেননা দিল্লি হল গুজবের শহর। একথা কারো কাছে চাপা থাকবে না যে, জেপি অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিটুট অব মেডিকেল সায়েন্সে আছেন এবং তাঁর নামে হাসপাতালের চারপাশে লোকের ভিড় জমে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

তাঁকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে। চণ্ডীগড়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন্সটিটুটে তাঁকে রাখা হবে বলে স্থির হয়। বংশীলাল বাছাই করা পুলিশ দিয়ে ওখানে পাহারার ব্যবস্থা করলেন। ১৯৪২ য়ে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় জেপি যেমন জেল থেকে পালিয়েছিলেন এখন আর তেমন সম্ভব নয়—বাঞ্ছনীয়ও নয়।

শ্রীমতী গান্ধী ভেবেছিলেন, চণ্ডীগড়ে নিয়ে যাবার আগে জে-পিকে একবার দিল্লি ঘুরিয়ে দেখাবেন জেলে যাওয়ার আগে তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য যে শহরের হাজার হাজার মানুষ পাগলের মত ছুটতো—সেই শহর আজ কত শান্ত। আজ এ শহর দেখলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, একমাত্র তিনি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন বলে যে দাবি করা হত তা কত ভুল। তিনি পুলিশকে বললেন, তারা যেন জে-পিকে নিয়ে সারা দিল্লি শহর ঘুরে দেখায়। সরকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে সেদিন যারা জেপির পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তারা যে আজ—আঙ্গুল পর্যন্ত তুলতে চায় না এ দৃশ্যটি যেন পুলিশ জেপির চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় জেপিকে নিয়ে পুলিশ ঘুরে বেড়ায়। সত্যিই এ এক অদ্ভুত শহর যেখানে হৃত বস্তু সম্পর্কে জনসাধারণের মনে কোন চেতনাই নেই।

জে-পিকে যারা দেশের একমাত্র আশা ও ভরসা স্থল বলে বর্ণনা করতো সেই সব মানুষেরা নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা ড্রইংরুমে বসে এখন কী আলোচনা করছে! তিনি ভাবতেন আর অবাক হয়ে যেতেন। দেশের বুকে 'এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার' নামিয়ে আনার জন্য কি তারা জেপিকে দায়ী করেছেন? তিনি আশা করেছিলেন অন্ততঃ কিছু লোক, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায় যারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি না হোক তিনি যে আদর্শে বিশ্বাসী তার প্রতি আস্থাশীল। যত দেরীই হোক না কেন কবর থেকে ভারতের পুনর্জন্ম ঘটবেই।

প্রস্তুতি না করেই আন্দোলনের ডাক দেওয়াতে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে জে-পির উপর দোষারোপ করেছেন। বেশ কয়েকজন জে-পিকে আবার নেহরুর সঙ্গে তুলনা করলো। ১৯৬২ সালের অক্টোবরে নেহরু প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি সামরিক বাহিনীকে বলেছেন যে, তারা যেন ভারতের মাটি থেকে চীনাদের বিতাড়িত করে দেয়। তারা বলে উভয়ক্ষেত্রেই দুর্দশাজনক পরিণতি দেখা গেছে।

জে-পি এবং তাঁর অনুগামীদের অবস্থা যখন একান্ত দুর্দশাগ্রস্ত ঠিক সেই সময় শ্রীমতী গান্ধী তাঁর দেশবাসীর সামনে রঙীন রঙীন স্বপ্ন তুলে ধরতে থাকলেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যে ১৪০টি সুপারিশ এনেছিল শ্রীমতী গান্ধী তার মধ্যে থেকে মাত্র ২০টি ( আসলে ২১টি ) বেছে নিলেন। এই 'দফাগুলি' বেছে নেবার সময় গভীর চিন্তার প্রকাশ দেখা যায় নি। তিনি সেইসব 'দফা-ই' বেছে নিলেন যে গুলি লোকে সহজে বুঝবে এবং সহজে আলোচনা চালাতে পারবে। বহু 'দফা' সত্যিই খুব প্রশংসনীয় ছিল এবং সেগুলি সম্পর্কে কারোরই কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

নীচে বিশ দফা কর্মসূচী দেওয়া হল—

১। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যহ্রাস করা এবং এগুলির উৎপাদন ও বণ্টনে সামঞ্জস্য বিধান করা।

২। সরকারী ব্যয় সংকোচ করা।

৩। কৃষি জমির মালিকানা সংক্রান্ত আইনকে কার্যকর করা, বাড়তি জমি বণ্টনের কাজে দ্রুততা আনা এবং ভূমি সংক্রান্ত নথিপত্র তৈরী করা।

৪। ভূমিহীন ও সমাজের দুর্বল শ্রেণীর জন্য অধিক পরিমাণে বাস্তু জমির ব্যবস্থা করা।

৫। দাস শ্রমিক প্রথা বিলোপ করা।

৬। গ্রামীন ঋণ মকুবের ব্যবস্থা করা এবং শ্রমিক, ক্ষুদ্র কৃষক, কারিগর ও ভূমিহীনদের জন্য ঋণ পরিশোধের একটা সর্বশেষ দিন ধার্য করে দেওয়া।

৭। কৃষি শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম বেতন ধার্য করা।

৮। পঞ্চাশ লক্ষ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা এবং ভূগর্ভের জল ব্যবহার সম্পর্কে জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করা।

৯। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি।

১০। হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নয়ন এবং জনতা বস্ত্রের মান ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

১১। শহরে সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ, বাড়তি জমি গ্রহণ এবং শহরাঞ্চলের জমির 'সামাজিকীকরণ'।

১২। ট্যাক্স ফাঁকি ধরার ও ট্যাক্সের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বিশেষ 'স্কোয়াড' গঠন এবং আর্থিক অপরাধীদের তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা।

১৩। চোরাচালানকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন।

১৪। অর্থ বিনিময়ের ক্ষেত্রকে উদার করা এবং আমদানী লাইসেন্সের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৫। শিল্প সংস্থায় শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার নতুন ব্যবস্থা।

১৬। সড়ক পরিবহনে জাতীয় পারমিট প্রথা—

১৭। বার্ষিক ৮০০০ টাকা পর্যন্ত আয় সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর থেকে কর বাদ।

১৮। হোস্টেলে বসবাসকারী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ।

১৯। বই ও খাতাপত্র নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরবরাহ।

২০। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য নতুন শিক্ষানবিশ গ্রহণ এবং বিশেষ করে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর জন্য ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা করা।

এর মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি দিল্লির খুব কাছে নারোরায় এই একই রকম একটা দৃশ্য খাড়া করেছিলেন। সেখানে তিনি সকল মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর কেবিনেট মন্ত্রীগণ এবং প্রদেশ কংগ্রেস প্রধানদের ডেকেছিলেন। জে-পি প্রবাহকে ঠেকাবার জন্য গরীবের জন্য কিছু 'উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা' গ্রহণেই তাঁর আগ্রহ ছিল।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক কৌশলকে সব সময়েই আর্থিক মোড়কে ঢেকে উপস্থাপন করতেন। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসকে ভেঙে টুকরো টুকরো করার সময়ও তিনি এই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিলেন। ১৯৭১ সালে অন্তবর্তী নির্বাচনের সময়ও ঐ একই পদ্ধতি দেখা যাচ্ছে এবং এই পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি লাভবানও হয়েছেন। লোকে মনে করেছে যে তাঁর সংগ্রাম হল দেশের আর্থিক অবস্থা ভালো করার সংগ্রাম এবং এ সংগ্রাম তাঁর নিজের গদী বাঁচানোর সংগ্রাম নয়। বিশদফা আর্থিক কর্মসূচী ঘোষণার সময়ও তিনি ভেবেছিলেন যে গদী আঁকড়ে থাকার আসল উদ্দেশ্যটাকে তিনি লুকিয়ে

রাখতে পারবেন এবং সাময়িকভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল বলেই মনে হচ্ছিল।

প্রচার মাধ্যমগুলির উপর বিশ দফার অত্যধিক প্রভাব দেখা গেল। সরকারী এবং বেসরকারী আলোচনায় পর্যন্ত বিশদফা স্থান করে নিতে লাগলো। বড বড় হোর্ডিং এবং পোস্টারে ভরে যেতে লাগলো শহর ও গ্রামাঞ্চল। তাতে শ্রীমতা গান্ধীর বড় ছবির পাশে দফাওয়ারী বিশ দফার উল্লেখ। যত বড হোর্ডিং তত বড় তাঁর ছবি এবং তত তিনি খুশী। শেষে একজন বন্ধু তাঁকে যখন বললেন, এতে কিন্তু প্রকারান্তরে তাঁরই ক্ষতি হচ্ছে কেননা ছবিগুলিতে 'আত্মগোপন' করার ভাব সুস্পষ্ট। তখন তিনি হোর্ডিং ও পোস্টার প্রত্যাহার করে নেওয়ার আদেশ দিলেন।

সকলেরই এটা তখন দায়িত্ব হয়ে গিয়েছিল যে তারা বিশ দফা মেনে চলবে অথবা বিশদফা মেনে চলছে এমন একটা ভাব দেখাব। দিল্লি করপোরেশনের সেই সময় সমস্ত দোকানেব মালিক ও ব্যবসায়ীকে বলা হয়েছিল যে মজুত মাল ও মূল্য তালিকা দোকানের সামনে টাঙিয়ে রাখতে। প্রতিটি বস্তুর পাশেই নাম লিখতে হবে। এই ব্যবস্থায় সুবিধা হল কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের কর্মীদের। মূল্য তালিকা টাঙানো এবং না টাঙানোর অজুহাতে ওদের ভাঁড়ারে পয়সা জমা দিতে বাধ্য করা হতে থাকলো।

মূল্য তালিকা টাঙানোর ব্যাপার নিয়েই সঞ্জয় হাকসারের উপর তার পুরনো ঝাল খানিকটা মিটিয়ে নিল। কেননা হাকসার মাঝে মাঝেই সঞ্জয়ের কার্য-কলাপ সম্পর্কে শ্রীমতা গান্ধীর কাছে অভিযোগ করতেন। নয়া দিল্লির কনট প্লেসে পণ্ডিত ব্রাদার্স নামে একটি বিভাগীয় বিপণির মালিক ছিলেন হাকসারের ৮০ বছর বয়স্ক কাকা। তিনি তাঁর মূল্য তালিকায় একটি ছোট বস্তুর নামোল্লেখ না করায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিন দিন তাকে জেলে আটক রাখা হয়। স্থানীয় সি পি আই নেতা অরুণা আসফ আলিকে শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয়। তিনি গিয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে অনুরোধ করেন যে হাকসারের কাকাকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়।

হাকসার হলেন সেই ব্যক্তি যিনি শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধাচিত্ত হন নি। এই ঘটনায় তাই সমস্ত দিল্লি মনঃক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু এ হল সঞ্জয়ের বা তদর্থে সরকারের পদ্ধতি যার মাধ্যমে জনসাধারণকে আতঙ্কিত করে তোলা হত। বহু প্রকারে অসৎ কাজকর্ম করা হয়েছে যাতে ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত এই সময় নিজস্ব এক পদ্ধতি আবিষ্কার

করেন। নিজের ছেলে ও তার সাকরেদরা যেসব কীর্তিকলাপ করে সে বিষয়ে কেউ অভিযোগ করতে এলেই শ্রীমতী গান্ধী ঐ সব ঘটনা সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, যদিও তিনি সমস্ত ঘটনার খুঁটিনাটি পর্যন্ত জানেন।

চিনি ও বস্ত্র শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার জন্য বড়ুয়া যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা আর কার্যকর হয় নি। শ্রীমতী গান্ধী সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে এখুনি কোন শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা বা অন্য কোন ধরনের কঠোর নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করার কোন ইচ্ছাই সরকারের নেই।

শ্রীমতী গান্ধী একথাও বললেন যে, মিসা কেবল মাত্র চোরাচালানীদেব গ্রেপ্তার করার জন্যই ব্যবহার করা হবে। চোরাচালানীদের জাল সারা বিশ্বে ছড়ানো আছে এবং দুবাই হচ্ছে তাদের প্রধান কার্যালয়। ব্যাঙ্ক এবং বীমা কোম্পানীগুলি পর্যন্ত সেখানে অফিস খুলেছে যাতে তারা চোরাচালানেব সঙ্গে যুক্ত ব্যবসার ঝুঁকি নিতে পারে, আবার সেখানে অর্থ বিনিয়োগও করতে পারে। জল, স্থল, ও আকাশ পথে পরিবহনের এক সুন্দর ব্যবস্থা তারা করে রেখেছে। গুজরাট থেকে কেরল পর্যন্ত যে বিরাট উপকূল এলাকা রয়েছে তার বিভিন্ন স্থান চোরাই মালের লেনদেনের জন্য চিহ্নিত করা আছে। মাদ্রাজ চোরাচালানীদের মস্তবড় আড্ডা। সেখান থেকে তারা বাঙ্গালোর আসে টাকা পয়সার লেন-দেন করে সেগুলি খতিয়ে দেখার জন্য। তাদের নিজস্ব গুদাম, রাডার, ওয়্যারলেস এবং নিজস্ব আচার-বিধি আছে। চোরাচালানীদের সঙ্গে কালো টাকার মালিকদের সরাসরি যোগাযোগ আছে।

চোরাচালানীদের বিরুদ্ধে অভিযান সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী নিজেই ১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বরে তাঁর কেবিনেটের অন্যতম মন্ত্রী কে আর গণেশকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও গণেশ তাঁর দপ্তরের কাজ বেশ ভালো-ভাবেই করছিলেন। গণেশের বক্তব্য ছিল: চোরাচালানের শীর্ষে যারা আছে তাদের সঙ্গে রাজনীতি জগতের কারো না কারো ভালো সম্বন্ধ আছে এবং এই ধরনের শীর্ষস্থানীয় চোরাচালানী বেশ কয়েকজন শ্রীমতী গান্ধী ও অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ছবিও তুলে রেখেছেন। তিনি বলেন, 'বাজেট অধিবেশনে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে আলোচনার সময় সমাজতন্ত্রী এম-পি মধু লিমায়ে শীর্ষস্থানীয় চোরাচালানীদের নাম জানতে চান। তখন বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাত্র কয়েকজন সদস্য তখন উপস্থিত। আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি। এমন সময় প্রধানমন্ত্রী আবার হাউসে উপস্থিত হলেন। আমি তখন আমার উত্তর সংক্ষিপ্ত করলাম।'

'কিছুক্ষণ পরে আবার হাউসে প্রশ্নটা উঠলো এবং আবার চোরাচালানীদের নাম বলার জন্য চাপ দেওয়া হতে থাকলো। আমি তখন তিনজনের নাম বলে দিয়েছিলাম—বাখিয়া, ইউসুফ প্যাটেল এবং হাজি মস্তান।'

'পরে আমাকে প্রধানমন্ত্রীর একজন সহকারী আমাকে বলেছিলেন নামগুলো ওভাবে আপনার বলা উচিত হয় নি। বেশ কয়েকদিন পরে চোরাচালান বিরোধী অভিযান যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলছে তখন প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আমি একটি চার লাইনের চিঠি পেলাম। তাতে প্রধানমন্ত্রী একটি অভিযোগ সম্পর্কে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে আমি যে সিগারেট লাইটারটা ব্যবহার করে থাকি সেটা বিদেশে তৈরী। আমেদাবাদের কোন এক ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই অভিযোগ করেছিলেন।

আমেদাবাদের কোন এক ব্যক্তির সামান্য একটা অভিযোগ আমার কাছে এত দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়া রীতিমত অস্বাভাবিক ব্যাপার। এর মানে যে কি তা বুঝতে বাকি রইল না।

'এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর আরেকটা রসালো জবাবের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেছিলেন, সকলেই প্রমাণ করতে চায় সে বিশুদ্ধ এবং সৎ, শুধু আমিই দুর্নীতিগ্রস্ত। পার্টি তাহলে চলবে কী ভাবে?'

তখন প্রধানমন্ত্রীর উপর যে ধরনের চাপই এসে থাকুক না কেন, চোরা-চালানীদের বিরুদ্ধে অভিযান ছিল নির্দয় ও কঠোর। বেশ কিছু কালো টাকার সন্ধান পাওয়া যায়। 'আর্থিক অপরাধের' দায়ে বহু ব্যবসায়ীকে মিসায় গ্রেপ্তার করা হয়। তবে কালো টাকার সকল কারবারীকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। ধরা হয়েছিল কেবল ওপর মহলের কয়েকজনকে। এটাও সকলের একরকম জানা কথা যে এইসব আর্থিক অপরাধীদের জামিন বা প্যারোলে মুক্তি পাইয়ে দেবার জন্য কংগ্রেসীরা কী পরিমাণ টাকা লুটেছে।

বিশদফা কর্মসূচীও শাসক দলের রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতিশ্রুতির যেন আর শেষ নেই—স্বনির্ভরতা, গরীবদের জন্য সচ্ছলতা, ভূমি সংস্কার এমনি আরও কত কি। কথায় তারা প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল, এগুলিকে কাজে রূপায়ণের দায়িত্ব অবশ্য তাদের ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ ভূমি সংস্কারের কথাই বলা যায়। দীর্ঘদিন আগে থেকেই আইনের পুস্তকে এর স্থান হয়েছে বটে, কিন্তু একমাত্র কেরল ছাড়া আর কোথাও এই সংক্রান্ত আইনকে কাজে রূপায়িত করার চেষ্টা পর্যন্ত হয় নি। প্রথমে সি পি আই (এম) এবং পরে সি পি আই কেরলে এই ভূমি-সংস্কারকে

কাজে রূপায়ণের চেষ্টা করেন। ওদিকে দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থিত লোকের সংখ্যা একদশকের ( ১৯৬৪-৭৪ ) মধ্যে আটচল্লিশ শতাংশ থেকে লাফিয়ে ছেসট্টি শতাংশে উঠে গেছে। গ্রামীন কৃষিক্ষেত্রেও ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন দেখা যায় নি—সেই জমিদার ও ভূমিহীন চাষী রয়েছে। ওদিকে যাদের আছে এবং যাদের নেই ( 'হ্যাভস্ ও হ্যাভ-নট্স্' )—তাদের মধ্যে পার্থক্য দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

সুতরাং এই 'নতুন' কর্মসূচীতে নতুন কিছুই ছিল না। একটি রাজ্য বললো, 'আমাদের টাকা দিন। এখানে সবকিছুই করা হবে। শুধু শুধু ফাঁকা কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে কি লাভ আছে।' তামিলনাড়ুর বক্তব্য ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাদের দাবি ছিল যে, তারা বিশটির মধ্যে উনিশটাই কার্যকর করেছিল। অন্যান্য রাজ্যও কমতি যায় না। তারাও ঐ ধরনের দাবি করতে লাগলো। আর যে যাই বলুক না কেন তাই বলে তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার ভিত্তিহীন কথা বলবে কেন? এটা তাদের পক্ষে ধৃষ্টতা এবং অত্যন্ত খারাপ ব্যাপার!

আসল কর্মসূচী তো ঘোড়ার মুখের সামনে গাজরটাকে লটকে দেওয়া। শ্রীমতী গান্ধী সেই গাজর একটা লাঠিতে বেঁধেও দিয়েছিলেন। ৪ জুলাই তারিখে ভারত সরকার ২৬টা রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে দিলেন, এদের মধ্যে চারটির তবু কিছু গুরুত্ব আছে। সেগুলি হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ( আর এস এস )—হিন্দুরাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবনকামী শৃঙ্খলাবদ্ধ সংস্থা, জামাত-এ-ইসলামী মুসলিম ধর্মী সংগঠন, আনন্দমার্গ উগ্রপন্থী হিন্দুদের একটি গোষ্ঠী, এবং নকশালপন্থী ( উগ্র বামপন্থী )। এরা সকলেই এমন কোন কাজে লিপ্ত ছিল যা এ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জন-নিরাপত্তা এবং গণ-শৃঙ্খলা নষ্ট করেছিল। ৬ আগষ্ট তারিখে নিষিদ্ধ দলের তালিকায় আরেকটি নাম যুক্ত হল আর সে দল হল মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নিষিদ্ধ দলগুলির কোন কোনটা আবার সাম্প্রদায়িকতা-বাদী। কিন্তু কয়েক বছর আগে আইন মন্ত্রক সুস্পষ্ট মন্তব্য করে যে, আইনগত দিক থেকে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যাবে না। তখন চিন্তা করা হয়েছিল যে রাজনৈতিক পর্যায়ে বরং সাম্প্রদায়িকতা নামক ব্যাধির মোকাবিলা করা হবে। কিন্তু তার পরেই আবার নীতির পরিবর্তন হয়। জনসাধারণ যখন সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগটা সঠিকভাবে বুঝতে চায় না, তখন 'বিদেশী শক্তির' সঙ্গে যোগাযোগ থাকার বিষয়টি লাগিয়ে দিলেই চলবে।

এতগুলি দলকে একসঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষণা করায় সরকারের পক্ষে বেপরোয়া-ভাবে বহু লোককে গ্রেপ্তার করতে বেশ সুবিধা হয়ে গেল। আর এস এস বা জামাতের সঙ্গে যাদের কোন কিছুই করার ছিল না, বহুদিন এদের সঙ্গে কোন যোগাযোগও ছিল না তারাও আবার ধরা পড়ে গেল।

নয়াদিল্লির সঙ্গে চুক্তি ক্রমে কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠিত নতুন সরকারের প্রধান-ছিলেন শেখ আবদুল্লা এবং তিনি জরুরী অবস্থা জারির মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে হয় ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গ স্বরূপ জম্মুকাশ্মীর রাজ্যে জরুরী অবস্থা বাধ্যতা-মূলকভাবে জারি করতে হবে আর না হয় বলতে হবে যে সংবিধানের অমুক অমুক ধারায় জরুরী অবস্থা জারির কথা বলা আছে।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর এক সাক্ষাৎকারে তিনি আমাকে বলেছিলেন, গণতন্ত্রকে সোজা পথে চালিত করতে গেলে উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হওয়া দরকার। তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি দিল্লির 'একব্যক্তির শাসন' সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বিরোধী পক্ষকেও এই বলে অভিযোগ করেন যে, তারা সবরকম প্রস্তুতি না করেই বড্ড বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন।

শেখ বেআইনী সংস্থাসমূহের অনেককে গ্রেপ্তার করলেও কিছুদিন পর তাদের বেশীর-ভাগ লোককে তিনি প্যারোলে মুক্তি দিয়ে দেন। নিষিদ্ধ সংস্থাগুলি যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতেন সেগুলি বন্ধই থাকে।

'ওয়াদি কাশ্মীর' নামে একটি সান্ধ্য দৈনিকে এমারজেন্সী চলাকালে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেন্সরশিপের কড়াকড়ি এ রাজ্যে তত বেশী ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য সেন্সর বেশ কয়েকবার রাজ্য সেন্সরের 'গাফিলতির' প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শ্রীমতী গান্ধীর কাছের মানুষরা শেখের উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন যাতে তিনি জেপির নিন্দা করেন। শেখ কিন্তু ঐ চাপের মুখে মাথা নোয়ান নি এবং কঠোরভাবে ঐ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। একবার তিনি এ বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্য জনসভায় আলোচনা করেন, কিন্তু দিল্লির সেন্সর অফিস শেখের ঐ বক্তৃতা বাদ দিয়ে দেন।

শ্রীমতী গান্ধী আর এস-এস সদস্যদের আরও বেশী সংখ্যায় ধরতে চাইছিলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আর এস এসের সামান্য কয়েকজনই ধরা পড়েছিলেন। এই সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকারী উদ্দেশ্য খুব অল্পই সাধিত হয়। কেননা আর এস এসের বেশীর ভাগ কর্মীই আত্মগোপন করেছিল। এ সরকারকে একদিন না একদিন উৎখাত করার জনগণের আশা

জাগিয়ে রাখার জন্য তারা প্রতিরোধ আন্দোলন চালাবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তুললো।

আত্মগোপন থাকা অবস্থায় সংগঠিত হতে একটু সময় লাগলো। দেশে তখন দুটো গ্রুপ ছিল। একটার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সমাজতন্ত্রী নেতা জর্জ ফার্নাণ্ডেজ এবং অপরটি পরিচালনা করছিলেন জনসঙ্ঘের নেতা নানাজী দেশমুখ। এই দুটি গ্রুপের মধ্যে সমন্বয় খুব কমই ছিল। অবশ্য কাজও তাদের খুব বেশী ছিল না। নাগরিক প্রতিরোধের জন্য আহ্বান জানিয়ে উভয় গ্রুপই নিজের থেকে প্রচার করতে শুরু করে। ভারত সরকারকে তারা 'ইণ্ডিয়ান ফ্যাসিস্ট রাশিয়ান অ্যাক্সিস' আখ্যা দিয়েছিলেন। আট পৃষ্ঠা সাইক্লোস্টাইল করা কপি প্রচার করা হয়েছিল যার নীচে নির্দেশ ছিল, 'পড়ুন এবং অপরকে পড়ান'। ঐ প্রচারপত্রের মাধ্যমে আবেদন জানানো হয় যে, এখন যেন বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের মত পার্থক্য বিসর্জন দিয়ে 'ভারতে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার' সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে যুক্ত হন। ঐ প্রচারপত্রে বিরোধী দলগুলিকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, 'আদর্শ নিয়ে কচকচি করার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশের আর সময় নেই। আমাদের সামনে একটিই মাত্র লক্ষ্য তা হল ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করা এবং মৌলিক অধিকারগুলিসহ গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ও বহুবিধ রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ঘোষণা করা।' ঐ গোপন প্রচারপত্রে মস্কোর সঙ্গে দিল্লির বন্ধুত্বের তীব্র সমালোচনা করা হয়। 'রাশিয়া হল সেই দেশ যারা সর্বপ্রথম ভারতের ফ্যাসিস্ট অর্ডারকে স্বাগত জানায়। কেননা ভারতকে পঙ্গু করে রাখলে তো রাশিয়ারই সুবিধা। সেই সুবিধা করে দেওয়ার জন্যই শ্রীমতী গান্ধী অমন কঠোর ও নির্দয়ভাবে সব কাজ করে চলেছেন।'

গোপন সংস্থা এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা একটি গুপ্ত রেডিও স্টেশন খুলছে এবং একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে ঐ সম্পর্কিত ট্রান্সমিটারটা একটি 'ইউরোপীয় দেশে' রয়েছে। কিন্তু সেই রেডিও স্টেশন কোন দিনই প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

জর্জ ফার্নাণ্ডেজ এই রকম একটি গোপনপত্রে চারিদিকে 'গুজব ছড়াবার' পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে বন্‌ধ, স্ট্রাইক প্রভৃতির কথা ছাড়াও সরকারী কাজ কর্ম বন্ধ করে দেওয়া ও পুলিশ মিলিটারীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্পর্কিত ছাপা প্রচার করার জন্যও বলা হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন যে তিনি এমন কোন কিছুর অংশীদার হতে পারেন না যেখানে সংবিধান ধ্বংসের কথা আছে।

যেখানে ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরশিপ চাপিয়ে দেবার চক্রান্ত আছে এবং দেশ থেকে আইনের শাসন চিরতরে মুছে ফেলার পরিকল্পনা আছে।'

নানাজী ছোট ছোট গ্রুপ তৈরীর কথা বললেন যারা প্রচারপত্র বিলি করতে পারবে এবং স্লোগান ইত্যাদির মাধ্যমে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে।

সীমিত সংখ্যায় হলেও গুপ্ত কাজকর্ম ও প্রচার পুলিশকে রীতিমত ব্যতিব্যস্ত করে রাখলো। শ্রীমতী গান্ধীর দুশ্চিন্তা ক্রমেই বাড়ছিল। জেপি'র সেক্রেটারী রাধাকৃষ্ণণ এ বিষয়ে সাহায্যের হাত প্রসারিত করলেন। তিনি বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে সকল গোপন কাজকর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করলেন যাতে সারা ভারতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত করা যায়। কিন্তু কোনকিছু করে উঠতে পারার আগেই তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। সবচেয়ে বড় আঘাত এল তখন যখন দক্ষিণ দিল্লি কলোনীর এক বাড়ীতে হঠাৎ হানা দিয়ে পুলিশ নানাজীকে ধরে ফেললো। তারপরেই ঐ কাজের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন, সংগঠন কংগ্রেস নেতা রবীন্দ্র বর্মা যার নাম হল আফতাব বা সূর্য।

ইতিমধ্যে ৬০,০০০ লোক গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন। ধৃতদের মধ্যে জয়পুরের রাজমাতা গায়ত্রী দেবী এবং গোয়ালিয়রের রাজমাতাও ছিলেন। দুজনকেই দিল্লির তিহার জেলে রাখা হয়েছিল। ঐ জেলের ঠিক পরের ওয়ার্ডে আমি ছিলাম। গায়ত্রী দেবীর বিরুদ্ধে বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত অভিযোগ আনা হয়েছিল। (শ্রীমতী গান্ধীর কাছে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি যখন জানান যে রাজনীতিতে তাঁর আর কোন আকর্ষণ নেই এবং তিনি বিশদফা কর্মসূচী সমর্থন করেন—তখন গায়ত্রী দেবীকে প্যারোলে ছেড়ে দেওয়া হয়।) তাঁরা দুজনেই মহিলা ওয়ার্ডে থাকলেও তাঁদের সঙ্গে বেশ্যা ও মহিলা অপরাধী প্রভৃতিদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল। গায়ত্রী দেবী পরে বলেছেন, এরাই 'সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এ যেন এক রকম বাজারে থাকা, যেখানে মেয়েরা অনবরত ঝগড়া করছে।'। তিনি আরও বলেন, 'ফ্রান্স থেকে আমার এক বন্ধু চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন যে উপহার হিসেবে আমি কী পেলে খুশী হব। আমি তাকে লিখেছি যে আমাকে সেই ধরনের খানিকটা মোম পাঠিয়ে দিও যা আমি কানে লাগিয়ে বসে থাকবো।'

অমৃতসরে পাঁচজন গ্রেপ্তারের মাধ্যমে পাঞ্জাবের আকালীরা ৯ জুলাই থেকে তাদের 'মোর্চার' (সত্যাগ্রহের) সূত্রপাত করে। এমারজেন্সী ঘোষণা ও

গণতন্ত্র বাতিল করে দেওয়ার বিরুদ্ধে আকালীরা এই 'মোর্চা' এমারজেন্সীর শেষদিন পর্যন্ত চালান। মোটামুটিভাবে ৪৫,০০০ শিখ এতে গ্রেপ্তার বরণ করেন এবং এদের মধ্যে ছিলেন প্রকাশ সিং বাদল ও গুরুচরণ সিং তোহ্‌রা। শেষোক্ত দু'জনকে মিশায় আটক করা হয়। শ্রীমতী গান্ধী ধরেই নিয়েছিলেন যে পাঞ্জাব সরকারের দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্যই ওখানে এত বড় সত্যাগ্রহ হতে পেরেছে এবং তিনি এজন্য মুখ্যমন্ত্রী জইল সিংয়ের উপর খুব রেগে গিয়েছিলেন।

অন্যান্য সর্বত্র বিস্ময় ও প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়েই লোকে ধীরে ধীরে প্রতিবাদের পথ বেছে নিচ্ছিলেন। মোটামুটিভাবে সংবাদপত্রগুলিও স্বাধীন ভাবে কথা বলার চেষ্টা করছিল। ধীরে ধীরে প্রতিবাদ হচ্ছিল। ফলে ২৬ জুলাই আমাকে গ্রেপ্তার করা হল।

আটজন গান্ধীবাদী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। এদের মধ্যে ভূতপূর্ব রাজ্যপাল এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভীমসেন সাতারও ছিলেন। এরা সকলেই প্রেস সেন্সরশিপ প্রত্যাহারের দাবি জানাল এবং স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে যাতে ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা বাড়ানো যায় তার কথা বলেছিলেন। তাঁরা ৭ আগস্ট থেকে সত্যাগ্রহেরও হুমকি দিয়েছিলেন। তাঁরা সব রকমের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সরকার যে সর্বাত্মক ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছে তার ভালোমন্দ আলোচনার অধিকার চেয়েছিলেন।

কিন্তু এগুলি খুব বিরল উদাহরণ। আসলে প্রতিবাদ কমে যাচ্ছিল। কিছু লোকের মনে হয়তো রাগ ও ক্ষোভ জমা হচ্ছিল, কিন্তু তারা প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা করতে সাহস করতেন না। এদের সন্ত্রস্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

সমাজের পরিচিত ব্যক্তিদের ভূমিকা ছিল এক কথায় হতাশাব্যঞ্জক। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষ যেমন শিক্ষাবিদ্, আইনবিদ্, সিভিল সার্জেন্ট, ডাক্তার, উকিল এবং এই ধরনের বেশীর ভাগ লোকই নীরব থাকা বেশী পছন্দ করলেন। কেউ কেউ তো আবার জরুরী অবস্থাকে সমর্থন পর্যন্ত করলেন, কারণ জরুরী অবস্থা জারির পূর্বে জনজীবনে নাকি নিরাপত্তা ছিল না। হরতাল, ধর্না এবং এবং সত্যাগ্রহ নাকি লেগেই থাকতো। তাঁদের মতে জরুরী অবস্থা জারির পর জনজীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

যুবন এই প্রতিক্রিয়া দেখে খুব বিস্মিত হয়েছিল। শেষ রাতে তাদের গ্রুপের যে মিটিংগুলি হত তার একটিতে সে বলেছিল, 'তাদের আরাম ও

কর্মক্ষেত্রে যতক্ষণ না কোন আঘাত আসে ততক্ষণ সব ঠিক আছে। এমন কি চূড়ান্তভাবে নিন্দনীয় ব্যাপারও তারা মাথা পেতে নেবে।'

আমলাতন্ত্রের তুলনায় শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষও পিছিয়ে রইল না। বিভিন্ন প্রকার বিশেষাধিকার দিয়েই যারা নিজেদের জন্য একটা সমাজ তৈরী করে রাখে। সেই শিল্প ও বাণিজ্যিক সম্প্রদায়ও কঠোর বাস্তবের পথ অবলম্বন করলো।

চারিদিকে এইভাবে যখন ভয়ের রাজত্ব পরিব্যাপ্ত হয়েছে তখন চিন্তা করা হয় যে সংসদের অধিবেশনের এটাই হল উপযুক্ত সময়। ইন্দিরা গান্ধী দেখলেন এতে তাঁর হাত শক্ত হবে। কেননা সংসদ যে জরুরী অবস্থাকে অনুমোদন করবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তা যদি হয় তাহলে ভারতে এবং ভারতের বাইরে এমার্জেন্সীর যৌক্তিকতা স্বীকৃত হবে। তিনি স্থির করলেন, ২১ জুলাই ১৯৭৫ সংসদের অধিবেশন ডাকবেন।

তাহলেও সংসদে খুব বেশী সংখ্যায় অস্বস্তিকর প্রশ্ন উত্থাপিত হোক এটাও তিনি চাইলেন না। সেইজন্য তিনি স্থির করলেন, ঐ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরের জন্য কোন পৃথক সময় থাকবে না। জরুরী অবস্থা জারি করার বহু আগে থেকেই শ্রীমতী গান্ধী তাঁর কেবিনেটের সহযোগীদের বলে আসছিলেন যে, সংসদের অধিবেশনের সময় কমিয়ে দেওয়া হবে এবং কার্য পদ্ধতিকেও এমন-ভাবে সংস্কার করা হবে যাতে মন্ত্রীদের ও সরকারী বিভাগগুলির সময় বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তর তৈরী করতেই যেন শেষ না হয়ে যায়। সরকারী তরফে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলা হয় যে, কেবল মাত্র 'জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজকর্ম' নিয়েই সংসদে আলোচনা হবে। বিরোধী সদস্যদের প্রশ্ন, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব বা ওই ধরনের কোন কিছুরই সুযোগ আর সংসদে থাকবে না।

বিরোধী নেতৃবৃন্দ যদিও বেশীর ভাগ তখন আটক ছিলেন—এই প্রস্তাবের তারা তীব্র সমালোচনা করেন। মার্কসবাদী সদস্য সোমনাথ চ্যাটার্জী বলেন এভাবে সমস্ত বিধিকে একসঙ্গে বাতিল করা যায় না। ডি এম কে সদস্য এরা সেঝিয়ান বলেন, সংসদে কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা হবে তা স্থির করবেন হাউস—কিন্তু সেক্ষেত্রেও কিছু পদ্ধতিগত নীতি তো আছেই। মোহন ধারিয়া বলেন, সংসদকে আরও বেশী কার্যকারী ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে এবং যেসব পদ্ধতি আছে তার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা চলবে না। নির্দল সদস্য রাওসো. পি. সিকুয়েরা বলেন, এটা বুঝে ওঠা খুবই কঠিন যে নির্দল

সদস্যদের বিল কেন নিষিদ্ধ হল কেননা নির্দল সদস্যরা তো কোনদিনই সংসদের জরুরী কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করেন নি। তিনি বলেন, সংসদের এবার কোন আইন প্রণয়ণ হচ্ছে না দেশের পরিস্থিতি আলোচনার জন্যই এবার অধিবেশন বসছে। কেননা জরুরী অবস্থা জারি করার পর দেশের সকল বিরোধী দলের নেতাকে আটক করা হয়েছে। বহু সংখ্যক সংসদ সদস্যকে কেবল আটকই করা হয় নি, তাদের প্রতিনিয়তই এ-জেল, সে জেলে ঘোরানো হচ্ছে। এমনকি সরকার সমর্থক সি পি আই সদস্য ইন্দ্রজিত গুপ্ত পর্যন্ত বলেন, জরুরী অবস্থা যখন আগেই জারি হয়ে গেছে তখন আর এ নিয়ে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রীকে, রঘুরামাইয়া বললেন, প্রশ্নোত্তরের সময় বাতিল করার জন্য যে প্রস্তাব আনা হচ্ছে সেটা সংসদকে অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। এ হল সংসদ নিজের থেকেই নিজের উপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আদেশ আরোপ করা—খানিকটা আত্মনিয়ন্ত্রণের মত।

বিরোধীদের আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও মোশনটি ৩০১-৭৬ ভোটে লোকসভায় এবং ১৪৭-৩২ ভোটে রাজ্যসভায় গৃহীত হয়। এর পরই জরুরী অবস্থা অনুমোদনের জন্য সংসদের উভয় কক্ষেই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

শ্রীমতী গান্ধী জগজীবনরামকেই এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে বলেছিলেন। জগজীবনের মনের মধ্যে যাই থাকুক না কেন তাঁর বক্তৃতায় সে সবের বিন্দুমাত্র প্রকাশও ঘটে নি। তিনি বলেন, ১৯৬৭ সাল থেকে কয়েকটি রাজনৈতিক দল সরকারের সম্মানকে ধূলিলুণ্ঠিত করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে আসছিল এবং সেই সূত্রে সারা দেশে তারা একটি বিদ্রোহের পরিবেশ গড়ে তুলেছিল। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এ ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। ১৯৬৯ সাল দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য বছর যখন শুধু কংগ্রেসই নয় সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল মেটাতে চেয়েছিল। ১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর চারটি বিরোধী দল মিলে একটি যুক্তফ্রন্ট তৈরীর চেষ্টা করে তারপর বিভিন্ন রাজ্যে লুঠপাট ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে থাকে। বিশেষ করে গুজরাট ও বিহারে এ সবের প্রভাব বেশী দেখা যায়। বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্যরা যাতে তাদের রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদন করতে না পারে সেজন্য সংঘর্ষ সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে চেষ্টা হয়। সরকারকে অকেজো করে দিয়ে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করার জন্য আরেকটি যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয় সেটি হল রেল ধর্মঘট। দেশের

এই দুর্ভাগ্যজনক ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির প্রতি নজর রেখেই জরুরী অবস্থা জারি করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

কংগ্রেস সদস্যরা মোটামুটি ভাবে এই একই সুরে কথা বলেন। কিন্তু বিরোধীরা প্রচণ্ড ভাবে সরকারকে আক্রমণ করেন। বেশ কয়েকজন বিরোধী নেতাও বক্তৃতা করেন। সি পি আই (এম) সদস্য এ, কে, গোপালন বলেন :—

"আকস্মিক ভাবে জরুরী অবস্থা ঘোষণা এইজন্য করা হয়নি যে সত্যিই দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে, কিন্তু এইজন্য ঘোষণা করা হয়েছে যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় প্রধানমন্ত্রীর বিপক্ষে গেছে এবং গুজরাট নির্বাচনের রায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গেছে। হঠাৎ এই নতুন এমার্জেন্সী ঘোষণা করে আমার পার্টি গত তিন বছর ধরে যে সম্ভাবনার কথা বলে আসছিল তার সত্যতাই প্রমাণ করা হয়েছে। সি পি আই (এম) বলেছিল যে দেশ এখন স্বৈরতন্ত্র ও এক পার্টির ডিক্টেটরশিপের দিকে এগিয়ে চলেছে। এমার্জেন্সী ঘোষণার ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থলে একটি পার্টির এক নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই পার্টির মধ্যেও সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে একজন নেতার হাতে। পরিস্থিতির এই আকস্মিক পরিবর্তন এবং গণতন্ত্র থেকে এক নায়কতন্ত্রের পট পরিবর্তনের পেছনে উদ্দেশ্য কেবল একটাই, তাহল শাসক দলকে স্থায়ীভাবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা…"

আর এস এস এবং আনন্দমার্গের প্রতি সরকারের মনোভাব যখন যেমন প্রয়োজন তেমন ভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই দুটি সংস্থাকে সরকার অবশ্য আগেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকযুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী দিল্লিতে নাগরিক প্রহরার দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন আর এস এসের হাতে।

এমার্জেন্সী ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তার পুরো চাপটা গিয়ে পড়েছিল সাধারণ মানুষের উপর। যে গণতান্ত্রিক অধিকার তারা ভোগ করতো তা আর ছিল না। এমন কি আইনের চোখে সকলে সমান এমন ব্যবস্থাও আর ছিল না।

কায়েমী স্বার্থবাদী ও গণতন্ত্রের সমর্থকদের মাথার উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নামক শাণিত ছুরিকাটি ঝুলিয়েই রাখা হয়েছিল। গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য ছিল ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেওয়া।

জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে যে আন্দোলন চলছিল তারা প্রধানমন্ত্রীর

চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে রাজী ছিল। কিন্তু গুজরাটের ফলাফল দেখার পর প্রধানমন্ত্রী নিজেই নির্বাচনের ব্যাপারে আর কোন উৎসাহ দেখালেন না। কংগ্রেসের রাজ্য কমিটিগুলির অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীগত সংগ্রাম ক্রমে কেন্দ্রে এসেও আঘাত হানলো। এটা আর কারও অজানা ছিল না এলাহাবাদ হাইকোর্টে ও সুপ্রীম কোর্টে বিচারের পর কংগ্রেস সংসদীয় দলেরই এক বিরাট গোষ্ঠী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বকেই চ্যালেঞ্জ জানায়। গণতন্ত্রকে পদদলিত করার আবশ্যিক পরিণাম হিসাবে ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকারী কংগ্রেস দল ও সরকারের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই আওয়াজ উঠলো।

শাসক কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত মোহন ধারিয়া বলেন :—

জুন মাসের ২৬তম ( ১৯৭৫ ) দিন যেদিন এমার্জেন্সী ঘোষিত হয়েছিল, সেদিন আমার বহু সহযোগী, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেতৃবৃন্দ বর্বরতম উপায়ে কারাগারের অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, সেদিন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও নাগরিক স্বাধীনতা আমলাদের হাতে বিসর্জন দিতে হয়েছিল। ভারতীয় গণতন্ত্র এবং আমাদের দেশের ইতিহাসে সেই দিনটি একটি ঘোর কালিমালিপ্ত দিন হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

প্রথমেই আমি এই দানবীয় কাজের নিন্দা করতে চাই। এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহই নেই যে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর কতিপয় বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তি এই ঘটনার জন্য দায়ী। আমি সম্পূর্ণ কেবিনেটকে এজন্য দায়ী করি না কেন না আমি জানি যে জরুরী অবস্থাজনিত ব্যবস্থাদি গ্রহণের পর কেবিনেটকে এ সম্পর্কে জানানো হয়।...

উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এক সুপরিকল্পিত প্রচার চালানো হয় যে, এটা করতে হয়েছে বিরোধী দলগুলির বাড়াবাড়ির জন্য, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির জন্য এবং সবশেষে উগ্রপন্থীদের জন্য—কারণ এরা সবাই মিলে দেশের আর্থিক প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করতে দিচ্ছিল না। এ কি সত্য? ১৯৭১ সালের এবং ১৯৭২ সালের নির্বাচনী ঘোষণা পত্রে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আর্থিক পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব ছিল।...

বিপুল পরিমাণে জনসমর্থন লাভের আর্থিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার পথে বাধা দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমরাই ভুল করেছি এবং আজ দেশে যে অবস্থা বিরাজ করছে সেটা আমরাই সৃষ্টি করেছি।...

আর্থিক কর্মসূচীর কথা উঠলেই বলা হয়ে থাকে যে এই কর্মসূচী প্রধান-

মন্ত্রীর নিজের। আমি এটা বুঝতে পারি যে শাসক দলের কর্মসূচী হচ্ছে সরকারের কর্মসূচী। কিন্তু তারা এই ব্যক্তিপূজা করতে চায় কেন? দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওএটা একটা পথ। এটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

দেশের আজকের পরিস্থিতি খুব পরিস্কার। কেননা বিরোধী দলগুলি আজ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। সেই পুরোন মহাজোট আর নেই। তাই শাসক দলের সম্ভাবনা হঠাৎ তিরোহিত হয়েছে। গুজরাটের নির্বাচনে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা রক্ষার জন্য অর্থ, ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত ভাবে প্রধানমন্ত্রীর সম্মানের ঝুঁকি নিয়েও শেষ পর্যন্ত সেখানে ক্ষমতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। সভা ও সমাবেশে জোরদার ভাবে এই কথা প্রচার করা হতে থাকলো যে, প্রধানমন্ত্রী পদে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীরই আসীন থাকা একান্ত ভাবে প্রয়োজন, নইলে দেশ রসাতলে চলে যাবে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পর থেকে এই রকম চলছিল। এমন কি সুপ্রীম কোর্টে আপীল মামলার বিচার না হতেই ঘোষণা করা হল 'ইণ্ডিয়া ইজ ইন্দিরা, ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া'—বা ইন্দিরাই ভারত, ভারতই ইন্দিরা।…

এরা সেঝিয়ান (ডি এম-কে) বলেন :—

আমি বিশ্বাসঘাতক নই। এই দেশে আমি বাস করি। গত তেরো-চোদ্দ বছর ধরে আমি আপনাদেরই একজন হিসাবে আছি। এই হাউসের সদস্য হিসাবে আমার সামান্য ক্ষমতা অনুযায়ী আমি এই হাউসকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের কাজকর্ম চালু রাখার জন্যও চেষ্টা করেছি। মাঝে মাঝে আপনাদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি নি বটে তবে এদেশে ও লোকসভায় গণতান্ত্রিক কাজকর্ম যাতে চলে সেজন্য আমরা সাহায্য করেছি। সেই আবহাওয়ার কী হল? আমরা যেন একে অপরের বিরুদ্ধে রেগে গেছি? কী এমন হল যাতে আপনারা আমাদের বিশ্বাসঘাতক বলেছেন এবং সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে আমাদের এক পর্যায়ে ফেলে দিয়েছেন? এখানে দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। যারা এমার্জেন্সীকে সমর্থন করেছে তাদের আর্থিক কর্মসূচী সমর্থনকারীদের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে আর যারা এমার্জেন্সী সমর্থন করেনি—ধরে নেওয়া হয়েছে যে তারা আর্থিক কর্মসূচীরও বিরোধী। আমি বিশদফা কর্মসূচীর সবকটি দফাই সমর্থন করি। আপনারা যদি চান তাহলে ঐ তালিকায় আরও দুয়েকটি দফা যোগও করে দিতে পারি…

যখন ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়, তখন রাজন্যভাতা বিলোপ করা হয় তখন আমরা পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলাম। সে সময় হাউসে আপনাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা

ছিল না। ৫৩২ জনের মধ্যে আপনাদের ছিল মাত্র ২৪০ জন। তবু আমরা আপনাদের সরকার ভেঙে দিই নি। আমরা ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করার কথা কখনও ভাবি নি। এবং আমরা তাঁকে আমাদের অসন্দিগ্ধ সমর্থন জানিয়েছি। কেননা আমরা তাঁর ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের কর্মসূচীকে সমর্থন করতাম, আমরা তাঁর রাজন্যভাতা বিলোপ কর্মসূচীকেও সমর্থন করতাম। সেইজন্য ভালো কর্মসূচী হলেই আমরা তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছি। এতৎ-সত্ত্বেও ১৯৭১ সালে যখন হাউসে 'মিসা' বিল এল আমরা তার বিরোধিতা করি যদিও আপনাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ আঁতাত ছিল··

জে-পি সামরিক বাহিনীকে উস্কানী দিয়েছিলেন, পুলিশকে উত্তেজিত করেছিলেন এবং হতে পারে তিনি যা বলেছেন তাতে দেশের ক্ষতি হতে পারতো। আমি এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে একমত যে এই ধরনের উস্কানীর জন্য চূড়ান্ত শাস্তি হওয়া দরকার। আপনারা তাঁকে আদালতের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কেন বললেন না যে, দেশের বিরুদ্ধে তিনি সাংঘাতিক ধরনের চক্রান্ত করেছেন? পৃথিবীর সামনে তাঁর অপ-কীর্তির কথা তুলে ধরুন, তথ্য প্রমাণ প্রকাশ করুন, এবং সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করুন যে তিনি ঘৃণ্য অপরাধ করেছেন। তিনি যতবড় বিখ্যাত ব্যক্তিই হোন না কেন, তাঁর অতীত যত গৌরবময় হোক না কেন এবং তিনি যত জনপ্রিয় ব্যক্তিই হোন না কেন—তিনি যদি দেশের এবং দেশের মানুষের বিরুদ্ধে কিছু করে থাকেন তাহলে তাঁকে আদালতে হাজির করুন, অপরাধ প্রমাণ করুন এবং আইন-মাফিক তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করুন। যদি কোন সংস্থা এই দেশের মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করে তবে সে দলের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করুন—কঠোরতম ব্যবস্থা—কিন্তু সে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন আইনসম্মত পথে, গণতন্ত্রসম্মত পথে·· ···

স্বাধীনতা অর্জন করা খুব কঠিন। আর একবার প্রাপ্ত স্বাধীনতা যদি খোয়া যায় তবে তা পুনরুদ্ধার করা আরও কঠিন। কিছু কিছু ব্যাপারে স্বৈরতান্ত্রিকতা খুব কাজে লাগে, আবার কখনও কখনও এই পথকে শর্টকাট বলেও মনে হয়। আমার মনে হয় মাঝে মাঝে আমাদের ভেতর কয়েকজন এমন চিন্তাও করে থাকে যে সংসদেরই বা কী প্রয়োজন? যে সিদ্ধান্ত যে কোন একজন ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে সেই সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য ৫০০ জনের এখানে আসার কী দরকার? এ হল হিটলারের মত চিন্তা। মুসোলিনী এইভাবেই সব কিছু মুঠিগত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় কোন সুফল পাওয়া যায় নি। এর দ্বারা কোন কাজও হয়নি কারণ গণতন্ত্রে প্রশাসক ভুল করলে তাকে শোধরাবার

রাস্তা আছে, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে নায়ক ভুল করলে তাকে শোধরাবার আর কোন রাস্তা নেই।

অতএব অপর পক্ষের কাছে আমার আবেদন হল : এরপর হয়তো আমি আবার আবেদন জানাবার অবস্থায় থাকবো না। এই সুযোগও হয়তো আমরা সকলে আর পাব না। হয়তো যে আবহাওয়া এখন চারিদিকে রয়েছে তাতে সে হাওয়াও পরে পাওয়া যাবে না। আগে আমরা এখানে যা বলতাম তা নথিবদ্ধ হত এবং এখানকার বাইরে যারা আছে তারা সেগুলি পড়বার সুযোগ পেত। কিন্তু আজ আমি যা বলব তা কেবল এখানকার বন্ধুদের জন্য। ভালো বা মন্দ যে জন্যই হোক আমরা এই হাউসে আছি। দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালাবার জন্য দেশবাসী আমাদের নির্বাচিত করে এখানে পাঠিয়েছে। আমরা সংখ্যালঘু হতে পারি আর আপনারা হতে পারেন সংখ্যাগুরু। আমি সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারি, কিন্তু উপযুক্ত পদ্ধতিতে যাবার পর, উপযুক্ত আলোচনা হবার পর এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য উপযুক্তরূপে বিবেচনা করার পর ১০০টির মধ্যে নব্বইটিতে আমি ভুল করতে পারি, কিন্তু অন্ততঃ দশটা ক্ষেত্রে এমনও তো হতে পারে যে আমরা যা বললাম তা হয়তো আপনাদের মতেও সেগুলি দেশের কল্যাণ সাধনে সক্ষম।......

গণতন্ত্র সংবিধানিকতা থেকেও বিশেষ কিছু, আইনের চেয়েও গণতন্ত্রে আরও কিছু থাকে তা যদি না হবে তাহলে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে উদার সংবিধান হল ওয়েমার সংবিধান, তার আওতায় থেকেও অমন কাণ্ড হল কি করে ? হিটলার সংবিধানকে পাল্টান নি। সাংবিধানিক পদ্ধতিকেও তিনি ধ্বংস করেন নি। উল্টে ঐ সংবিধানকে ব্যবহার করে সেদেশে একজন ডিকটেটরের জন্ম হয়েছিল। এই কথাটুকু মাত্র বলে আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ঐ একনায়কের সমপর্যায়ে ফেলতে চাই না। ...

সুতরাং আমার আবেদন হল : সেইজন্য সংসদীয় গণতন্ত্রকে কেবলমাত্র একটি পদ্ধতি বা সাংবিধানিক প্রথা বলে যদি ধরে নেন তাহলে এদেশে গণতন্ত্র কখনোই কাজ করবে না। শুধুমাত্র প্রথা থাকলে চলবে না, মনের মধ্যে সেই আদর্শটাও থাকা দরকার। বিরোধীদের সহ্য করা শুধু নয়, তাদের মর্যাদা দেবার মনোবৃত্তিও যেন থাকে। আমাদের দেশে যদি নির্ভয়ে সরকারের সমালোচনা করার ও সংগ্রাম ছাড়াই সরকার বদলে দেবার সুযোগ না থাকে তাহলে (অথচ এটাই হল গণতন্ত্রের মূল কথা) ঐ প্রথাটাই থাকবে—সারবস্তু কিছু থাকবে না। আপনি যদি মনে করে থাকেন

যে আমি হিংসাত্মক কিছু করেছি তাহলে আমাকে আদালতে হাজির করাতে, পারেন এবং আমার জন্য কঠোরতম ব্যবস্থা করতে পারেন…

আমাদের দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। সেজন্য আমরা গর্বিত। আমাদের স্কুল ও কলেজের ছাত্রজীবনে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছি, গান্ধীজীর দিকে থেকেও সংগ্রাম করেছি: সেই বৃটিশ আমলে পুলিশের লাঠির যে আঘাত পেয়েছিলাম সে চিহ্ন আজও আমার শরীরে আছে। মহাত্মা গান্ধীর একটি বাণী যা আমি আমার নোট বুকে লিখে রেখেছিলাম তা আজও মাঝে মাঝেই মনে পড়ে, 'মাত্র কয়েকজনের দ্বারা ক্ষমতা দখল হলেই প্রকৃত স্বরাজ আসবে না। প্রকৃত স্বরাজ আসবে যখন অল্প কিছু লোকের ক্ষমতার অপব্যবহারকে রোধ করার জন্য দেশের সকল মানুষ এগিয়ে আসবে। অন্য কথায় স্বরাজ হল সেই গণশিক্ষা যা সাধারণ মানুষের মনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ করার ভাব জাগ্রত করবে।…'

স্বরাজের জন্য আমরা সকলেই সংগ্রাম করেছি। আমরা সকলে এজন্য কষ্ট স্বীকারও করেছি…কিন্তু মনে করুন সেইদিনের কথা যেদিন মানবইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান জীবন যিনি স্বাধীনতার মূল কথাটিই আমাদের মনে প্রবেশ করিয়েছিলেন তাঁকে এক উগ্রপন্থী যুবকের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। দেশের সবচেয়ে সঙ্কটাবস্থাতেও জওহরলাল নেহরু বাক স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন নি। এমন কি যে লোকটি তীব্র গোঁড়ামী সহকারে বলেছিল যে সেই-মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছে তাকেও সমান সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

অতএব জাতির পিতার নাম, ও স্বরাজের নামে সেই একই আইনের শাসন সকলের জন্য প্রযোজ্য হওয়া উচিত। জাতির পিতা এইজন্যই যুদ্ধ ও কষ্ট স্বীকার করে গিয়েছেন। আমি আবার সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে বলছি যে, আপনারা যদি সঠিক পথে চলে থাকেন তাহলে সেই পথে চলতে থাকুন, থামবেন না। অনেক সময় ভাবি ভগবান আমার বক্তব্য যেন ভুল হয়। এমন কি যদি কোন ভ্রান্ত সন্দেহ থেকে থাকে যেমন আমার ছিল, যদি আশঙ্কা থেকে থাকে যেমন আমার ছিল, যখন আপনার নিজেরই সহযোগী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তখন তাদের গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন যে কেন তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কেন তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং তারা কি এমন অপরাধ করেছে যা চোরাচালানের চেয়েও বেশী সাংঘাতিক। বহু চোরাকারবারী এখনও স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকে

এখনও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে এখনও কোন আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি। কিন্তু বন্ধুগণ আমি আবার আপনাদের স্মরণ করতে বলব, বার বার বলবো মনে রাখবেন, আজ যদি এক ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করা হয়, তাহলে সেদিনের আর বেশী দেরী নেই যখন সকলের স্বাধীনতাই হরণ করা হবে।

আমেদাবাদের পি. জি. মবলঙ্কর বলেন :—

আমার মনোভাব এবং আমার অভিযোগ এই যে এই জরুরী অবস্থা অবাস্তব। নিরাপত্তা কোন প্রকারেই বিঘ্নিত হয়নি। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া সংক্রান্ত পুরো ব্যাপারটাই কাল্পনিক। সুতরাং এ হল সাংবিধানিক ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার। এ হ'ল সাংবিধানিক ক্ষমতার সঙ্গে প্রতারণা। এই জন্যই মহামান্য সংসদের উচিত একে অনুমোদন না করা।···

সংসদের সবপ্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করা। সংসদ সেই উদ্দেশ্য পালনেই তার কাজ করে যায় অথবা কাজ করা উচিত। তবে দেখা উচিত, একাজ করার উদ্দেশ্যে যে প্রশাসন ব্যবস্থা অথবা মন্ত্রিসভা তৈরী করা হচ্ছে, তারা যেন কোন পর্যায়ে কর্তব্য কর্ম করে উঠতে না পারার জন্য অধিকতর যে ক্ষমতা নিজের হাতে নিচ্ছে তার যুক্তি সঙ্গত ভিত্তি ও আইনগত সম্মতি থাকে। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় গতকাল এই প্রস্তাব উত্থাপনের সময় এবং প্রধানমন্ত্রী আজ এই বিষয় মাঝখানেই কিছু বলার সময় একবারের জন্যও একথা উল্লেখ করেন নি যে—কেন সরকার এত বিরাট অস্বাভাবিক ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করলেন। কাজেই আমার বক্তব্য হল সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির উপর যে ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে সেটা সর্তসাপেক্ষ ক্ষমতা এবং সে ক্ষমতা কেবলমাত্র তখনই প্রয়োগ করা যায় যখন ঐ ধারায় উল্লেখিত সর্তগুলি সঠিকভাবে পালিত হয়।···

আমি বিশেষভাবে এই প্রশ্ন করতে চাই : ২৪ জুন বিকাল থেকে ২৫ জুন সন্ধ্যা পর্যন্ত কী এমন ঘটে গেল যার জন্য সরকারকে সাংবিধানিক ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে দেশে জরুরী অবস্থা জারি করতে হল? এটা কি আভ্যন্তরীণ এমার্জেন্সী না কি ব্যক্তির জন্য প্রযুক্ত এমার্জেন্সী? এটা কি দেশের জন্য ঘোষিত এমার্জেন্সী! নাকি এটা পার্টির খাতিরে ঘোষিত এমার্জেন্সী···'আইনের শাসনের' শেষ থেকে শুরু হয় এখান থেকেই। ঐদিন থেকে অতীব চাতুর্যের সঙ্গে এবং নির্বিচারে বার বার সংবিধানের সেই বিষয়গুলি ধ্বংস করা হতে থাকলো যার গুরুত্ব এবং মর্যাদা আমাদের কাছে

অপরিসীম। বিশেষ করে মৌলিক অধিকার সমূহের উপরই যেন নজরটা বেশী পড়লো…

বাস্তবিকই, আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি যে ভারতের প্রথম সাধারণতন্ত্র দিবসের মৃত্যু হয়েছে! সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেইজন্য ২৬ জুন আমাদের উন্নয়নশীল দেশ ও গণতন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে দুঃখের এবং সবচেয়ে কালিমালিপ্ত দিন।

মিঃ চেয়ারম্যান, এবার আপনাকে বলি যে এমার্জেন্সী ঘোষিত হবার পর গত সাতাশ-আঠাশ দিনে শুধু যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হাতে পায়ে বেড়ী পরানো হয়েছে এবং কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে তাই নয়, একে ঝাড়ে-বাশে ধ্বংস করা হয়েছে। দেশব্যাপী গ্রেপ্তারের বিভীষিকা সৃষ্টি করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়েছেন। গ্রেপ্তার হয়েছেন এম-পি, এম-এল-এ এবং সব দলের ও সকল পক্ষের বহু বন্ধু। আরও লক্ষ্য করার মত বিষয় হল দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে ধৃত হয়েছেন বহু বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য পন্থার প্রগতিশীল ব্যক্তিরা। এদের অপরাধ কি? তারা যা দেখেছে সেই সত্যই তারা বলেছে· অতএব আমরা আনন্দিত যে ওদের জেলে পোরা হয়েছে। আমাদের সকলকেও জেলে যেতে দিন।…

আজ স্বাধীন ভারতের সরকার যে রকম বর্বরতম উপায়ে আমাদের সকলের উপর নির্যাতন চালাচ্ছেন বৃটিশরা পর্যন্ত তেমনটি কখনও করেনি। সেইজন্য আমার মনে হয় কারাগারের অন্তরালে যেসব আটক বন্দী ও নেতৃবৃন্দ আছেন তাদের প্রতি ভালো আচরণ করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখা এই হাউসের বিশেষ দায়িত্ব।

এরপর আমি আসছি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও প্রেস সেন্সরশিপের বিষয়ে। এই সেন্সরশিপ চারিত্রগতভাবে বিচিত্র এবং অস্বাভাবিক। এমনকি বৃটিশ রাজত্বে—যখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, একটার পর একটা যুদ্ধ তারা হেরে যাচ্ছে—তবু পরাধীন ভারতের উপর তারা এই ধরণের সেন্সরশিপ চাপিয়ে দেয়নি যা স্বাধীন ভারত আজ চাপিয়েছে।…

মানুষ হিসাবে আমি সমাজতান্ত্রিক আদর্শসহ সামাজিক ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী। আমি কোন দলের সদস্য নই….দ্রুত ফলাফল পাওয়া যায় এমন আর্থিক কর্মসূচী আমি চাই। আমাদের জানতে দিন যে এই কর্মসূচী রূপায়ণে কারা বাধাসৃষ্টি করছে? পরিশেষে আমি জগজীবনরামকেই জিজ্ঞাসা করতে চাই

যে আজ যেখানে এসেছি সেখান থেকে ফেরার কি আর রাস্তা আছে? অথবা আমরা এক দলীয় শাসন এবং তার পরিণতিতে এক ব্যক্তির শাসনাধীন হতে চলেছি? এটা কি নয় স্বৈরতন্ত্রের সূত্রপাত নয়? গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধীরে ধীরে খতম করে এখন কি স্বৈরতান্ত্রিক ইমারত গড়ার জন্য এক একখানা করে ইট গাঁথা হচ্ছে?...

শ্রীনগরের এস. এ. শামিম বলেন:

আপনাদের পক্ষে গণতন্ত্র একটি অসুবিধাজনক পদ্ধতি। জনগণ আপনাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, আপনাদের বিরোধিতা করে, ওদিকে বলা হয় গণতন্ত্রের মৌলিক মর্যাদা নাকি সেখানেই। সংখ্যা গরিষ্ঠের মতোই নাকি সেখানে সব কিছু। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আজ যারা সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়েছেন তাঁরা আর অসুবিধাজনক সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বই রাখতে চান না। বিরোধীদের অনেক নাটকেরই সাক্ষী এই হাউস। কিন্তু এই হাউসের কার্য বিবরণীতে একথাও লিপিবদ্ধ আছে যে এতদসত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠরা যে বিষয়ের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন কেবলমাত্র সেই বিষয়ই হাউসের সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হয়েছে। বিরোধী দলগুলির সমালোচকের ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতেই যে আইন প্রণয়ন, তা হলে আপনাদের এত অসুবিধার কারণ ঘটাচ্ছে কেন? এক অযৌক্তিক যুক্তি দেখানো হয়েছে যে জরুরী অবস্থা জারি করায় কর্মদক্ষতা বেড়েছে, সরকারী কর্মচারীরা ঠিক দশটায় অফিসে আসছে, রেলেও সময়ানুবর্তিতা বেড়েছে প্রভৃতি। এর অর্থ তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে গত সাতাশ বছর ধরে সংসদীয় পদ্ধতিতে আমরা যা করেছি তা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র এবং যেদিন থেকে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে একমাত্র সেদিন থেকেই সাংঘাতিকভাবে অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করেছে। এ যুক্তির কার্যকারণ সম্বন্ধ কি? আপনারা বলেছেন সংসদীয় গণতন্ত্রের এই পথে কোন কাজ হবে না, দেশে অগ্রগতির পথে এটা বাধাস্বরূপ।

আপনারা প্রেস সেন্সরশিপ চাপিয়েছেন। সেই সমস্ত দিক্‌পালরা যাঁরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন তাঁরাই আজ সেন্সরশিপের যৌক্তিকতাকে সমর্থন করে বলেছেন যে, কোন গুজব যদি সর্বত্র ছড়িয়ে যায় তাহলে দেশ রসাতলে যাবে। ইন্দিরা গান্ধী গতকাল তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে তাঁকে বলা হয়েছে যে আর এস এস অফিস থেকে যে সব অস্ত্র পাওয়া গেছে সেগুলি ছিল কাঠের তৈরী। এর পর তিনি বলেন, 'হয় আপনার হাতে অস্ত্র আছে আর না হয় আপনার হাতে অস্ত্র নেই।' সংবাদ-

পত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও একথা খাটে। হয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে আর না হয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে না। এটা তো ঠিক নয় যে একটি মাত্র সংবাদপত্র আছে আর তাতে আপনারা যা ছাপতে বলছেন কেবলমাত্র তাই ছাপা হচ্ছে। কিন্তু গণতন্ত্রের মূল কথা হল দুটো মতই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে। জনসাধারণ তখন নিজেদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে স্থির করে যে কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল। আপনারা জানেন ১৯৭১ সালে সংবাদপত্রে কী লেখা হয়েছিল এবং তৎসত্ত্বেও লোকে আপনাদের ভোট দিয়েছিল, তারা সংবাদপত্রের কথায় বিশ্বাস করে অন্য কোন কিছু করেনি। কাহিনী এবং বাস্তব এই দুয়ে মিলে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এটা কেমন কথা যে বিরোধী পক্ষ থেকে গুজব ছড়ানো হতে পারে এই আশঙ্কামাত্রেই সরকার এমন বিচলিত বোধ করছেন? আজ যদি এই বিল এবং এই সংশোধন ভালো মনে উপস্থাপিত হত তাহলে হয়তো আমি একে সমর্থন করলেও করতে পারতাম। কিন্তু এই বিল অসদুদ্দেশ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। এই দেশের মানুষের বিরুদ্ধে আপনারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বিচারবিভাগ এবং আদালতকে হেনস্থা করার জন্যই আপনারা এই বিল উপস্থাপনা করেছেন। সারা পৃথিবী একথা জানে। আদালতের উপর আপনাদের কোন আস্থা নেই—বিচার বিভাগকেও আপনারা বিশ্বাস করেন না।

মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে আমার মত বিরোধ আছে। এই হাউসেই তার কথা শুনতে আমার ভালো লাগেনি। এখানেই আপনারা হয়তো লক্ষ্য করছেন যে মোরারজী যখন সকল বিরোধীর হয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন তখন আমি বলেছিলাম 'মোরারজী আমার হয়ে কথা বলতে পারেন না'। আমি বলেছি শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সম্পর্কে আমার যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল তা সেদিনই শেষ হয়ে গেছে যেদিন দেখলাম তিনি জনসঙ্ঘের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছেন। তারপর থেকে আমি আর তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। জনসঙ্ঘের অধিবেশনে যোগদান করার পর এবং বিহার বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার পর থেকে আমি আর তাঁকে সমর্থন করিনি। তবে একথা আমাকে বলতেই হবে যে আমি কোন দিনই এটা মেনে নিতে পারবো না যে, তিনি একজন চোরাচালানী। তাহলে তাঁকে কেন গ্রেপ্তার করা হল?

আজ এমার্জেন্সীর নামে আপনারাই কী করলেন? এমার্জেন্সী সম্পর্কে আমি একথা স্বীকার করি যে, একটা ব্যবস্থা অবলম্বনের মত পরিস্থিতি তখন

রেখে ছিল। কিন্তু সেই ব্যবস্থা আপনারা কাদের বিরুদ্ধে অবলম্বন করলেন? সম্পূর্ণ দেশের বিরুদ্ধে আপনারা কঠোর ব্যবস্থা নিলেন। আমার বিরুদ্ধেও আপনারা কঠোর ব্যবস্থা নিলেন। সেই সব মানুষের বিরুদ্ধে আপনারা নিলেন কঠোরতম ব্যবস্থা যারা আপনাদের সঙ্গী ছিল। যারা আইনকে মেনে চলে আপনারা তাদের স্বাধীনতা হরণ করলেন। কেউ একজন এমন কাজ করেছে যা আপনারা পছন্দ করেন না—সেই অজুহাতে অপর একজনের অধিকার কেড়ে নেওয়াকে আর যাই বলুক ন্যায় বিচার বলে না। পার্লামেন্টের সেই সব বড় বড় মাথা কাটা গেছে, যারা হাউসে প্রচুর গণ্ডগোল করতেন। জনসাধারণই তাদের মাথা কেটেছে। আজ আবার আপনারা যদি জনসাধারণের কাছে যেতেন এবং বলতেন যে কিছু লোক এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চলতে দিচ্ছে না। তাহলে দেখতেন জনসাধারণ আবার আপনাদের বেশী সংখ্যায় নির্বাচিত করেছে এবং দেখতেন যে ঐ সব লোককে তারা বাতিল করেছে। কিন্তু তা হল না।

এই সংসদ হয়তো এদেশের সর্ব শেষ সংসদ। এর প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীমতী গান্ধীর সেই বিবৃতিতে যাতে তিনি বলছেন যে, এমার্জেন্সী পূর্ববর্তী স্বাভাবিক অবস্থা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। তিনি সেই স্বাধীনতা কেমন হবে তার উল্লেখ করেছিলেন। যে দেশে স্বাভাবিক অবস্থার রূপ ও স্বাধীনতার রূপ কেমন হবে তা স্থির করেন একজন মাত্র ব্যক্তি সে দেশে স্বৈর-তান্ত্রিকতার লক্ষণগুলি ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শ্রীমতী গান্ধী ডিকটেটর নন। তবে সুনিশ্চিত ভাবে তিনি স্বৈরতান্ত্রিকতার পথে পা বাড়িয়েছেন। স্বৈরতান্ত্রিকতার সব চেয়ে বড় গুণ হল প্রথম প্রথম এর রীতিনীতিগুলি খুবই যত্ন সহকারে স্থির করা হয়। সুন্দর সুন্দর শব্দের জাল রচনা করা হয় এই উদ্দেশ্যে। ধীরে ধীরে মানুষ ঐ সব ঐ শব্দের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পড়তে থাকে। মানুষ তার মধ্যে শান্তি খুঁজে পায় এবং শেষে তারা এমন কথাও বলতে শুরু করে যে এই হল গণতান্ত্রিক নীতি। এটা শুধু এখানেই হয়নি। রাশিয়া জার্মানী প্রভৃতি যে দেশেই এটা হয়েছে সে দেশেই লোকে স্বৈরতন্ত্রটাকে ক্রমে পাল্টে নিয়ে গণতন্ত্র বলে প্রশংসা করেছে। আমি শ্রীমতী গান্ধীকে একটা কথা বলতে চাই। তিনি খুব স্পষ্ট বক্তা। তিনি যা বলতে চান তা বেশ ভালো করে গুছিয়েই তিনি বলে থাকেন। আমার মনে হয় সংসদীয় পদ্ধতির উপর থেকে তাঁর বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। এটা খুবই ভালো হয় যদি তিনি স্পষ্ট ভাবে বলে দেন যা আজ এই দেশে আর ঐ পদ্ধতি চলার কোন সম্ভাবনাই নেই। এর কারণ যাই হোক না কেন আমি সে সবের মধ্যে যেতে চাই না।—

সি পি আই শ্রীমতী গান্ধীকে সমর্থন জানালো। ইন্দ্রজিত গুপ্ত (সি পি আই) বললেন, জরুরী অবস্থা জারি করা খুব ন্যায়সঙ্গত কাজ হয়েছে এবং প্রত্যেকে একে সমর্থন করেছে। যাই হোক সরকার সেই সমস্ত ঘটনা ও তথ্যাবলী জনসাধারণের উপস্থাপন করা উচিত যে জন্য তারা এই জরুরী অবস্থা জারি করতে বাধ্য হলেন। তিনি আরও বলেন যে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গঠিত ফ্রন্ট গত প্রায় দেড় বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতা দখলের যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার সবটাই যে সংবিধান সম্মত তা নয়। এই ঘটনাগুলি ঘটার পেছনে অবশ্য একটি যুক্তিসঙ্গত আন্তর্জাতিক পটভূমিকা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার খেলা খেলছিল।

এই প্রস্তাবটি যিনি উত্থাপন করেন তিনি খুব সঙ্গত ভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, সংবাদ পত্র সমূহের কয়েকটি গোষ্ঠী ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে এক কূট চক্রান্ত রচনায় সক্রিয় অংশ নিয়েছে। একচেটিয়া সংবাদ পত্র মালিকদের খবরের কাগজগুলি দেশে সর্বাধিক প্রচারিত। তাদের যদি আজ স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দেওয়া যায় তাহলে এই কুড়ি পঁচিশ দিনের মধ্যেই তারা সারা দেশে এক হৈ-চৈ সৃষ্টি করে দিত। দক্ষিণপন্থীদের দুর্বল করার উদ্দেশ্যে এবং গণতান্ত্রিক শক্তিকে ক্ষমতাশালী করার উদ্দেশ্যেই সেন্সরশিপ ব্যবস্থা আরোপিত হয়।

লোকসভায় আলোচনার মাঝখানেই শ্রীমতী গান্ধী আবার বলতে ওঠে সারাদেশে গুজব ছড়ানো ও গোপন প্রচার করার জন্য জনসঙ্ঘ ও আর এস এসকে অভিযুক্ত করেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, সরকারের বিরুদ্ধে যে 'মিথ্যা' প্রচার চালানো হচ্ছিল সংবাদ পত্রগুলি তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেনি। এখনও প্রচণ্ড ভাবে এই গোপন প্রচার চলছে যে, 'কাকে গৃহবন্দী করা হয়েছে, কে বন্দী অবস্থায় অনশন করে চলেছে কিম্বা বন্দী অবস্থাতেই কার মৃত্যু ঘটেছে। বিরোধীরা যে হিংসাত্মক কার্যকলাপেই বিশ্বাসী তার উল্লেখ করে শ্রীমতী গান্ধী ১৯৭১ সালে জেপি এই মর্মে যে কথা বলেছিলেন তার উল্লেখ করেন। শ্রীমতী গান্ধী জানান, জেপি সেদিন বলেছিলেন যে, তিনি 'সামরিক স্বৈরতন্ত্রের চিন্তায় মশগুল আছেন', তিনি একথাও বলেছিলেন যে, যেহেতু নির্বাচনের ফলে ঐ বছর দেশের সর্বত্র এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল সেই হেতু তিনি এই ফাঁক পূরণের জন্য সামরিক বাহিনীর 'সেবা' চেয়েছিলেন।

শ্রীমতী গান্ধী আরও বলেন, গুজরাটে ছেলেকে ভয় দেখিয়ে এম এল এ-কে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং একজন কংগ্রেস এম এল এ অসুস্থ

অবস্থায় যখন হাসপাতালে ছিলেন তখন ছাত্ররা গিয়ে তাঁকে জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলার ভয় দেখায়। আনন্দ মার্গের মত দুষ্ট সংস্থাগুলির বেপরোয়া সদস্যরা তখন জনসাধারণকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) সরকার যখন ছিল তখন সন্ধ্যার পর লোকে রাস্তায় বেরোতে পারতো না। তিনি বলে চলেন, 'সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সেই দিনগুলি আর কোন দিনই ফিরে আসবে না।'

'গণতন্ত্রের সর্ত হল সকলের আত্ম-সংযম। সরকারের দায়িত্ব হল তাঁরা বিরোধী দলগুলিকে কাজ করার সুযোগ দেবেন। বাক স্বাধীনতা ও সমবেত হবার স্বাধীনতাও তারা দেবেন। কিন্তু অপরপক্ষে বিরোধীদেরও দায়িত্ব হল এই স্বাধীনতার সুযোগে তাঁরা গণতন্ত্রকেই ধ্বংস করার কাজে উদ্যত হবেন না কিম্বা 'সরকারকেই অকেজো' করে দিতে সচেষ্ট হবেন না। 'সরকারকে অকেজো করে দেওয়া' এই শব্দ ক'টি আমার নয়। নয়াদিল্লি ও অন্যত্র প্রকাশ্য জনসভায় এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।...'

শ্রীমতী গান্ধীর এই সব বক্তব্যের উত্তর দিতে উঠে শ্রীএইচ, এম, প্যাটেল (বি এল ডি) উল্লেখ করেন যে সেন্সর ব্যবস্থার জন্য সংবাদ পত্রের কার্য যখন সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ তখন 'গোপন প্রচার' ও গুজব ছাড়া আর কী-ই বা ছড়াবে।

২২ জুলাই ১৩৬-৩৩ ভোটে রাজ্যসভা জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণাকে অনুমোদন করে। এর পরই সমাজতন্ত্রী নেতা নারায়ণ গণেশ গোরে বিরোধীদের পক্ষ হতে একটি বিবৃতি পাঠ করেন। তাতে ঘোষণা করা হয় যে সংসদীয় নীতি লঙ্ঘনের প্রতিবাদে এবং পার্লামেন্টের আলোচনা সমূহ ছাপার ব্যাপারেও প্রেস সেন্সরশিপ ব্যবস্থা প্রয়োগের প্রতিবাদে বিরোধী সদস্যরা অবশিষ্ট সময় সভা বর্জন করছেন।

পরের দিন লোকসভা থেকেও বিরোধীদের বেশীর ভাগ সদস্যই বেরিয়ে গেলেন। তার আগে অবশ্য ৩৩৬-৫৯ ভোটে জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণাটি অনুমোদিত হয়ে গিয়েছিল। সি পি আই ছাড়া আরও কয়েকটি ছোটখাট দল এই বয়কট সমর্থন করেনি। তারা হল, মুসলিম লীগ, রিপাবলিকান পার্টি, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল এবং আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কড়গম।

সংসদের দুটি কক্ষেই সংবিধান (৩৯তম সংশোধন) বিল গৃহীত হয়ে গেল। এই বিলে বলা হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতি যে কারণে দেশে জরুরী অবস্থা জারি করেছেন আদালতে গিয়ে সেই কারণগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। পনেরোটি

রাজ্যের বিধানসভা গুলিতে ২৮-২৯ জুলাই বিশেষ অধিবেশনে ঐ বিল অনুমোদিত হবার পর রাষ্ট্রপতি ১ আগষ্ট ঐ বিলে স্বাক্ষর করেন।

আইনানুসারে জরুরী অবস্থা জারি সংক্রান্ত ঘোষণার এইরূপ অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর মন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারের দ্বারাই আচ্ছন্ন হয়ে ছিল।

ইন্দিরাজীর বাসভবনের সেই 'এমারজেন্সী পরিষদ' দেশের বিশিষ্ট আইনবিদদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন এবং তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, আইন যেভাবে আছে তাতে এই মামলায় অন্য যে কোন বিচারপতি থাকলে এমন রায় দিতে পারতেন যা সিন্‌হা প্রদত্ত রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রথম লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই রায় যেন শ্রীমতী গান্ধীর ভবিষ্যত জীবনে কোন ছায়া ফেলতে না পারে। শ্রীমতী গান্ধীর উকিলরা এমন কি পালকিওয়ালাও তাঁর ব্রীফ ফেরৎ দেওয়ার আগে বলেছিলেন যে, সুপ্রীম কোর্ট নির্বাচনে দুর্নীতি অবলম্বনের দায় থেকে শ্রীমতী গান্ধীকে নিশ্চয়ই রেহাই দিয়ে দেবেন। আরেকটা বিষয়েও তাঁর মনে কোন উদ্বেগ ছিল না। তাহল প্রধান বিচারপতি এ, এন, রায়কেও শ্রীমতী গান্ধীই কয়েকজনকে ডিঙিয়ে ঐ পদে বসিয়েছিলেন। যে তিনজন বিচারপতিকে ডিঙিয়ে এ এন রায়কে প্রধান বিচারপতি করা হয়েছিল তাদের অন্যতম হেগড়ে তখনই বলেছিলেন যে শ্রীমতী গান্ধী এখন থেকেই আপীল মামলাব জন্য পথ পরিষ্কার করছেন, কেননা এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্বাচনী মামলায় যদি তিনি হেরে যান তাহলে তো তাঁকে আপীল করতে হবে।

তবু তিনি কোন রকমের ঝুঁকি নিতে চাইছিলেন না। এলাহাবাদের রায়কে অকার্যকর করার উদ্দেশ্যে গোখলে একটি বিল তৈরী করে সেটি সিদ্ধার্থ রায় এবং রজনী প্যাটেলকে দেখালেন। বোম্বাইয়ের 'প্রগতিশীল' আখ্যাধারী রজনী প্যাটেল হলেন সেই ব্যক্তি যিনি জীবনে 'রয়্যাল স্যালুট' মার্কা স্কচ্ হুইস্কি ছাড়া অন্য কোন মদ স্পর্শ করেন নি। তাঁরা ছিলেন শ্রীমতী গান্ধীর খুব কাছের মানুষ। শলা পরামর্শের জন্য শ্রীমতী গান্ধীর দরকার পড়লেই তাঁরা উড়ে চলে আসতেন দিল্লিতে। সঞ্জয় অবশ্য এই ত্রয়ীর উপর মোটেই সদয় ছিল না এবং সে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

মাঝে এই 'প্রগতিশীল' গোষ্ঠী একটি এমন আইন প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে সুপ্রীমকোর্ট আপীল মামলায় বিরূপ রায় দিলেও প্রধানমন্ত্রী খুব সহজে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে

পারতেন। কিন্তু সবাই এ প্রস্তাবকে খুব একটা ভালো মনে করেনি। সঞ্জয় নির্বাচনের প্রশ্ন থাকায় ভীষণভাবে ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিল। ইউনুস অবশ্য বলতেন যে, আগামী পাঁচ বছর পর্যন্ত নির্বাচনের কথা মাথায় আনা চলবেই না।

৪ আগস্ট সরকার পক্ষ থেকে লোকসভায় একটি বিল উত্থাপিত হল যার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববর্তী তারিখে প্রদত্ত এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে অকার্যকর করা। নির্বাচনী আইনে যে সব সংশোধনের কথা বলা হয়েছিল তার সংখ্যাও ছিল অনেক।

এক : সিভিল সার্ভেণ্টরা সরকারী কাজকর্ম করার সময়ে নিজেকে কোন রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন না বা কোন রাজনৈতিক নেতাকে নির্বাচনে সাহায্য করতে পারবেন না বলে যে সর্ত ছিল অতঃপর তা বাতিল হবে। এর অর্থ হবে এই যে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন প্রচারের জন্য মঞ্চ তৈরীতে সিভিল সার্ভেণ্টরা যে সাহায্য করেছিলেন কিম্বা লাউড স্পীকার লাগানোর ব্যাপারে যে সরকারী কর্মচারীর সাহায্য নেওয়া হয়েছিল সেই দুটি অপরাধই খারিজ হয়ে যাওয়া।

দুই : যে কোন কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারী কর্মচারীর নিয়োগ, কর্মত্যাগ, কর্ম-খারিজ অথবা অবসর গ্রহণের তারিখ সরকারী গেজেটে যা প্রকাশিত হবে সেটাই চূড়ান্ত। ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে এলাহাবাদের রায়ে যে দ্বিতীয় অভিযোগের কথা ছিল অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভেণ্ট যশপাল কাপুর কর্মত্যাগ সংক্রান্ত চিঠি সরকারের কাছে জমা দেবার আগেই প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচারে নেমে যান সেই অপরাধ খারিজ হয়ে যাবে।

তিন : নির্বাচনী ব্যয় ও অন্যান্য ব্যাপারে মনোনয়নের তারিখটি হল আসল হিসাবের দিন। এটা করার পেছনে বড় কারণ হল আইনমাফিক একজন প্রার্থী ৩৫,০০০ টাকার বেশী নির্বাচনে ব্যয় করতে পারে না। সুতরাং প্রার্থী যেদিন নির্বাচনে দাঁড়াবার কথা ঘোষণা করে সেদিন থেকে খরচের হিসাব ধরলে অনেক সময় নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশী টাকা খরচ হলেও হতে পারে। কিন্তু মনোনয়নের তারিখ থেকে ঐ হিসাব ধরলে ব্যয় সংক্রান্ত বিধি নিষেধের মধ্যে থাকা যায়।

পি টি আই এবং ইউ এন আই সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানই বিলের সম্পূর্ণ বয়ান এবং তার পরিণাম কী হতে পারে সে সব সহ সংবাদ পরিবেশন করে। কিন্তু তার পরেই সেন্সর অফিসারের সম্বিৎ ফেরে। ঐ দুটি 'কপি'-ই প্রত্যাহার

করে নেওয়া হয়। পরে এই সংক্রান্ত যে কপিটি সর্বত্র প্রচারিত হয় সেটি মূল কপির সারাংশ মাত্র এবং ঐ কপিতে শ্রীমতী গান্ধীর নামের কোন উল্লেখ ছিল না।

৫ আগস্ট লোকসভায় একটি সংশোধনসহ বিলটি পাশ হয়ে যায়। এই বিলে বলা হল যে কোন ব্যক্তি যদি নির্বাচনে দুর্নীতি অবলম্বনের অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং তাঁর নির্বাচন বাতিল হয় তাহলে সেই বিষয়টি সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে দেখবেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 'অযোগ্যতা' সঠিক কিনা এবং কতদিন পর্যন্ত তাঁকে এই শাস্তি ভোগ করতে হবে। একদিক থেকে নির্বাচন কমিশনারের চূড়ান্ত দায়িত্ব অতঃপর রাষ্ট্রপতির উপর বর্তালো। এই ব্যাপারের পরে অবশ্য আরেকটু সংশোধন হয়। তাতে বলা হয় এই প্রসঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতিকে যে সুপারিশ করবেন রাষ্ট্রপতি তা মানতে বাধ্য থাকবেন। তাঁর নিজস্ব কোন বক্তব্য সে বিষয়ে থাকবে না।

প্রার্থীর 'অযোগ্যতা' সংক্রান্ত ব্যাপারে যে বিল আনা হয়েছে তার দরকার ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী দরকার হ'ল এমন একটা আইন প্রণয়ন করা যাতে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দিলে সেটা যেন আর নির্বাচন কমিশনের আওতাভুক্ত না থাকে। মনে হয় এই ব্যাপারটা সরকারের মাথায় ছিল না। এমন কি শ্রীমতী গান্ধী ও তার উপদেষ্টাদের মাথাতেও এই বিষয়টা ছিল না। কংগ্রেস দলের একজন অতি সাধারণ সংসদ সদস্য এই বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন, কোন কোন নির্বাচিত পদের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত যাতে আইন আদালত তার মধ্যে নাক গলাতে না পারে।

'গোখলে' বিষয়টাকে লুফে নিলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনি একে প্রস্তাবাকারে দাঁড় করালেন এবং ৭ আগস্ট এটি সংবিধান (৪০তম সংশোধন) বিল হিসাবে উত্থাপিত হল। এ বিলে বলা হল রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং স্পীকার (লোকসভা) পদের নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ব্যাপার আইন আদালতে যাবে না। এটা আর কিছুই নয়, শুধু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যে কোন প্রকারে ইলেকশন পিটিশন যেন তাঁর বিরুদ্ধে না পড়ে। অন্য কয়েকজনের নাম এতে এই জন্য ঢোকানো হয়েছে যাতে কেউ যেন বলতে না পারে যে এই বিলটি কেবলমাত্র ইন্দিরা গান্ধীকে বাঁচানোর জন্যই রচিত হয়েছে। কোন কোন মুখ্যমন্ত্রী তড়িঘড়ি নয়াদিল্লিতে ফোন করেছিলেন যাতে

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীদের নামও ঐ পর্যায়ে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। তাদের বিষয় চিন্তা করার তখন আর সময় ছিল না।

কংগ্রেসের বেশীর ভাগ সদস্যই কল্পনা শক্তিহীন সংকীর্ণচেতা ব্যক্তি এবং এই বিলের প্রতিবাদে তারা কেউ কোন কথা বললো না। এমনকি তাদের বিন্দুমাত্র বিবেকের তাড়না আছে বলেও কারও আচরণে কোন ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। তবে হ্যাঁ সভায় কেউ কেউ ছিলেন বটে যারা এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন। হ্রাসপ্রাপ্ত বিরোধী সদস্যদের পক্ষ নিয়ে সেদিন উঠে দাঁড়ালেন, মোহন ধারিয়া। তিনি ঘোষণা করলেন, 'এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে এড়িয়ে যাবার জন্যই এই বিলটি উত্থাপিত হয়েছে। প্রশ্ন হল এই অশোভন তাড়াহুড়া কেন? এটা কি এই জন্য যে প্রধানমন্ত্রীর মামলার শুনানি হবে ১১ আগস্ট তারিখে?'

এই বিলটি পাশ করার ব্যাপারে সত্যিই অস্বাভাবিক রকমের তাড়াহুড়া করা হয়েছিল। ৭ আগস্ট দুপুর ১১টার সময় বিলটি উত্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন প্রকারের আপত্তিকে অস্বীকার করে বিলটি বিবেচনার জন্য উপযুক্ত সময় না দিয়ে কেবল মাত্র এটি বণ্টন করতে যা সময় লেগেছে সেইটুকু সময় দিয়ে ঠিক ১১.০৮ মিনিটের সময় সরকার পক্ষ থেকে বিলটি বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। তারপর ঠিক ১টা ৫০ মিনিটের সময় বিলটি গৃহীত হয়ে যায়। এর আগে অতি দ্রুত গতিতে প্রতিটি ধারা নিয়ে আলোচনা হয় এবং এই বিলের উপর তিন তিনবার 'রীডিং' দেওয়া হয়। পরের দিন রাজসভায় এক ঘণ্টার মধ্যেই বিলটি পাশ হয়ে যায়। রাজসভায় একজন সদস্যও এই বিলের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না।

যেসব রাজ্যে কংগ্রেসের সংখ্যা গরিষ্ঠতা আছে সেখানে ৮ আগস্টই বিধানসভায় অধিবেশন ডাকা হয় এবং পরের দিন লোকসভায় ঐ বিল অনুমোদিত হয়। রাষ্ট্রপতি ১০ আগস্ট তারিখে গৃহীত ও অনুমোদিত বিলটির উপর তাঁর স্বাক্ষর দেন। এরই একদিন পর অর্থাৎ ১১ আগস্ট সুপ্রীমকোর্টে শ্রীমতী গান্ধীর আপীল মামলার শুনানী।

কিন্তু ৪০ তম সংশোধন বিলটি আইনের (এই বিলটি সরকারীভাবে ৩৯ তম সংশোধন বিল) মর্যাদা পাবার আগেই কিছু কংগ্রেসী এম পি আরও কয়েকটি ফাঁক আটকে দেন। ওদের মনে সন্দেহ ছিল যে বিরোধী দলের কেউ হয়তো আদালতে যেতে পারে এবং ঐ বিলের উপর 'স্টে অর্ডার' চাইতে পারে। ফলে ৯ আগস্ট রাজ্যসভার অধিবেশন ডাকা হল এবং সেখানে সংবিধান (৪১তম সংশোধন) বিলটি গৃহীত হল। ঐ বিলে বলা হল যে, যারা একবারের জন্যও

রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি কিম্বা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা করা চলবে না। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত হয়ে গেলেও আসলে সংবিধানের ৩৬১ ধারায় রাষ্ট্রপতির জন্য এসব কথা আগে থেকেই লেখা আছে। আসলে প্রধানমন্ত্রীর বাঁচবার জন্যই বিলটি গৃহীত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচন সংক্রান্ত মামলাটি যখন সুপ্রীম কোর্ট গ্রহন করলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল তখন ঐ বিলটির আর কোন প্রয়োজন রইল না।

আইন-কানুন সব তৈরী হয়ে যাবার পর, সকলের নজর পড়লো সুপ্রীমকোর্টে শ্রীমতী গান্ধীর আপীল মামলার উপর। প্রথম যে করণীয় কাজটি ছিল তাহল এ নিয়ে 'অযথা ও বিরূপ' প্রচার বন্ধ করা। চীফ প্রেস সেন্সর হ্যারী ডি'পেনা সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা ও অন্যান্যদের কাছে বিশেষ নির্দেশ পাঠালেন যে, আদালতের কার্যবিবরণী বা রায় যাই হোক না কেন সকলে যেন এই সংক্রান্ত খবর আগে থেকে সেন্সর করিয়ে তবেই ছাপেন। এক পাতার একটি সান্ধ্য দৈনিক, 'ইভনিংস্টার' ছাড়া আর সব সংবাদপত্রই সেন্সরের আদেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেন। ঐ সান্ধ্য দৈনিকটিকে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

আদালতের ইতিহাসে কোনদিন যা হয়নি এবার তাই হল—সুপ্রীম কোর্টের কার্য বিবরণী প্রকাশ না করার ব্যাপারে চীফ সেন্সর আদেশ দিলেন এবং প্রধান বিচারপতি এ বিষয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। এমন কি তিনি তো এটাও চাইছিলেন যে যেসব উকিল এই মামলার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁরা মামালার শুনানী শুনতে এসেছিলেন তাদের নাম-ধামগুলিও একটু বিচার বিবেচনা করে দেওয়া হোক। রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে এত জোর প্রতিবাদ হয়েছিল এবং আদালত বয়কট করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি রায়কে কার্যকর করেন নি।

প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচজন বিচারপতির একটি বেনচের সামনে ১১ আগষ্ট ঐ আপীল মামলার শুনানী হয়।

উত্তমী উকিল শান্তিভূষণ যিনি এলাহাবাদে রাজনারাণের মামলা লড়েছিলেন সুপ্রীমকোর্টেও তিনি ঐ পক্ষেরই সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন। অপরদিকে শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন প্রাক্তন আইনমন্ত্রী অশোক সেন। সেন উঠে দাঁড়িয়ে আদালতের কাছে আবেদন জানিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বললেন, সংবিধান ৩৯তম সংশোধন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় প্রত্যাহৃত

হওয়া উচিত। অপরদিকে শান্তিভূষণ আবেদন জানালেন যে, তার আগে খতিয়ে দেখতে হবে যে সংবিধানের আইনটি সংবিধানসম্মত কী না। কোন কোন ব্যক্তিকে আইনের আওতার বাইরে স্থাপন করে ৩৯তম সংশোধন এক-ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির অসমানতা সৃষ্টি করেছেন যা নাকি আইনের শাসন সংক্রান্ত মূল চিন্তাধারার একান্ত বিপরীত। এছাড়া পার্লামেন্ট যে বলেছে হাইকোর্টের বিচার অকার্যকর সেটাও সংসদ প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের যে পদ্ধতি আছে তার বিপরীত। তিনি আরও বলেন, সংসদের সাম্প্রতিক অধিবেশনে যে সব কার্য বিবরণী গৃহীত হয়েছে সে সবও অকার্যকর কারণ বহু সদস্যকেই যে আইনীভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাদের এই অধিবেশনে যোগদান করা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

নীরেন দে যিনি সরকার সমর্থক অ্যাটর্নী জেনারেল হিসাবেই বেশী পরিচিত তিনি বললেন, নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্যার যে বিচার হয় তা একান্তভাবে বিচারবিভাগের আওতাভুক্ত নয়। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল সমস্যা বিচারের ভার শুধু মাত্র আইন পরিষদের। তিনি যুক্তি দেখান যে, কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্য সরকারের মামলায় সুপ্রীমকোর্ট ১৯৭৩ সালে বলেছিলেন সংসদ ইচ্ছা করলে সংবিধান সংশোধন অথবা পরিবর্তন করতে পারে, তবে সংবিধানের 'মূল কাঠামো বা গঠনকে' যেন সেই সূত্রে ধ্বংস বা পরিবর্তন না করা হয়।

প্রধান বিচারপতি রায় বলেন সংবিধানিক সংশোধন সম্পর্কে রুলিং দেবার আগে আদালত শ্রীমতী গান্ধীর আপীল সংক্রান্ত তথ্যাদি ও আপীলের পক্ষে কী কী যুক্তি আছে তা শুনতে চায়।

সুপ্রীমকোর্টে যে সব যুক্তি তথ্য উপস্থাপিত হয় তাতে শ্রীমতী গান্ধীর দুশ্চিন্তার কোন কারণ ছিল না। সাংবিধানিক সংশোধনের দ্বারা যে ফাঁকগুলি তখনও পূরণ করা যায় নি তার উকিলরাই সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।

তাঁর দুশ্চিন্তা দেখা দিল প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটছিল তাতে। ১৪ আগষ্ট শেখ মুজিবর রহমান এবং তাঁর পরিবারের প্রায় সকলকে ধীর মস্তিষ্কে হত্যা করা হয়েছিল। 'র' বা অন্য কোন গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে ঘটনা ঘটার আগে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র আঁচ করাও সম্ভব হয় নি। আবার একবার 'র' শ্রীমতী গান্ধীকে ব্যর্থতার গহ্বরে ঠেলে দিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ দিন থেকে সঞ্জয় এই সংস্থার নাম দিয়েছিল 'রিলেটিভস্ অ্যাসোসিয়েশন।' আসলে ঐ সংস্থায় 'র' অফিসারদের বহু আত্মীয়-স্বজন ঢুকে গিয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধী

'র'-য়ের প্রধান রামজী কাও-কে বাংলাদেশের ব্যাপারে আগে থেকে খবর দিতে না পারার জন্য তাঁর অসন্তোষের কথা জানিয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধীর এই ব্যাপারে এত চিন্তিত হওয়ার কারণ হ'ল বাংলাদেশের ব্যাপারে 'র' যদি এইভাবে ব্যর্থ হয় তাহলে ভারতেও তো এই ব্যর্থতার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

বাস্তবিকই মুজিবের মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে আহত করেছিল। এর একটা অন্য কারণও আছে। তাহল এই দুই নেতা একই সঙ্গে একই পথে স্বৈরতান্ত্রিকতার পথে এগিয়ে চলেছিলেন। সংবিধানের মুণ্ডপাত করে মুজিব যখন সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন তখন জে-পি ১১ ফেব্রুয়ারী তারিখে দিল্লিতে সকল বিরোধী দলের এক সভা আহ্বান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে দূরে ভবিষ্যতে তাদেরও ভারতে যে অভিজ্ঞতা হতে পারে এ বোধ হয় তারই রিহার্সাল। এবং এজন্য তাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। অশোক মেহতা জে-পি'র যুক্তিকে এই বলে নাকচ করে দেন যে, ভারতে ঐ রকম কিছু করা সম্ভব নয়। মোরারজী অবশ্য এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেন না। তিনি বলেন, তেমন হলে গুজরাটে তিনি আন্দোলন শুরু করবেন। চরণ সিং বলেন, 'তিনি যা করতে চান তাঁকে করতে দিন' এই বলে তিনি আরেকটু যোগ করেন, 'দেখুন তিনি কতটা করতে পারেন?' এতে রাজনারায়ণ মন্তব্য করেন 'তিনি কম-পক্ষে আমাদের দুজনকে জেলে পুরে দিতে পারেন।'

জে-পি সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে তাঁরা বোধহয় ব্যাপারটা সম্পর্কে অতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। কিন্তু এই সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের আরেকটু গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। তিনি নাগরিক স্বাধীনতা শেষ হয়ে যেতে দেখেছিলেন এবং বহু দলের অস্তিত্ব তখন অবলুপ্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তাঁদের উচিত বাইরেশীয় জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে এখন থেকেও আন্দোলন করা।

সকলেই চাইছিলেন, 'কিছু একটা' করা হোক। কিন্তু কেউ-ই জানেন না যে কী করতে হবে আবার কেউ জে-পির কথায় তত গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। পরে রোহতক জেলে, যেখানে জরুরী অবস্থাকালে বেশীর ভাগ বিরোধী দলনেতাকেই আটক রাখা হয়েছিল, তাঁরা জে-পির সতর্ক বাণীর কথা স্মরণ করেছিলেন। যেন এক ঋষিতুল্য ভবিষ্যদ্বাণী।

যাই হোক মুজিবের হত্যা থেকে শ্রীমতী গান্ধী যে শিক্ষা নিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। লোকে চুপি চুপি এবিষয়ে কথা বলতে লাগলো এবং ভারত ও বাংলাদেশের ঘটনাবলীর মধ্যে তারা সামঞ্জস্য খুঁজতে লাগলো।

ইঙ্গিতটা খুব স্পষ্ট ছিল তাহল ভারতেও এমনটি ঘটতে পারে। ফলাফল যাই হোক না কেন ইন্দিরার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কঠোর করা হল। সফদরজং রোডের যেখানে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ী সেই অংশটা জরুরী অবস্থা জারির প্রথম থেকেই জনসাধারণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন থেকে আকবর রোডেও যান-বাহন চলাচল নিষিদ্ধ হল।

কেউ কেউ বললেন, ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য তাঁর ওখানে গিয়ে কাজ নেই। যদিও ১৯৪৭ সাল থেকে ঐ বিশেষ দিনটিতে লালকেল্লায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে থাকেন তখন থেকেই এই প্রথা চলে আসছে। তিনি এই প্রস্তাবকে মোটেই আমল দিলেন না। তিনি জনসমক্ষে আসা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। তাই বলে ১৫ আগস্টও লোকের সামনে আসবেন না এমন নয়! কেননা তাহলে এটা প্রমাণিত হবে যে তিনি ভয় পেয়েছেন। আর যাই হোক, 'তিনি ভয় পেয়েছেন' এমন চিন্তা মাথায় আসার মত কোন প্রমাণ তিনি তখনও পর্যন্ত রাখেন নি।

তাঁর বাসভবন থেকে লালকেল্লার দূরত্ব দশ কিলোমিটার। ১৫ আগস্ট সকাল থেকে ঐ রাস্তার আনাচে-কানাচে পর্যন্ত পুলিশ মোতায়েন করা হল। দরিয়াগঞ্জ অঞ্চলে ঐ রাস্তার পাশেপাশে যে সব বাড়ী ছিল এবং সেই সব বাড়ীর যে জানালাগুলি রাস্তার দিকে ছিল সেগুলি যাতে সেদিন খোলাই না হয় সেজন্য পুলিশ আদেশ দিল। আদেশ পালিত হচ্ছে কি না দেখার জন্য এবং ওপর থেকে সব কিছুর ওপর নজর রাখার জন্য রাস্তার দুপাশে বাড়ীর ছাদেও পুলিশ মোতায়েন করা হল। এ যেন ঠিক 'দি ডে অব দি জ্যাকাল' বইয়ের কয়েকটি পাতাকে ছিঁড়ে সেই অনুযায়ী পুলিশী ব্যবস্থা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঐ পাতাগুলিতে ছিল জেনারেল দ্য গলকে হত্যার এক কূট চক্রান্তকে বানচাল করার জন্য পুলিশ কী কী ব্যবস্থা নিয়েছিল তার বর্ণনা। এর মাত্র কয়েকদিন আগে ৮ আগস্ট তারিখে সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন ক্যাপ্টেন একটি টেলিস্কোপিক রাইফেলসহ ধরা পড়েন। তাঁর নাম ধজারাম সাওয়ান। তিনি আমাকে একটা চক্রান্তের কথা বলেছিলেন যা আমি আমার পরবর্তী বই 'দি জেল'-য়ে বর্ণনা করেছি।

শ্রীমতী গান্ধী যখন একটি ঢাকা গাড়ীতে করে লালকেল্লার দিকে যাত্রা করেছিলেন তখনও তিনি এই ঘটনার বিন্দু বিসর্গ পর্যন্ত জানতেন না। তবে তাঁর মাথায় মুজিবের হত্যা প্রসঙ্গটা খুব ছিল। সেই জন্য তাঁর স্বাভাবিক

চালচলনে কোথায় যেন একটা ব্যতিক্রম ছিল। এমারজেন্সী কেন আরোপ করা হয়েছে সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত ভাবে বললেন। তিনি বললেন, তিনি যে খুব আনন্দ চিত্তে এটা করেছেন তা নয়। তিনি অনেকদিন ধৈর্য্য ধরে ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি তাঁকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে বাধ্য করলো। এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, এ থেকে দেশকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বনের দরকার ছিল। তিনি তাঁর পিতা জওহরলাল নেহরুর বিখ্যাত উক্তি পুনরুল্লেখ করলেন।

'স্বাধীনতা বিপন্ন। সর্বশক্তি দিয়ে একে রক্ষা করুন।'

এই কথাগুলি কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধেও যেতে পারে। আন্দোলনের পথ বেছে নেওয়ায় তিনি বিরোধীদের সমালোচনা করেছিলেন। বিহার এবং গুজরাট ধরনের আন্দোলন সারা দেশে এবং দিল্লিতে করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। ছাত্রদের লেখাপড়া ছেড়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলা হয়েছিল। বিভিন্ন দিকে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। বহু গোষ্ঠী যাদের অনেকে গণতন্ত্রে ও অহিংসায় বিশ্বাস করে না তারাও এসে মিলিত হল একযোগে আন্দোলন করবে বলে।

তিনি যেন কোথায় কী অত্যাচার ও নিপীড়ন হয়েছে সে বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল সেই ভাবে তিনি বললেন যে, তিনি সকল মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন আদেশ পালনের নামে কোন প্রকার অবিচার ও অন্যায় আচরণ না করেন। যে সব নাগরিক আইন মেনে চলে থাকে তাদের নিরাপত্তার জন্য যেন সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। পুলিশ এবং অন্যান্য অফিসারদের উচিত জনসাধারণের বন্ধু হিসাবে কাজ করা। যদি কোথাও ভুল হয়ে যায়, তবে তাদের বলে দেওয়া দরকার যে কী ভাবে সঠিক আচরণ করতে হয়। শ্রীমতী গান্ধী বলেন, যাদের আটক করা হয়েছে তাদের ভালোভাবে দেখা শোনা করা হবে।

এই ভালোভাবে 'দেখাশোনা' করার ব্যাপারটা মোটেই ঠিক নয়। জেলে যে পরিবেশে থাকতে হয় সেটা এককথায় আতঙ্কজনক। সরকার একটা ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলেন বলেই মনে হয়। তাহল আটক বন্দীরা যেন দাগী অপরাধীর চেয়ে কোনক্রমে ভালো ব্যবহার না পায়। প্রাথমিক অবস্থায় যখন আটক-বন্দীদের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের আইন কানুন তৈরী হচ্ছিল তখন ওম মেহতা যতদূর পেরেছেন ঐ আইনগুলিকে কঠোর করার ব্যবস্থা করেছেন। একথা তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অফিসারদের এক বৈঠকেও বলেছিলেন।

নমুনা হিসাবে বলি, মাসে একবার মাত্র আধঘণ্টার জন্য দুজন অতি-নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে পুলিশের উপস্থিতিতে দেখা করার অনুমতি ছিল। বন্দীদের প্রতিদিনের ভাতার পরিমাণ ছিল মাত্র আড়াই টাকা। প্রথমদিকে আটক-বন্দীদের রেডিও পর্যন্ত শুনতে দেওয়া হত না। কেউ কেউ আবার সেন্সর করা খবরের কাগজও পড়ার সুযোগ পেত না।

যেহেতু সারা ভারতে প্রায় এক লক্ষ লোককে জেলে পোরা হয়েছিল সেই হেতু স্বাভাবিকভাবেই জেলে সংখ্যাধিক্যের চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। দিল্লির তিহার জেলে থাকার কথা ১২০০ জনের, কিন্তু ছিল ৪০০০-এরও বেশী। এর ফলে অনেক সময় ছোট ছোট সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতে হত। ড্রেনে ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়েছিল এবং জল পাওয়া যেত মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

ভারতীয় হাইকমিশনার বি, কে, নেহরু লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকায় একটি চিঠি লিখে ভারতীয় জেলের অবস্থা কী তা বর্ণনা করেন। তিনি লেখেন 'মায়ের কাছে থাকলে যেমন ভালো খাওয়া, ভালো থাকা, হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার পাওয়া যায় আমাদের দেশের জেলগুলিতে আটকবন্দীদের কল্যাণের জন্য কর্তৃপক্ষ ঠিক সেই রকম ব্যবস্থাদিই করেছেন।' বংশীলাল বলেন, আটক বন্দীদের ওজন বেড়েছে।

জেলের পরিবেশ ছিল খুবই খারাপ, কিন্তু তার চেয়েও খারাপ ছিল জেল-কর্তৃপক্ষের ব্যবহার। এদের ওপর বিশেষ প্রকারের নির্দেশ দেওয়া ছিল যে রাজনৈতিক আটক বন্দীদের সঙ্গে যেন এরা দাগী আসামীর মত ব্যবহার করে। কয়েক জায়গায় তো এদের উপর অত্যাচার করার জন্য রীতিমত চেম্বার ছিল। দিল্লির লালকেল্লায় তো আধুনিকতম ব্যবস্থাসহ যেখানে নিয়ে গিয়ে আটক বন্দীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হত। আটক বন্দীর চোখের ওপর ফ্লাডলাইট জেলে দেওয়া হত এবং পেছন দিক থেকে চালিয়ে দেওয়া হত কোন উগ্রধরণের বাজনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দী ভেঙে পড়তো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গোয়েন্দা অফিসাররা বন্দীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতো আর তার প্রতিটি কথাবার্তা ও চলাফেরা সবকিছু রেকর্ড হয়ে যেত 'অডিও-ভিজুয়াল টেপ সিস্টেমে'।

বেশ কয়েকজন আটকবন্দী জেলেই মারা গেছে। তাদের মধ্যে একজন প্রাক্তন এম-এল-এ এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ভৈরব ভারতী ছিলেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের লোক। সকল রাজনৈতিক দলের ৩৪ জন সদস্য শ্রীমতি গান্ধীকে

লিখেছিলেন, 'আটক বন্দী থাকা অবস্থায় একজন বিশিষ্ট কর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে জেলকর্তৃপক্ষ যে ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ নীতি অবলম্বন করেছেন তার পরিপেক্ষিতে সরকার যেন এই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করেন।'

জেলের দুর্দশা ও আটক বন্দীদের উপর জেল-কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে খবর বিদেশী সংবাদপত্রে ক্রমশ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। অ্যামেনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালেব চেয়ারম্যান আইভান মরিস লেখেন, 'পুলিশ শাসিত চিলি' তাইওয়ান, সোভিয়েট রাশিয়া এবং কোরিয়াব চাইতেও শ্রীমতী গান্ধীর শাসনাধীন ভারতে মানবিক অধিকারের প্রতি কম মর্যাদা দেখানো হচ্ছে।'

জে-পি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য আবেদন জানাবার পদ্ধতিতে একটু নাটকীয়তা আনার জন্য লণ্ডনে মহাত্মা গান্ধীর স্ট্যাচুর নীচে একটি অখণ্ড প্রদীপ জালিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ৩০০০ স্টার্লিং পাউণ্ড খরচ করে লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকায় ছয় কলম ব্যাপী একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যাতে লেখা হয়েছিল, 'আজ ভারতের স্বাধীনতা দিবস। ভারতীয় গণতন্ত্রের এই প্রদীপকে নিভতে দেবেন না।' আনুমানিক ৪০০ এম-পি এবং বুদ্ধিজীবী যাদের মধ্যে সারা ইউরোপের বহু নোবেল পুরস্কার বিজয়ীও ছিলেন তাঁরা সকলে এই সংক্রান্ত আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন। কেবলমাত্র বিখ্যাত বেহালা বাদক ইহুদি মেনুহিন এই আবেদনে স্বাক্ষর দেন নি। কারণ খোদ ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর একটা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল।

বুদ্ধিজীবীদের এই আহ্বানে শ্রীমতী গান্ধী এত বিচলিত হন যে, চলাপতি রাওকে দিয়ে তিনি একটি উত্তর তৈরী করিয়ে সকলের কাছে পাঠিয়ে দেন। চলাপতি রাও তখন নেহরু প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রিকার সম্পাদক। কিন্তু এই চিঠিতে তিনি ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর বেশী জোগাড় করতে পারেন নি। তবে চেষ্টা হয়েছিল এবং যিনি স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছেন বিভিন্ন ভাবে নিগৃহীত হতে হয়েছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার সই করতে অস্বীকার করলে তাঁর দশ বছরের পুরনো বকেয়া আয়করের ফাইল নতুন করে বের করে তাকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা হয়েছে।

যে কেউ অবাধ্য হয়েছে তার বিরুদ্ধেই হয় পুরনো বকেয়া আয়করের ফাইল খুলে নতুন করে টানা হ্যাঁচড়া আরম্ভ হয়েছে, আর না হয় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর অধীনে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের লোকেরা গিয়ে বাড়ীতে

হানা দিয়েছে তাকে উত্যক্ত করার জন্ত। অবাধ্যদের বাধ্য করার এটাই ছিল সরকারী পদ্ধতি।

বোকারো ষ্টীল প্ল্যান্টের একজন প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার মনতোষ সোন্ধীকে সেখানকার বিরাট পোস্ট থেকে নামিয়ে ইস্পাত মন্ত্রকের একটি ছোট পোস্টে স্থানান্তর করা হল। কারণ শ্রীসোন্ধী সংসদের উত্তর তৈরীর খাতিরে তার অধীনে কয়েকজন অফিসারকে মারুতি কারখানা অঞ্চলে কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্ত পাঠিয়ে ছিলেন। কথাটা সঞ্জয়ের কানে যেতেই সে সোন্ধীকে ওপর থেকে টেনে একেবারে নীচে নামিয়ে দিলেন। তৎকালীন ইস্পাত মন্ত্রী পাই যদি পদত্যাগের হুমকি না দিতেন তাহলে হয়তো সোন্ধীর চাকরীই চলে যেত।

অর্থ মন্ত্রককে ভেঙে দু'ভাগ করার পর থেকে যেন বকেয়া আয়করের জের টেনে লোকদের উত্যক্ত করার ঘটনা অত্যধিক বেড়ে যায়। আয়কর, শুল্ক ও ব্যাঙ্কিং এই তিনটিকে নিয়ে একটি পৃথক মন্ত্রক গঠিত হয় এবং তার দায়িত্ব দেওয়া হয় সঞ্জয়ের অন্তরতম গোষ্ঠীর সদস্য প্রণব মুখার্জীকে। যিনি সঞ্জয়ের নির্দেশ পালনে কখনও বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করেন না।

অর্থমন্ত্রককে ভেঙে দুটুকরো করার অভিমানে অর্থমন্ত্রী সি, সুব্রহ্মনিয়ম হৃদরোগাক্রান্ত হলেন। অথচ এই সুব্রহ্মনিয়ামই সেদিন শ্রীমতী গান্ধীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন যেদিন দক্ষিণের দলের নেতা কামরাজ বুড়োদের সংগঠন কংগ্রেসে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। সুব্রহ্মনিয়াম শ্রীমতী গান্ধীকে বলেছিলেন যে, মারুতি প্রকল্পের খসড়া যেভাবে রচিত হয়েছে তাতে ও প্রকল্প কোনদিনই বাস্তবে রূপ নেবে না। শ্রীমতী গান্ধীর উপস্থিতিতেই সুব্রহ্মনিয়াম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সঞ্জয়কে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, তার কারখানার সঙ্গে তিনি যেন অন্যতম গাড়ী উৎপাদক বিড়লাকে যুক্ত করেন। সঞ্জয় সুব্রহ্মনিয়ামের এই সব কথা মোটেই পছন্দ করেনি। বরং সে তার উপর রেগে গেছে। যদিও পরে এই সঞ্জয়ই সুব্রহ্মনিয়ামের পরামর্শ অনুযায়ী বিড়লাকেও কারখানার সঙ্গে যুক্ত করে।

জরুরী অবস্থাজনিত শাসনের বয়স তখন দুই মাসের কিছু বেশী হয়েছিল। এর মধ্যেই শ্রীমতী গান্ধীকে ঘিরে ব্যক্তি পূজার পরিবেশ রচিত হয়েছিল। তাঁর ছবি দেশের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল এবং তাঁর বিশদফা কর্মসূচী মন্ত্রের মত সর্বত্র উচ্চারিত হত। ভারতের সকল বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইন্দিরা স্টাডি সার্কল' শুরু হয়েছিল এবং 'ইন্দিরা ব্রিগেড' নাম দিয়ে জড়ো করা হয়েছিল

স্বেচ্ছাসেবকদের। বিখ্যাত চিত্রকর হোসেন তো ইন্দিরাকে দেবী হিসাবে আঁকলেন এবং সেই দেবীরূপী ইন্দিরার ছবি দেশের সর্বত্র প্রদর্শনী করে দেখানো হতে লাগলো। এমারজেন্সীর শ্রীমতী গান্ধী ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে হিংস্র বাঘের পিঠে বসে যাচ্ছেন বলে ছবিতে দেখানো হল। লক্ষ্য করার বিষয় পুরাণে বর্ণিত কাহিনীর মত এই আধুনিক দেবীকে সিংহের পিঠে বসানো হয়নি।

কংগ্রেসের মুখপত্র 'সোসালিস্ট ইণ্ডিয়ায়' শ্রীমতী গান্ধীর উপর আরও বেশী সংখ্যায় প্রবন্ধ লেখা হতে থাকলো। একটি প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল 'শ্রীমতী গান্ধীর উপর আমাদের আরও বেশী আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে কেন'? সমস্ত পত্রিকাতেই তাঁর প্রশস্তি সূচক প্রবন্ধে ভরা। বিদেশী পত্র পত্রিকাতে শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে যে সব প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিকে পুণঃমুদ্রিত করে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা হয়। কানাডীয় পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লেখা হয়, 'প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিবেকই ভারতের বিবেক।'

শ্রীমতী গান্ধী নিজে হিন্দী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন যার শিরোনামা ছিল 'আমার সাফল্যের রহস্য'। ঐ প্রবন্ধে তিনি নিজেই লিখেছেন, ছোট-বেলায় যখন শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করতেন যে বড় হয়ে তুমি কী হবে তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি জবাব দিতেন, 'আমি জোয়ান অব আর্কের মত হতে চাই'। ইতিহাস নিঃসন্দেহে এই সাক্ষ্য রাখবে যে শেষ পর্যন্ত তিনি কী হয়েছিলেন।

বেশীরভাগ সাময়িকপত্র, বিশেষ করে ছোট ছোট পত্রিকাগুলি সরকারের পদতলে মাথা নুইয়ে দিয়েছিল কারণ সরকারী বিজ্ঞাপনের উপর তাদের নির্ভর-শীলতা ছিল অত্যধিক। অতঃপর সংবাদপত্রগুলি হয়ে গেল সরকারী গেজেট অথবা শ্রীমতী গান্ধীর মোসাহেবে পরিণত হল। কিন্তু যখন 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের' মত কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে লাগলো তখন সরকার বিভিন্নভাবে ঐ পত্রিকার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকলেন। শেষ-পর্যন্ত পত্রিকার মালিক বীর মারোয়াড়ী রামনাথ গোয়েঙ্কাকে এমন ভয় পর্যন্ত দেখানো হল যে তাঁরা যদি কথা না শোনেন তাহলে গোয়েঙ্কা, গোয়েঙ্কার পুত্র এবং পুত্রবধূকে মিসায় গ্রেপ্তার করা হবে এবং তার যতগুলি সংবাদপত্র আছে সবকটিকে নিলাম করে দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত গোয়েঙ্কাকে শান্তি ক্রয় করতে হয়। তিনি তাঁর বোর্ড অব ডিরেক্টরসদের নামের তালিকায় রদবদল করেন এবং তাতে সরকারীপক্ষের মনোনীত ডিরেক্টরদের সংখ্যাই ছিল বেশী। নতুন বোর্ডের চেয়ারম্যান হন সঞ্জয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে, কে, বিড়লা।

'দি স্টেটসম্যানকে' শাস্তিভোগ করতে হল এই জন্ম যে তারা প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রীমতী গান্ধীর ছবি বেশী সংখ্যায় ছাপে নি। এই সংবাদপত্রকে সবকটি পাতায় 'পেজপ্রুফ' অনুমোদনের জন্ম চীফ সেন্সরকে জমা দিতে বলা হয়েছিল। সেন্সর অফিস ইচ্ছে করে 'পেজপ্রুফ'গুলি পরের দিন সকাল আটটায় দিত—যাতে কাগজ আর ছাপা না যায় কিম্বা ছাপা গেলেও যাতে বিক্রী না হয়।

যাইহোক না কেন, সংবাদপত্র খুব বড একটা সমস্যা ছিল না। তার কণ্ঠরোধ ব্যবস্থা খুব নিখুঁত ছিল। সঞ্জয়ের দৃষ্টি এবার দিল্লিতে যেসব অনুমোদিত বাড়ী ছিল তার প্রতি গেল অথবা অন্য কথায় সঞ্জয় দিল্লির সৌন্দর্যবিধানে হাত দিল। রাজধানীর রাস্তায় হকারদের বসা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এমনকি জুম্মা মসজিদের আশেপাশে ছোটখাট ধর্মীয় দোকানগুলি পর্যন্ত ধ্বংস করে দেওয়া হল। কয়েক দশক ধরে যারা ঐ এলাকায় দোকান করে বসেছিলো তাদের বলা হল, সহরের বাইরে গিয়ে দোকান করতে। শহরের বাইরে দোকান করতে পারা হয়তো অসম্ভব নয়—কিন্তু খদ্দের পাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

জুম্মামসজিদের বাইরের ব্যবসায়ীরা তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের এক কর্মী নাম ইন্দরমোহনের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলে তার সাহায্য চাইলো। অতীতে ইন্দরমোহন তাদের কিছু কিছু ব্যাপারে সাহায্য করেছে। তাঁকে বলা যে সঞ্জয়ই আসল ব্যক্তি যে এসব করাচ্ছে। তিনি ইন্দিরা সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু সঞ্জয়ের কাছ থেকে কোন আশাই পেলেন না। সেইদিন সন্ধ্যায় এগারোজন পুলিশ ইন্দরের বাড়ীতে এসে ঢুকলো এবং তাকে প্রচণ্ড মারপীট করে তারা ইন্দরকে ধরে নিয়ে গেল। ইন্দর গ্রেপ্তারের কারণ জানতে চাইলে তাকে বলা হল খুব উঁচু মহলের কাছ থেকে তার গ্রেপ্তারের আদেশ এসেছে। পরে তাঁকে আবার প্রচণ্ড প্রহার করা হল। শেষকালে তিন দিন পরে একজন উকিল গিয়ে ইন্দরের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

সঞ্জয় যা প্রমাণ করতে চাইছিল তাহল তার রাস্তায় কেউ এলে তার আর রক্ষে নেই এবং সেকথা সে বেশ ভালো-ভাবেই প্রমাণ করেছিল। দিল্লিকে সুন্দর করার কাজে সামান্যতম বিরোধের আভাস যেখানে দেখা গেছে সঞ্জয়ের রোষ সেখানেই ভীষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৬ সালের এপ্রিলে যখন তুর্কমান গেট অঞ্চলে ভাঙচুরের কাজ শুরু হয়, তখনই সঞ্জয়ের এই মনোভাবটাও প্রকট হয়ে ওঠে।

রোহতক, কার্নাল, ভিওয়ানি এবং গুরগাঁওয়ের বস্তীগুলিকেও মাটির সঙ্গে

মিশিয়ে দেওয়া হল এবং বস্তীবাসীদের জন্য বিকল্প কোন বাসস্থানের ব্যবস্থা না করেই এইভাবে ধ্বংস করা হল। লখনৌতে প্রায় ১০,০০০ বাড়ী-ঘর-দোর ভেঙে ফেলা হল যার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বেশ কিছু উপাসনাস্থলও ছিল।

সম্ভবতঃ জুম্মামসজিদ এলাকায় ভাঙচুরের জন্যই মসজিদের ইমাম তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনাসভায় বললেন, স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসনকে যেন তারা মেনে না চলে। ১৫ আগস্ট যখন শ্রীমতী গান্ধী লালকেল্লার মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করছিলেন তখন বিপরীত দিকে মসজিদের ওপর লাইডস্পীকার লাগিয়ে ইমামও বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে হঠাৎ শুনলে মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, কারও মধ্যে হয়তো বাক্‌যুদ্ধ হচ্ছে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার আট সপ্তাহ পর এই আগস্টেই সঞ্জয় প্রথম তার জোর দেখাতে শুরু করে। সে মনে করলো, সে-ও যে একটা শক্তি এটা যেন লোকে হিসাব করে দেখে এবং তখন থেকে বহু ব্যাপারেই সঞ্জয় তার ব্যক্তিগত মতামতও ব্যক্ত করতে থাকে।

'সার্জ' নামক নয়াদিল্লির একটি সাময়িকপত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সঞ্জয় বললো যে সে শিল্পগুলির রাষ্ট্রায়ত্ত করা এবং নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির মোটেই সমর্থক নয়। সে কর-ছাঁটাই (পরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে) এবং অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব গঠনে বেসরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকার ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপে বিশ্বাসী। তার দক্ষিণপন্থী মতামত সম্পর্কে সবাই জানতো এবং সে কম্যুনিস্টদের নিন্দা করতো। সে কম্যুনিস্টপার্টির কার্যকলাপ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছিল এবং অকম্যুনিস্ট দলগুলি যেভাবে কাজ করছিল তারও সে সমালোচনা করেছিল। সে বলেছিল, 'আমার মনে হয়, কম্যুনিস্ট দলে যেমন ধনী অথবা দুর্নীতিগ্রস্ত লোক আছে তেমন আর কোথাও দেখা যায় না।'

সি পি আই পন্থী মন্ত্রী চন্দ্রজিৎ যাদব পরের দিনই শ্রীমতী গান্ধীকে বলেন যে সম্পূর্ণ কংগ্রেস পার্টি এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আশ্চর্যের কথা এই যে তিনি নিজে সঞ্জয়কে সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেবার পরামর্শ দেন এবং বলেন যে শ্রীমতী গান্ধীর উচিত দলের মধ্যে তার জন্যও কিছু দায়িত্ব নিশ্চিত করে দেওয়া। ইন্দিরা বলে ছিলেন যে সঞ্জয় রাজনীতি পছন্দ করে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সঞ্জয়ের সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত খবরকে এই বলে সমর্থন করেন যে, "ও হল কর্মী, ও চিন্তাশীল ব্যক্তি নয়।"

সি পি আই কিন্তু গভীর আঘাত পায়। সি পি আই এমন একটা দল যারা সোভিয়েট ব্লকের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার জন্য খানিকটা বেশী এগিয়ে

গিয়েও শ্রীমতী গান্ধীকে সমর্থন করেছে, আর তাঁরই ছেলে কি না শুধু যে নিশ্চিতরূপে দক্ষিণ পন্থী পথ অবলম্বন করেনি—সে কম্যুনিষ্টদেরও আক্রমণ করছে। শ্রীমতীগান্ধীর কাছে সি পি আই প্রতিবাদ করায় তার কিছু পরিণাম দেখা গিয়েছিল। সঞ্জয়ের সাক্ষাৎকারের ঐ পূর্ণ বিবরণ যা সমাচারের মাধ্যমে অন্যত্র পাঠানো হয় সেটা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। একমাত্র ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকাতেই সাক্ষাৎকারের খবর ২৮ আগস্ট প্রকাশিত হয়। সেইজন্ত সঞ্জয় একটি সংশোধনী বিবৃতি প্রচার করে যাতে সে বলে, 'একটি সম্পূর্ণ দল সম্পর্কে আমি এই ধরনের মন্তব্য করতে চাই নি। স্পষ্টতঃই স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ এবং বি এল ডি দলেও প্রচুর ধনী ব্যক্তি আছে। সেসব দলেও অনেক দুর্নীতি আছে। আমি আসলে তখন রেগে গিয়েছিলাম, যখন আমি শুনলাম যে নিজেদের যারা মার্কসবাদী আখ্যা দেয় এবং মনে করে যে তারা অন্যদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, তাদের অনেকেই বেশ ধনী এবং তাদের চলাফেরা সততার জগত থেকে অনেক দূরে।'

সঞ্জয় যে সি পি আইয়ের উপর খুব রেগে গেছে এটা শ্রীমতী গান্ধী বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি মাঝে মাঝে তাকে বোঝাতেও চেষ্টা করতেন, 'ওরা যদি আমাদের সর্তেই আমাদের দিকে থাকতে চায় তাহলে ক্ষতি কি ?'

শ্রীমতী গান্ধীর একমাত্র দুশ্চিন্তা জে-পিকে নিয়ে। কেননা তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করে বর্তমান ভারতের নৈতিক বিবেকের অছি স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। সেইজন্য মহাত্মা গান্ধীর সর্বশেষ জীবিত শিষ্য আচার্য্য বিনোবাভাবের কথা মনে করলেন। ভাবের বয়স ৮১ বছর এবং তিনি জে-পির ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা। ৭ সেপ্টেম্বর শ্রীমতী গান্ধী নাগপুরের কাছে পওনারে গেলেন আচার্য ভাবের সঙ্গে দেখা করতে। ভাবেকে সেখানকার সকলেই বাবা বলে ডাকেন। তিনি জে-পির গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদে বিশেষ দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন এবং বিনা সর্তে তাঁর মুক্তি দাবি করলেন। দীর্ঘ এক বছরের মৌনব্রত ভঙ্গ করে শ্রীমতী গান্ধীকে বলেন, তাঁর শেষ ইচ্ছা হল জে-পি এবং শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যে যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়। এমারজেন্সীকে 'অনুশাসন পর্ব' বলা ছাড়া ভাবে প্রকাশ্যে আর কোন কথা বলেন নি। সরকার ভাবের এই কথাকে স্লোগান হিসাবে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করেছে। এমন কি ডাক টিকিটের ওপর পর্যন্ত 'অনুশাসনপর্ব' কথা ছুটির ছাপ লাগানো হয়েছে।

তিনি সরকারী খেলায় পিছনে যে আসল উদ্দেশ্যটি ছিল তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেইজন্যই পাওনারে তিনি আচার্যদের এক সভা আহ্বান করেছিলেন। তিনি আচার্যদের বলেছিলেন যে তাঁরা যেন তথ্যমূলকভাবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রকৃত ব্যাখ্যা করেন এবং দেশে 'শান্তি ও আনন্দ' আনার জন্য যেন অনুশাসনের পথ বেছে নেন।

এটা সত্যই কৃতিত্বের কথা যে সারা ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিচারপতি, সমাজ-কর্মী এবং লেখকরা সবাই মিলে একসঙ্গে বসে একমত হয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তিন দিনের অধিবেশনের পর এক হাজার শব্দের একটি বিবৃতি প্রচারিত হয়। বিবৃতিটি ছিল খুবই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন এবং এতে একটা মধ্যপন্থী অবলম্বনের পথনির্দেশ দেওয়া ছিল। অতীত ঘটনাবলীর জন্য এতে কাউকে দোষারোপ করা হয়নি। একদিকে এমারজেন্সী জারি হবার পর শিল্প বাণিজ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যে 'গঠনমূলক' ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছে তারজন্য এতে যেমন প্রশংসা ছিল, অপরদিকে তেমনি একথাও বলা হয়েছিল যে যাঁরা 'সর্বধর্মসম-ভাবনা' এবং 'অহিংসায়' বিশ্বাস করেন সেই রকম বহু সংখ্যক সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মীকে অনির্দিষ্টকাল আটক রাখা রাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষে মোটেই ভালো নয়।

আচার্যদের এই বিবৃতিতে শ্রীমতী গান্ধী এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে, আচার্য ভাবের দূত হিসাবে দিল্লিতে আগত শ্রীমান্ নারায়ণকে এক সপ্তাহের মধ্যে একটি দিনের জন্যও শ্রীমতী গান্ধী সাক্ষাৎকারের দিন দিলেন না। আচার্য ভাবে শ্রীমতী গান্ধীর কাজকে সমর্থন করেননি। বরং তিনি আচার্য ও বুদ্ধিজীবীদের বৃহত্তর সভা ডেকে এই কথাই বলেছেন যে, 'আপনারা সবাই মিলে বর্তমান অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে সূত্র সন্ধান করুন।'

কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী আবার অন্যভাবে এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁরা ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর সমাধিভূমিতে সমবেত হয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁরা এমারজেন্সীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছিলেন। এই প্রতিবাদকারীদের মধ্যে ৮৫ বছর বয়স্ক গান্ধীবাদী নেতা জে, বি, কৃপালনীও ছিলেন। তাঁকে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। কেরলের দুর্গম গ্রামাঞ্চলেও মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে পোস্টার পড়েছিল, 'অবিচার ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কাপুরুষতার পরিচয় দেবেন না।'

সেই দিনের একটি ঘটনা সত্যিই ইন্দিরা গান্ধীকে ভীষণভাবে বিচলিত করে

তোলে। নিরাপত্তা বিভাগের লোকজনদের চোখ এড়িয়ে সেদিন একজন লোক একখানা ছোরাসহ রাজঘাটের প্রার্থনা সভায় ঢুকে পড়েছিল এবং ইন্দিরা গান্ধীর পাশে গিয়ে বসেও পড়েছিল। কিন্তু শক্তিশালী ডেপুটি রেলমন্ত্রী কাফীকুরেশী ঠিক সময়মত লোকটাকে ধরে না ফেললে যে কী হত বলা যায় না। শ্রীমতী গান্ধী সঙ্গে সঙ্গে এক উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি এজন্য বসিয়ে দেন। এদিকে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য যে বাহিনী ছিল তার মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২০০০।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে সবচেয়ে বড় যে আঘাতটি আসে তাহল কামরাজের মৃত্যু।

এমারজেন্সী কামরাজকে বিশেষ ভাবে আঘাত করেছিল। কামরাজ প্রায়ই বলতেন শ্রীমতী গান্ধী স্বৈরতান্ত্রিকতার পথে চলেছেন। কিন্তু তিনি সত্যি সত্যিই এমন সন্দেহ পর্যন্ত কখনো করেন নি যে, ইন্দিরা কোনদিন ডিক্টেটর হতে পারেন। তাঁর মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে কামরাজ আমাকে বলেছিলেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংহতি আনার পথে যদি এখনও বিলম্ব ঘটানো হয় তাহলে উত্তর ও দক্ষিণের পথ হয়তো অনেক দূর অন্ত্ হয়ে যাবে এবং ভারতের আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়! এমারজেন্সী এই সমস্যার উপর একটা পর্দা টেনে দিল বটে। কিন্তু এর সমাধান কল্পে কিছুই করলো না। প্রকৃতপক্ষে কামরাজ আগে তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে একথা বলে গিয়েছিলেন যে এই এমারজেন্সীতে আমার কিছুই করবার নেই। আমি যে জে-পি এবং শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যে মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করবো তারও কোন উপায় নেই। কেন না শ্রীমতী গান্ধী কাউকেই বিশ্বাস করেন না।

জেপিকে তিনি একবার বলেছিলেন যে ইন্দিরাকে তিনি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন না। ডি এম-কে এবং এ ডি এমকে উভয়েরই বিরুদ্ধে থাকায় কামরাজের পক্ষে কোন কিছু করতে পারাও কঠিন ছিল। জেপি তাঁর জেল ডায়েরীতে ৩ অক্টোবর লিখেছিলেনন, 'তিনি জানেন যে শ্রীমতী গান্ধীর ন্যায় বিবেকবর্জিত রাজনৈতিক নেতা এ ডি এমকে'র সঙ্গে হাত মেলাতেও দ্বিধাগ্রস্ত হবে না এবং এই সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর মনে আতঙ্ক ছিল। সুতরাং আপাততঃ তাঁর অবস্থা হল আগামী নির্বাচনে তিনি একাই চলবেন।

শ্রীমতী গান্ধী দক্ষিণ ভারতকে ভীষণ ভাবে তাঁর পাশে চাইছিলেন। তিনি জানতেন যে এমারজেন্সী উত্তর ভারতে খুবই অপ্রিয়। কামরাজের মৃত্যুর পরই ইন্দিরা দক্ষিণ ভারতে ছুটলেন একথা প্রমাণ করার জন্য যে কামরাজের সঙ্গে

তাঁর কোন মনোমালিন্য ছিল না। অতীতে যদি কিছু থেকেও থাকে তা বিলুপ্ত হয়েছিল এবং তাঁদের দুজনের সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। একথা ঠিক নয়। কিন্তু ঠিক যে নয় তার প্রমাণ কে দেবে? কামরাজ তো আর বেঁচে নেই যে তিনি বলবেন। তিনি তো একথাও প্রচার করতে লাগলেন যে, তামিলনাড়ুতে সংগঠন কংগ্রেসের সঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসের মিলনে কামরাজের পূর্ণ সমর্থন ছিল। একথা ঠিক যে এমারজেন্সী জারি করার আগে কামরাজ সর্বভারতীয় পর্যায়ে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সংগঠন কংগ্রেসের মিলনের পক্ষে ছিলেন এবং তার সর্ত ছিল সংগঠন কংগ্রেসের সকল পদাধিকারীকে মূল কংগ্রেসেও পদাধিকারী করতে হবে।

কামরাজের শেষ কৃত্যের সময় দিল্লি মাদ্রাজে উড়ে যাওয়ায় তামিলনাড়ুর মানুষ শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে সত্যিই নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করেছিল এবং তারা কামরাজের কংগ্রেসে যোগদান সম্পর্কিত কাহিনীকেও সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। তাদের মনে হয়েছিল, ইস কামরাজ যদি আর কিছুদিন বেঁচে থাকতেন তাহলে এই মিলন সকলে দেখতে পেত।

মহাত্মাজীর জন্মদিনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ঐ দিন দেশের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিরোধী দলের নেতাগণের এমারজেন্সীর প্রতিবাদে একদিনের অনশন। সারা দেশের রাজনৈতিক আটক বন্দীরাও এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন।

দিল্লির তিহার জেলে সেদিন রাতে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে জেল-সুপার তিনশো অফিসার ও কয়েদীসহ এসে হাজির হয়েছিলেন যাতে ঐ ওয়ার্ডের রাজনৈতিক আটক বন্দীদের আতঙ্কগ্রস্ত করা যায়। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ভেবেছিলেন, মহাত্মাগান্ধীর জন্মদিনেই এদের দাবিদাওয়ার উপযুক্ত 'জবাব' দেওয়া যাবে। এদের দাবি ছিল শৌচাগারের উন্নত ব্যবস্থা করতে হবে, সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং জেল-রেগুলেশন অনুযায়ী খাদ্য, জামা কাপড় ও ইন্টারভিউয়ের সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া কোর্টে বা হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় তাদের হাতে হাতকড়া পরানো চলবে না। তিহার জেলের রাজনৈতিক আটক বন্দীরা এইসব দাবিদাওয়া নিয়ে পরের দিন ৩ অক্টোবরও অনশন করেন। চরণ সিং, রাজনারায়ণ এবং নানাজী দেশমুখ এই সব দাবিদাওয়ার প্রতি তাঁদের সমর্থন জানান।

সরকার অল্প কিছু নতি স্বীকার করলেন এবং আটক বন্দীদের কিছু কিছু দাবি তারা মেনে নিলেন। তবে আটক সংক্রান্ত আইনকে আরও কঠোর করে

দেওয়া হল। ১৮ অক্টোবর 'মিসা' আবার সংশোধন করা হল। এবার বলা হল যে মিসায় গ্রেপ্তার করার কারণ সরকার কাউকেই জানাতে বাধ্য থাকবেন না। এমনকি আদালতকেও নয়। এই সংক্রান্ত অর্ডিনান্সকে কার্যকর করার সময় হিসাবে ধার্য করা হল ২৯ জুন। অর্থাৎ ২৯ জুন থেকে যারা মিশায় আটক হয়ে আছেন তাদের কেউ যাতে এই প্রশ্নে আদালতে যেতে না পারে বা গেলেও তা বাতিল হয়ে যায় তার জন্ম এই ব্যবস্থা হল। আসলে আমার মুক্তির পরই সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কেন না ১৩ সেপ্টেম্বর আমাকে মুক্তি দেবার সময় দিল্লি হাইকোর্ট রুলিং দিয়েছিলেন। 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইনানুসারে কুলদীপ নায়ারকে আইন সঙ্গত ভাবে আটক রাখা হয়েছে'—সরকার পক্ষ আদালতকে এ কথা সন্তোষজনক ভাবে বোঝাতে পারেন নি। বৃটিশ সংবাদ সরবরাহ সংস্থা রয়টার এই খবর প্রচার করেছিল বলে ৯ অক্টোবর তাদের নিউজ সার্কিট কেটে দেওয়া হয়। বলা হয় যে তারা সেন্সরশিপ আইন ভঙ্গ করে ঐ সংবাদ পাঠিয়েছে। ওদের ঐ সার্কিট পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পুরো তিনটি মাস সময় লেগে যায়।

মিসাকে আরও কঠোর করায় এবং রয়টারের সার্কিট কেটে দেওয়ায় বিদেশের এই ধারণা আরও মজবুত হল যে, ভারত দৃঢ়ভাবে ও সম্পূর্ণরূপে স্বৈরতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্ররা ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত টি, এন, কলের বাড়ীর কাছে 'স্বাধীনতার পদযাত্রা' করেন। এমারজেন্সীকে সমর্থন করার জন্ম টি এন কল নিজের থেকেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং আমেরিকাকে তিনি এই বলে সতর্কও করে দিয়েছিলেন যে, তারা যদি গণতন্ত্র সম্পর্কে ভারতের বক্তব্যকে স্বীকার করে না নেয় তাহলে একদিন তাদের এজন্ম দুঃখ করতে হবে। তিনি নয়াদিল্লির শিক্ষামন্ত্রককে সেই সব ছাত্রের বৃত্তি বন্ধ করে দিতে বললেন যারা এমারজেন্সীর গুণগান করতে চায় নি। কিছু ছাত্রের পাসপোর্টও তিনি বাতিল করে দিলেন। কারণ তারা ভারতের মর্যাদা হানি করতে বদ্ধ পরিকর।

শিকাগোতে ডাক্তার, টেকনোক্র্যাট, ব্যবসায়ী এবং ছাত্র প্রতিনিধিরা মিলে প্রায় একশোজন লোক মহাত্মাগান্ধীর এক বিরাট ছবি (১০'×৬') নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঐ ছবিতে মহাত্মা গান্ধীর হাতে শিকল পরানো ছিল, অর্থাৎ তিনি বেঁচে থাকলে তাঁকেও ভারতের কারাগারে থাকতে হত।

৯ অক্টোবর শিকাগোতে চবনের বড় দুর্দিন গেছে। তাঁর বক্তৃতার মাঝখানে বহুবার হৈচৈ হয়, 'শেম্ শেম্' ধ্বনি দেওয়া হয় এবং তাঁকে বার বার বক্তৃতা

থামিয়ে দিতে হয়। যখন ঘোষণা করা হয় যে মন্ত্রী কেবল লিখিত প্রশ্নের জবাব দেবেন তখন উপস্থিত শ্রোতারা অবজ্ঞা সূচক শব্দ করতে থাকে এবং টিটকিরি দিতে থাকে। এর আগে নিউইয়র্কের এক সভায় তিনি বলেন, 'ভারতের গণতন্ত্র মারা যায় নি। বরং আজ সেখানে গণতন্ত্র অনেক বেশী কার্যকর ও সংবেদনশীল হয়েছে।'

২৩ অক্টোবর গীর্জা-সমূহের বিশ্বপরিষদ শ্রীমতী গান্ধীর কাছে আবেদন জানায় যে, তিনি যেন স্বাধীন মতামত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিনা বিচারে রাজনৈতিক আটক বন্দীদের জন্য 'দুঃখ প্রকাশ' করে একটি তারবার্তাও পাঠান। তাতে তিনি একথাও বলেন যে জরুরী অবস্থাজনিত ক্ষমতার সুযোগে সরকার ঐ ভূখণ্ডে 'মানবিক অধিকারকেও অনেক সংক্ষেপিত করে ফেলেছেন।' শ্রীমতী গান্ধীর যুক্তি হল তিনি সংবিধানের নির্দেশ অনুসারেই সঠিক পথে ও যুক্তিতে ভারতে এমারজেন্সী জারি করেছেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সংবিধানের ভূমিকায় প্রথমে বলা আছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের কথা। রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের কথা আছে তার পরে।

এযুক্তি অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। কিন্তু এখন তিনি অনেক শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ৭ নভেম্বর সুপ্রীমকোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ১২ জুনের রায়কে নাকচ করে দিলেন। হাইকোর্ট বলেছিলেন আগামী ছয় বছর পর্যন্ত শ্রীমতী গান্ধী কোন নির্বাচিত পদে থাকতে পারবেন না, সুপ্রীমকোর্ট সে আদেশও বাতিল করে দেন।

পাঁচ সদস্যের ট্রাইবুনাল এই মামলার বিচারের সময় এ সংক্রান্ত তথ্যাদির উপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করলেন না। তাঁরা আগস্ট মাসে সংসদে নির্বাচন আইন সংক্রান্ত যে সংশোধন গৃহীত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই রায় দিলেন। এর দ্বারা তিনি তাঁর শাস্তি থেকে মুক্তি পেলেন।

আগস্ট মাসে সংসদে যে বিশেষ সংবিধান সংশোধন বিলটি গৃহীত হয়েছিল সুপ্রীমকোর্ট ৫-৩ ভোটে তা নাকচ করে দেন। ঐ সংশোধনে প্রধানমন্ত্রীর মামলা করার অধিকার থেকে আদালতকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এই রুলিং দ্বারা রাজনারায়ণের বক্তব্যই সমর্থিত হয় যে, এই ধরণের সর্বগ্রাসী ক্ষমতা সংবিধানের মৌল আদর্শকেই ধ্বংস করছে।

শ্রীমতী গান্ধীর দল বিজয়োৎসব করলো এবং বললো, 'গণতন্ত্রের ধারার যথার্থতা এর দ্বারা প্রতিপন্ন হল। এই রায় গণতন্ত্রের জয়যাত্রাকে গতি প্রদান

করেছে।' কিন্তু বিরোধীরা এ ব্যাপারে খুব কঠোর মন্তব্য করলেন, কেননা কোর্টের এই রায়ের মূলে আছে নির্বাচনী আইনকে সংশোধন করা—যা তাঁর পার্টির লোকেরাই চেয়ে ছিল এবং আইন পূর্বের কোন একটা দিন থেকে কার্যকর করারও সিদ্ধান্ত পার্টির ইচ্ছাতেই হয়েছিল।

এই রায় বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার প্রধান বিচারপতির কাছে অনুরোধ জানালেন যে, সুপ্রীমকোর্টের একটি পুরনো রায় সম্পর্কে যেন পুনর্বিবেচনা করা হয়, কেন না ঐ রায়ে সংবিধানের মৌল কাঠামো সংশোধনের ব্যাপারে সংসদের ক্ষমতাকে সীমিত করার কথা বলা হয়েছিল। সরকারের বিভিন্ন আইন ও বিধিকে চ্যালেঞ্জ করে ভারতের বিভিন্ন আদালতে তখন ৩০০য়েরও ওপরে রিটপিটিশনের মামলা বিচারাধীন ছিল। আর প্রতিটি মামলার বক্তব্য ছিল সরকার সংশ্লিষ্ট আইন অথবা বিধি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ভেঙ্গে তবে করেছেন। অথচ মৌলিক কাঠামো ভাঙ্গার কোন অধিকার তখন সরকারের ছিল না। নমুনা স্বরূপ অন্ধ্রের একটি মামলা হাতে নেওয়া হল। নীরেন দে যুক্তি দেখালেন, ১৯৭৩ সালের রায়ে এটা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয় নি যে সংবিধানের আবশ্যিক বিষয়গুলি কী। সুতরাং এ ব্যাপারে সংসদের ভূমিকা কী হবে সেটা জানার জন্য এই বিষয়টি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে। পালকিওয়ালা সরকারকে এই বলে অভিযুক্ত করলেন যে, এই বিষয়ে পুনর্বিচার চেয়ে এক 'অশোভন তাড়া-হুড়ার' পরিচয় দিয়েছেন। অথচ যে রায় সম্পর্কে এই পুনর্বিবেচনা চাওয়া হয়েছে তা ছিল ভারতীয় আদালতের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিচার।

এই মামলার শুনানীর তিন দিন পরেই প্রধান-বিচারপতি হঠাৎ ১৩ জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত বেঞ্চ ভেঙে দিলেন। তিনি খবর পেয়েছিলেন যে উক্ত বেঞ্চের বেশীরভাগ বিচারপতিই এই রায়ের পুনর্বিবেচনার বিরোধী। এই বিষয়টি সরকারের বিপক্ষে যায়—বহু মাসের মধ্যে এই প্রথম এমন একটা ঘটনা ঘটলো।

সদুদ্দেশ্যে প্রেরিত উকিলরা এই সুযোগে নিজেদের কাজের পরিধিকে বেশ কিছুটা বাড়িয়ে নিলেন। তাঁরা আটক বন্দীদের মুক্তির জন্য অথবা জেলে তাদের থাকা খাওয়ার ভালো ব্যবস্থার জন্য সারা দেশে হাজার হাজার 'রিটপিটিশন দাখিল করা হতে থাকলো।

ব্যাঙ্গালোর হাইকোর্টে আডবানী অটলবিহারী বাজপেয়ী, এস এন মিশ্র (সংগঠন কং) এবং মধু দণ্ডবতের (সমাজতন্ত্রী) হয়ে শান্তিভূষণ অবতীর্ণ

হলেন। জরুরী অবস্থা যখন জারি হয় তখন এরা সকলে কর্ণাটকে ছিলেন। শান্তিভূষণ বলেন, 'আমরা সম্পূর্ণ এমার্জেন্সীকেই চ্যালেঞ্জ করছি এবং চ্যালেঞ্জ করছি সেই সংক্রান্ত সকল সরকারী ব্যবস্থাকে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী চক্রান্ত দেখতে পেয়েছিলেন এবং যার জন্য তিনি নাকি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সেটা কী করে এর অংশ হল সে কথাও জানতে চাই।'

দু'জন উকিল বিনা পারিশ্রমিক আটক বন্দীদের হয়ে মামলা লড়বার জন্য এলেন। এঁরা হলেন বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ভি, এম, তারকুণ্ডে এবং বোম্বাইয়ের সোরাবজী। তারকুণ্ডের নেতৃত্বে তখন একটি সংস্থাও গড়ে উঠেছিল তার নাম হল 'সিটিজেন্স ফর ডেমোক্রেসি'। এই সংস্থাটি ভারতের বহু শহরে ঘরোয়া বৈঠক করেছে শুধু মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে আনার দাবীতে। ১২ই অক্টোবর আমেদাবাদে এই সংস্থার একটি কনভেনশন হয় এবং বক্তাদের মধ্যে ছিলেন, সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এম, সি, চাগলা, সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জে, সি, শাহ, ভি এম তারকুণ্ডে, মিনুমাসানি এবং অপর কিছু উকিল।

এই সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে চাগলা বললেন, 'আমাদের দেশবাসী আজ জেলে পড়ে আছে কিন্তু তারা জানে কী কেন তারা জেলে? তারা নিজেদের পক্ষ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে লড়তেও পারছেন না। কারণ তাঁরা জানেন না যে কোন্ অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগই যদি না থাকে তাহলে লড়াইটা হবে কিসের ভিত্তিতে। তাঁরা কোন ট্রাই-ব্যুনালেও যেতে পারবেন না কারণ সরকার সে সব সুযোগ আগে থেকেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।'

তাঁর বক্তৃতা ছেপে সব চেয়ে বেশী বিপদে পড়লো বরোদার 'ভূমিপুত্র' নামক পত্রিকা। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নবজীবন ট্রাস্টের প্রেসে ঐ পত্রিকাটি ছাপা হত। ফলে তাদেরও নির্যাতন সহতে হয়। 'ভূমিপুত্রের' প্রেসে তালা লাগিয়ে সীল করে দেওয়া হয়। মামলা হাইকোর্টে যায় এবং বিচারপতিরা সেন্সেরশিপ নির্দেশাবলীর কিছু কিছু অংশকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেন। ঐ রায়ও ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি যতক্ষণ না আদালত সেই মর্মে আদেশ জারি করেছে। আদালত বলে, 'আদালতের যে রায়ে নাগরিকের স্বাধীনতার কথা স্বীকৃত হয় তা কখনও অপর কারও ক্ষতি করতে পারে না।'

নবজীবন ট্রাস্ট প্রেস—যেখান থেকে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অস্ত্র হিসাবে

মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'হরিজন' প্রকাশ করতেন সেই প্রেস 'ভূমিপুত্রের' মামলা নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ একেবারে প্রেসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং প্রেস 'সীল' করে দিল। ছয়দিন পর্যন্ত প্রেস 'সীল' করা অবস্থায় ছিল। প্রেস গুজরাট হাইকোর্টের শরণাপন্ন হল। একটা পর্যায়ে এমন কথাও বলা হয়েছিল যে নবজীবনে যে সব জিনিস ছাপাবে সেগুলির বিরুদ্ধে কোন কিছু করবে না। প্রেসের ম্যানেজার জিতেন্দ্র দেশাই বললেন, স্বাধীনতা পাওয়ার পর এই প্রথম এদেশের স্বাধীন সরকার এই প্রেসকে 'সীল' করলেন যা না কি বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মহাত্মাজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কংগ্রেস দলভুক্ত কয়েকজন উকিল ৮।৯ নভেম্বর তারিখে কর্ণাটক আইনজীবী সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্পর্কে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, গরীবদের বিনামূল্যে আইনের সুযোগ দেবার জন্যই এই সম্মেলন। কর্ণাটক সরকার এই সম্মেলনের জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু জরুরী অবস্থার সমর্থনে একটি প্রস্তাব পাশ করা। যারা প্রত্যক্ষ-ভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করতেন এমন বহু অ্যাডভোকেটকে সম্মেলনের প্রতিনিধিই হতে দেওয়া হয়নি। মোট ১৮০০ উকিলের মধ্যে মাত্র ৬০০ জন এই সম্মেলনে যোগ দেন। তৎসত্ত্বেও সুপ্রীম কোর্টে আপীল মামলা জয়ের জন্য শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে যখন সম্মেলনে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হল তখন পক্ষে পড়লো মাত্র ১০টি ভোট এবং বিপক্ষে ৪৯০টি ভোট।

কর্ণাটকের এই ঘটনা যে একটি বিরল ঘটনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিছু কিছু আইনজীবী আবার পরিণামের কথা চিন্তা না করেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তখনও মামলা লড়ে যাচ্ছিলেন। হাইকোর্ট সমূহের বহু বিচারপতিই সরকারী মতিগতির তোয়াক্কা না করেই কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীমতী পদ্মা দেশাই তাঁর শ্বশুর মোরারজীর সঙ্গে 'ইন্টারভিউ' পাওয়ার জন্য আদালতে মামলা করেন। কিন্তু ঐ মামলায় প্রয়োজনে মিসায় আটক বন্দীদের আটক রাখার সর্তাদি সম্বলিত পুস্তকটি কিছুতেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। দিল্লি গেজেটে সেটা প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার কপি কিনতে গিয়ে জানা গেল সব কপি আগেই বিক্রী হয়ে গেছে। বিচারপতিদ্বয় রঙ্গরাজন এবং আগরওয়াল ঐ মামলার শুনানী হবার পর বলেন, প্রশাসন বিভাগের কোন গোপন আদেশই আইনকে লঙ্ঘন করতে পারে না। তাই তাঁরা 'ইন্টারভিউ' ও চিঠিপত্র লেখা সম্পর্কিত কড়াকড়ির

বিষয়টি নাকচ করে দেন। শ্রীএম, ভি, শর্মার স্ত্রী শ্রীমতী সত্য শর্মা এই রুলিং পেলেন যে, জরুরী অবস্থা চলাকালেও যে কোন প্রশাসনিক আদেশ ন্যায়সঙ্গত আইন মোতাবেক হওয়া দরকার। এলাহাবাদের প্রধান বিচারপতি কে, বি, আস্থানা একজন আটক রাখার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে বলেন, সরকারের যুক্তিবর্জিত আদেশই কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

বোম্বাইয়ে বিচারপতিদ্বয় জে, আর, ভিমাদালাল এবং পি, এস, শাহ মহারাষ্ট্রের আটক বিধিতে আহার, ইন্টারভিউ এবং চিকিৎসা সম্পর্কে যে সর্তাদি ছিল তা নাকচ করে দেন। তাঁরা বলেন, 'একজন আটক বন্দী কয়েদী নয় এবং আটক রাখার অধিকার মানে শাস্তি দেওয়ার অধিকার নয়'। সেই জন্য আটক বন্দীর উপর যে বিধি নিষেধ আরোপ করা হবে তাতে যেন আটক রাখার কার্যকারিতা প্রতিবিম্বিত হয় এবং বিধি নিষেধের পরিমাণ যতদূর সম্ভব কম হয়।

মহারাষ্ট্রের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি ভি, ভি, তুলজাপুরকার পুলিশের একটি আদেশ নাকচ করে দেন। ঐ আদেশ দ্বারা পুলিশ আইনজীবীদের একটি সভা বাতিল করতে চেয়েছিলে। যেখানে সংবিধান অনুসারে নাগরিক অধিকার ও আইনের শাসন নিয়ে আলোচনার কথা ছিল। তিনি বলেন, 'যে সরকার প্রকাশ্য বিতর্কের মাধ্যমে জরুরী অবস্থার শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক সমালোচনা করতে দেয় না, সে সরকার শুধুমাত্র গোলাম ও কাপুরুষদের জন্য স্বাধীনতা রক্ষা করে। এবং যে সরকার স্বাভাবিক, নির্দোষ ও অনপকারী কার্যকলাপের জন্য অনুমতি চাইতে গেলেও পুলিশের প্রধান ব্যক্তিকে দিয়ে নিরীহ নাগরিকের সঙ্গে অপমানকর ও অমর্যাদাকর ব্যবহারে উৎসাহ দেয়, তারা কি করে বিশ্বের কাছে দাবি করে যে তাদের দেশে গণতন্ত্র এখনও বেঁচে আছে!'

এগুলি হল ছাড়াছাড়া কয়েকটি ঘটনা। সরকার আরও অনেকের পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেন। প্রায় ৪০০ মামলার ক্ষেত্রে সরকার এক তরফা শুনানীর ব্যবস্থা করে মামলাগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। অপর পক্ষকে নিজেদের বক্তব্য আদালতের সামনে উপস্থাপনের সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয় না। এর মধ্যে মধু লিমায়ের মামলাও ছিল। ছাত্র আটক-বন্দীরা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে না। বোম্বাইয়ের মেয়র নির্বাচনও এইভাবেই বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সরকারের ব্যবস্থাদি অন্ততঃপক্ষে দিল্লির আইনজীবীদের পিছু হটাতে

পারে না। এমার্জেন্সী যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল এবং তার বিষদাঁতও প্রায় সর্বত্র কামড় বসিয়েছিল সেই সময়ও দিল্লির হাইকোর্ট বার-অ্যাসোসিয়েশন সঞ্জয়ের প্রিয় প্রার্থী ডি, ডি, চাওলাকে হারিয়ে দিয়ে সভাপতিপদে নির্বাচিত করেছিল প্রাণনাথ লেখিকে। লেখি তখন তিহার জেলের একটি নিঃসঙ্গ সেলে বন্দী। জেলা বার-অ্যাসোসিয়েশনও—আরেকজন বিদ্রোহী আইনজীবী কানোয়ারলাল শর্মাকে নির্বাচিত করেছিল। ইনিও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে লড়াই করেছিলেন।

সঞ্জয়ের কাছে এ ছিল এক প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জস্বরূপ। সেও তাই জেলা ও সেসন্‌স আদালতের প্রায় হাজারখানেক চেম্বার (যেখানে উকিলরা বসেন) ধ্বংস করে দেবার আদেশ দেয়। বুলডোজার দিয়ে এই সব চেম্বার যখন মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তখন পুলিশ সেখানে নজর রেখেছিল যাতে অন্য কেউ এসে ঝামেলা করতে না পারে।

সেদিন ছুটি ছিল বলে চেম্বারের ভেতর কেউ ছিল না। কিন্তু এই ধ্বংসের কথা ছড়িয়ে যেতেই উকিলরা শশব্যস্ত হয়ে ছুটে আসেন যাতে নিজেদের মালপত্রগুলো অন্ততঃ বাঁচানো যায়। কিন্তু পুলিশ তাদের নির্দয়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। বহু ধীর-স্থির স্বভাবের অ্যাডভোকেটকে মাসাধিককালেরও বেশি আত্মগোপন করে থাকতে হয়। কারণ পুলিশ তাঁদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পরের দিন বার-অ্যাসোসিয়েশনের একদল সদস্য প্রধান বিচারপতি টি ভি আর তাতাচারীর কাছে প্রতিবাদ জানাতে যান। তেতাল্লিশজন উকিল যখন একটি বাসে করে আসছিলেন তখন তাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়। চব্বিশজনকে মিসায় এবং উনিশজনকে ডি আই আর আইনে। কেন্দ্রীয় পূর্ত ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী এইচ, কে, এল ভগত আরেকদল সাংবাদিকের কাছে বলেন যে, দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পরিকল্পনার জন্য সম্ভবতঃ এই বাড়ীগুলি ধ্বংস করা হয়। আরেকটি প্রতিনিধিদলকে ওম মেহতা বলেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আর কোন বাড়ীঘর ধ্বংস করা হবে না।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও দিল্লি ডেভেলপ্‌মেন্ট অথরিটি রবিবার দিনেই আরও ২০০ উকিলের চেম্বার গুঁড়িয়ে দিল। ছুটির সময় আরও ৫০০ চেম্বারকে নির্দয়ভাবে স্থানান্তরিত করা হয়। একই ধরনের কাণ্ড ঘটানো হয় শাহদরা ও পার্লামেন্ট স্ট্রীট ফৌজদারি আদালতেও। মোট আঠারজন উকিলকে কারাভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এদের মধ্যে একমাত্র উকিল যিনি জামিনে মুক্তি পান তাঁর নাম হল অশোক শাপ্‌রা। পুলিশ (কারাগার) বিভাগের ডেপুটি

ইন্সপেক্টর জেনারেলের ছেলে সাপ্রাকে রাতের অন্ধকারে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে আইনজীবীরা যে ব্যতিক্রম এটা তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন। অন্যরা জরুরী অবস্থায়—জীবনযাপন এক রকম অভ্যাস করে নেন। কেউ কেউ আবার এমার্জেন্সী চলাকালে 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' এসেছে বলে এর প্রশস্তিও গাইলেন। ছাত্রসমাজ যারা ছিল জে-পি'র আশা ও ভরসা তারাও শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

তবু তাদের কেউ কেউ প্রতিবাদ করেছে। দিল্লির জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আগস্টে একদিন এবং সেপ্টেম্বরে তিন দিন হরতাল পালন করেন। অন্যান্য ছাত্রাবাসের মত এখানকার ছাত্রাবাসেও প্রচুর সংখ্যায় গোয়েন্দা ছিল। পনেরোজন যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রকে যখন ভর্তি করা হল না তখন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি এর প্রতিবাদ জানালেন। এতে উপাচার্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ৫০০ জন অধ্যাপক ও ছাত্র গ্রেপ্তার হলেন। এঁদের মধ্যে তরুণ ছাত্রনেতা অরুণ জেটলিও ছিলেন। দিল্লির কিছু ছাত্রকে তাদের স্কুল থেকে দু বছরের জন্য তাড়িয়ে দেওয়া হল। কিছু পুলিশ ইন্সপেক্টর ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়ে ক্লাশ করতে থাকলেন।

১৯ নভেম্বর দিল্লির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে এ সবের প্রতিবাদে এক সভার আয়োজন করা হল। এর নেতৃত্ব দিল চোদ্দ থেকে সতেরো বছর বয়স্ক চাব্বিশটি ছেলে। তাদের ভেতর থেকে দুজন মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে চীৎকার করে উঠলো। 'ইন্দিরা আমরা তোমার জেলখানা ভরে দেব, মনে রেখ। তবু তোমার চক্রান্তের সামনে মাথা নোয়াব না।'

এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদের পর যা হবার ছিল তাই হল। কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রকে সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হল যেখানে যাওয়া তাঁরা মোটেই পছন্দ করেন নি। কিন্তু প্রতিবাদকারীদের পক্ষে সেদিন সেটাই ছিল কঠোর বাস্তব।

তখন একটি গোপন পত্র প্রচারিত হয়েছিল: 'সবই ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। মনে হয় দেশের পরিস্থিতি আজ অবনতির চূড়ান্ত সীমায় নেমে গেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কোন দলের আর অস্তিত্ব নেই। এখন একজন মাত্র ব্যক্তির শাসন চলছে। বাকী সকলে পুতুল মাত্র। সাধারণ মানুষ ও সরকারের উঁচু ও নীচু পদের আমলারা সব

একযোগে বোবা ও অসাড় হয়ে গেছে। জনসাধারণ গভীর আর্তনাদে ছটফট করছে।'

'কিন্তু তাদের কথা কে-ই যে শুনছে আর কে-ই বা এগিয়ে আসছে তাদের রক্ষার জন্য? হয়তো কেউ এটা চিন্তাই করতে পারে নি যে এমন কিছু একটা হতে পারে। এমার্জেন্সীর ভয়ে মানুষের বিবেক পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এখন মনে হয় ইন্দিরা গান্ধী বুঝতে শুরু করেছেন যে, দেশের মধ্যে কী পরিস্থিতি তিনি তৈরী করেছেন! রোজই একটা করে নতুন অর্ডিন্যান্স পাশ হচ্ছে। এখন তিনি নিজে এবং তাঁর ছেলে সঞ্জয় গান্ধী সমস্ত সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা করছেন। সমস্ত ব্যাপারটা আজ এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, সঞ্জয় গান্ধীর নির্দেশ পেলে তবেই মন্ত্রিরা পর্যন্ত কাজ করে থাকেন। গুণ্ডাদের হাতেই আজ রয়েছে প্রশাসনযন্ত্রের চাবিকাঠি। কেউ জানে না যে এই অভিশাপ থেকে দেশ কিভাবে মুক্ত হবে।'

'লক্ষাধিক মানুষ আজ জেলে রয়েছে। তাদের পরিবারবর্গের অবস্থা দিনের পর দিন আরও খারাপ হচ্ছে। বহুলোকের চাকরী চলে গেছে। অনেক ছাত্রের পড়াশুনা আটকে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বহু সংখ্যক অধ্যাপককে কারাগারে পুরে দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধ, যুবক এমনকি শিশুদের পর্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলো হচ্ছে। এরই নাম হল পুলিশী শাসন। তাদের হিংস্রতা এবং বর্বরতা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

এমন কি আর্থিক অগ্রগতিও এমারর্জেন্সীতে হয় নি। শ্রীমতী গান্ধী এখনও প্রমাণ করতে পারেন নি যে একটি গরীব দেশকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির দেবার জন্য সদাশয় এক-নায়কের প্রয়োজন আছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়েছে সেই ১৯৬৬ সাল থেকে যখন তি'ন ক্ষমতাসীন হয়েই টাকার অবমূল্যায়ণ করেন।

১৯৫০-৫১ সালকে মূল বছর ধরে যদি পাইকারীমূল্যের সূচক সংখ্যার হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ১৯৫০-৫১ সালের সূচক সংখ্যা যেখানে ১০০ সেখানে ১৯৬৬-৬৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৪৮ অর্থাৎ পনেরো বছরে মূল্যবৃদ্ধির হার ৪৮ শতাংশ। আরও একটা লক্ষ্য করার বিষয় ছিল তাহল ১৯৫০-৫১ সাল ছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সূত্রপাতের বছর। যাইহোক ১৯৬৬-৬৭ সালে শ্রীমতী গান্ধীর ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে ১৯৭৪-৭৫ সাল পর্যন্ত পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ১৪৮ থেকে বেড়ে ৩৫১ হয়েছে অর্থাৎ তাঁর রাজত্বের মাত্র নয় বছরে মূল্যবৃদ্ধির হার ১৩৭ শতাংশেরও বেশী।

অপরদিকে ১৯৫০-৫১ সালে নোট সরবরাহের পরিমাণ ছিল ২,০০৬ কোটি টাকা। ১৯৬৫-৬৬ সালে সেটা বেড়ে হয় ৪,৫৩০ কোটি টাকা। অর্থাৎ পনেরো বছরে মোট সরবরাহ দ্বিগুনের চেয়ে কিছু বেশী হয়। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে টাকার সরববাহ দাঁড়ায় ১১,৫০০ কোটি টাকা। এটা কোন হিসাবেই আসে না।

শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৯৬৬ সালে শিল্প-উৎপাদন ১৫৩ পয়েন্ট পৌঁছেছিল। (এই একই স্কেলে ১৯৫১ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৫ পয়েন্ট)। অর্থাৎ শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক গড় সংখ্যা ছিল ৬৫ শতাংশ। ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৭৪-৭৫ মধ্যে এই সূচক সংখ্যা ২০৮য়ে দাঁড়ায়, শিল্প উৎপাদন বার্ষিক গড় এই সময় ৪ শতাংশেরও কম দাঁড়ায়। সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষিক্ষেত্রে স্বস্তির আবহাওয়া থাকলেও শিল্পক্ষেত্রে তার উল্টো প্রতিক্রিয়াই দেখা যায়।

১৯৫০-৫১ সালে মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৫'৭ শতাংশ। ১৯৬৫-৬৬ সালে সঞ্চয়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৩'৩ শতাংশে। ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে সঞ্চয়ের হার বার বার ওঠানামা করলেও কোন সময়েই তা ১৯৬৫-৬৬ সালের হারে পৌঁছুতে পারেনি। মোটামুটি ভাবে এই সময়ে সঞ্চয় ওঠানামা করেছে ১১ ও ১৩ শতাংশের মধ্যে। ১৯৬৬-৬৭ কেবল একবারের জন্য সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল মোট জাতীয় আয়ের ১০'৩ শতাংশ। কিন্তু ঠিক পরের বছরই তা ১০'২ শতাংশে নেমে যায়। ১৯৭৪-৭৫ সালের আগে এই হার আর বাড়েনি।

কম সঞ্চয়, সামিত বিনিয়োগ, শিল্পে মন্দা, ও নোটের সরবরাহে অত্যাধিক বৃদ্ধি এবং ১৯৭৩-৭৫ সালের খরার কৃষি উৎপাদনে ঘাটতি এই সবকিছু মিলে দেশে দেখা দিয়েছিল এক অর্থনৈতিক সংকট। ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সালে দেশবাসী এটা বেশ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিল। ফলে একটা সময় এমন মনে হয়েছিল যে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে এমারজেন্সীর মতই একটা কোন কঠোর ব্যবস্থা হয়তো নিতে হতে পারে।

তবে শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক হয়েছিল ১৯৭৫-৭৭ সালের রেকর্ড খাদ্য উৎপাদন। যেখানে ঐ পরিমাণ ছিল ৯৯৮'৩ লক্ষ টন সেখানে পরবর্তী বছর উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ালো ১২০৮'৩ লক্ষ টন। তারপর সরকারী তরফে শুরু হয়েছিল চোরাচালানবিরোধী অভিযান। যার ফলে ঐ ব্যবসা বেশ ঝামেলাজনক ও ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে গেল। ২৮৮ জন চোরাচালানদারদের

গ্রেপ্তার করা হল। এদের মধ্যে চোরাচালানের জগতে শিরোমণি হাজি মস্তান, ইউসুফ প্যাটেল প্রভৃতিও ছিল। এদের মধ্যে ১৭৭ জনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছিল। ১ জুলাই এক অর্ডিন্যান্স জারি করে বলে দেওয়া হল যে (বিদেশী মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাচালান নিরোধ আইন) যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরও গ্রেপ্তারের কারণ দেখানো হবে না। যদি বোঝা যায় যে দেশের স্বার্থেই তাদের আটক করা প্রয়োজন তাহলে তাদের কেসগুলি অ্যাডভাইসারী বোর্ডের সামনে পর্যন্ত রাখা হবে না। (গায়ত্রী দেবীকে এই আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।)

এরপর সরকার বিশেষ এক আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় প্রবাসী ভারতীয়রা কালো বাজারের পরিবর্তে প্রকাশ্য সরকারী পথে দেশে টাকা পাঠাতে লাগলেন। ফলে প্রবাসী ভারতীয়রা বছরে যেখানে ৮০০ মিলিয়ন টাকার বিদেশী মুদ্রা পাঠাতেন সেখানে প্রতিবছর তারা ২০০০ মিলিয়ন টাকার বিদেশী মুদ্রা পাঠাতে লাগলো।

মিসার ভয়েও শিল্পক্ষেত্রে খানিকটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোথাও ধর্মঘট হতে দেওয়া হত না। যদিও বা কোথাও হত তৎক্ষণাৎ সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে মিটমাট করা হত। এর ফলে শিল্পপতিরা বেশ খুশী হলেন। স্বাভাবিকভাবেই ট্রেড ইউনিয়নগুলি মোটেই খুশী হতে পারলো না। অবশ্য কোন কিছু করার ব্যাপারে তাদের মনে ভয়ও ছিল। এমন কি নতুন বোনাস আইন করে যখন বাধ্যতামূলক বোনাস দেওয়াও (৮·৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া বাধ্যতামূলক ছ'ল) বন্ধ করে দেওয়া হল এবং পুরো ব্যাপারটাই মালিকদের মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়া হল তখনও কিন্তু শ্রমিকদের আর্থিক ক্ষতি হওয়া সত্বেও ট্রেড ইউনিয়নগুলি চুপ করে বসেছিল। কিছুই তারা করেনি। সি পি আই কেবল একটু হৈ-চৈ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে কেবল খাতায় কলমে। খবরের কাগজ পর্যন্তই ছিল তার দৌড়।

শিল্পক্ষেত্রে শান্তি এবং কিছু 'সুফল' দেখাবার জন্য সরকারী প্রয়াস এই দুইয়ে মিলে শিল্প সংস্থাগুলি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছুটা বাড়তি নজর দিতে পারলো। এর ফলে দেখা দিল আরেক সমস্যা। সরবরাহ অত্যধিক বেড়ে গেল। শিল্পপতিরা অভিযোগ করতে শুরু করলেন যে, তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি কেনার মত উপযুক্ত খদ্দের বাজারে নেই—ফলে গুদামে মালের পাহাড় জমে উঠছে। সরকার এর কোন ব্যবস্থাই করলো না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল

সে-অঙ্ক বা ক্লোজার যেন কোথাও না হয়। অন্য কোন বিষয়কেই তারা আমল দিলেন না।

এর জন্য কি জরুরী অবস্থা জারি করার কোন দরকার ছিল? প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৪ সালে টি এ পাই শিল্পমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভায় যোগদান করার পর তিনি যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তারই সুফল পাওয়া যাচ্ছিল। কেননা এই ব্যাপারটা টি এ পাই ভালো বুঝতেন। এমন কি চোরাচালান বিরোধী অভিযানের ব্যাপারটিও ১৯৭৪ সাল থেকে পরিকল্পিত হয়ে পড়েছিল যখন গণেশ অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

জরুরী অবস্থা আমলাদের ঢিমে তালকে গতিশীল করতে পারে নি, আর করলেও খুব অল্প। এদিকে শ্রীমতী গান্ধী ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এবং রাজ্য সরকারগুলিকে একেবারে অকেজো করে ফেলছিলেন। আর এই সম্পূর্ণ সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষমতা গিয়ে পড়ছিল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলির স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, আই-এ-এস অফিসার এবং ব্যক্তিগত সচিবদের উপর। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এস, কে, মিশ্র. বাণিজ্য মন্ত্রকের এন, কে, সিং এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের ভি, এস, ত্রিপাঠী এই সময় বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে তারাই আসল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন এবং নীতি নির্ধারণেও বিশেষ ভূমিকা নিতে থাকেন। সঞ্জয় এই অফিসারদের ডাকনাম ধরে ডাকতো।

প্রকৃতপক্ষে, প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধী কোনদিনই বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসাবে মোরারজী বেশ কিছু সুপাবিশ করেছিলেন। সেগুলি ভারত সরকারের সচিবরা এখনও কার্যকর করার সময় পান নি। কাজের শ্লথগতির জন্য যখনই সমালোচনা হত অমনি শ্রীমতী গান্ধী ঐ সুপারিশগুলি খতিয়ে দেখার জন্য মন্ত্রিদের একটি গ্রুপ তৈরী করতেন, আর সে গ্রুপে থাকতেন মোহন কুমার মঙ্গলম্, ডিপি দার এবং টি এ পাই। বহু প্রস্তাব ও পরিকল্পনা তাঁরা রচনা করেছেন এবং সেগুলির স্থান হয়েছে ঠাণ্ডা ঘরে।

শ্রীমতী গান্ধীর নিজস্ব দপ্তর, বিভিন্ন মন্ত্রকের স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্টবৃন্দ এবং 'র' এদেরই সম্পূর্ণ প্রশাসন যন্ত্রটিকে চালাবার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছিল এবং এরা কাজও চালিয়ে যাচ্ছিল। যদিও তিনি তাঁর প্রকাশ্য বক্তৃতায় এবং ফাইলের উপর যে সব নোট দেন তাতেও প্রশাসনিক কাজের শ্লথগতির জন্য তিনি নিয়মিত মন্তব্য করতে থাকেন।

তিনি সকল মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কাছে এই মর্মে চিঠি লেখেন যে

তাঁরা যেন সকল পর্যায়ে প্রশাসনকে দ্রুত কর্মশীল একটি যন্ত্রে রূপান্তরিত করেন। তিনি বলেন, 'আমরা এখন খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এটা খুবই স্বাভাবিক যারা প্রশাসনিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন তাদের কাছে মানুষের আশা অনেক বেশী। সেইজন্য শ্রমবিমুখতা, গতানুগতিকতা ও শৃঙ্খলাহীনতার কোন অবকাশ এখানে নেই। প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব পালনে যেন আন্তরিক-ভাবে চেষ্টা করেন। সকল পর্যায়ের সরকারী কর্মচারীদের কিছু অধিকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু দায়িত্ব পালন ব্যতিরেকে সেই অধিকার ভোগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কার্যকর নেতৃত্ব প্রদান করাই হল বড় কথা।...'

যদিও ১৯৭৫-এর ১০ মার্চ তারিখে লেখা এই চিঠিতে দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছিল, তবু লক্ষ্য করার বিষয় হল এমারজেন্সী চলাকালে ইন্দিরাজীর বক্তৃতায় এই দুটি বিষয়ের উল্লেখ দেখা যেত।

তাঁর চিঠি এক সচকিত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। কেন না কিছুকাল যাবৎ মহাকরণের সবত্র একটা গুজব দারুণ ভাবে ছড়িয়েছিল যে প্রশাসনে বিরাট রকমের পরিবর্তন আসছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি বিভাগ ও মন্ত্রক কাজের কতকগুলি সূচী তৈরী করে নিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর 'দূরদৃষ্টি ও মহান কর্মমুখীনতার' প্রশস্তি গেয়ে (এটা তখন প্রথাস্বরূপ হয়ে গিয়েছিল) বহু মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে উত্তর দিলেন যাতে তাঁরা আরও অনেক পরামর্শের কথাও জুড়ে দিলেন। শ্রীমতী গান্ধী এ সব চিঠির আর কোন জবাব দিলেন না। এমন কি এ সব চিঠির একটাও তিনি পড়ে দেখেন নি। সব কটা চিঠিই তাঁর দপ্তরে এবং কেবিনেট সেক্রেটারীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওগুলি সম্পর্কে পরে আর কেউ কোন কথা শোনে নি।

এরপর ২৫ এপ্রিল তারিখে আবার একটি চিঠি লিখে তিনি সকল মুখ্যমন্ত্রী ও কেবিনেট মন্ত্রীকে বিস্মিত করে দিলেন। ঐ চিঠিতে তিনি তাঁর পুরণো চিঠির জের টেনে প্রশাসনকে আরও কঠোর কথা আবার স্মরণ করিয়ে দেন। চিঠির সঙ্গে তিনি দুজন অবসর প্রাপ্ত আমলা এল পি সিং ও এল কে ঝা কর্তৃক এলোমেলো ভাবে তৈরী করা ১৪ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্টও জুড়ে দিয়েছিলেন যাতে 'প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির' ব্যাপারে বিশেষ সুপারিশ করা হয়েছিল। তিনি আবার মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে তাঁরা যেন প্রশাসনিক ব্যাপারে ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখান এবং প্রশাসনিক কাজকর্মকে আরও বেশী সক্রিয় ও কার্যকর করার জন্য পরামর্শাদি দেন। আবার এই চিঠি মহাকরণে সকলের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। প্রত্যেক মন্ত্রীই তাঁর সিনিয়ার অফিসারদের নিয়ে বহু

বৈঠক করলেন। সিনিয়ার অফিসাররা আবার তাঁদের অধীনস্থ অফিসারদের উপর আস্থা স্থাপন করে সব কথা বললেন। কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার একটা করে পাক্ষিক রিপোর্ট কেবিনেট সেক্রেটারীর কাছে পাঠানোর কথা স্থির হল। এই সমস্ত কিছুর পরিণতি কিন্তু যা হবার তা-ই হল। অর্থাৎ প্রশাসন যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

যাই হোক এমারজেন্সীর নাম করে কেন্দ্রীয় সরকার অন্ততঃ ২০০ জন অফিসারকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করলেন। রাজ্যগুলিতে বাধ্যতামূলক অবসর-সংখ্যা হল আরও বেশী। ১৯৬০ সাল থেকেই একটা নীতি চলে আসছিল। সেটা হল যে গাছের বয়স পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে তাকে কেটে ফেলাই বাঞ্ছনীয়। এই নিয়ম ঢালাও ভাবে কাজে লাগানো হল। যে সব অফিসার বেআইনী কাজ করতে অস্বীকার করলেন তাঁদেরই উপর প্রযুক্ত হল ঐ অস্ত্র। বহুজন আবার সঞ্জয়, ধবন ও তাদের সাকরেদদের ক্রোধের শিকার হয়ে চাকরী থেকে অসময়ে বিদায় নিতে বাধ্য হলেন।

নিজের ছেলেও তার সাকরেদদের সাহায্যে প্রশাসন চালাতে পেরে শ্রীমতী গান্ধী বেশ খুশীই ছিলেন, একদিকে দ্রব্যমূল্যের পরম্পরানুবর্তী স্থিতিশীলতা এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রায় অনুপস্থিতি, অপরদিকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 'সহযোগিতা' প্রাপ্তি তাঁকে এবং সঞ্জয়কে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল। এখন তাঁরা ঝুঁকি নিতে পারেন।

এই সময় শ্রীমতী গান্ধী সাময়িকভাবে জেপিকে মুক্তি দেবার কথা চিন্তা করছিলেন। কেননা তার শরীরের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তাঁর যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে মানুষ চুপ করে থাকবে না। তারা শ্রীমতী গান্ধী এবং তাঁর সরকারকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

একটা সময় জেপি'র অবস্থা এত খারাপ হয়েছিল যে, তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। সংবাদপত্রগুলিকে জেপি সম্পর্কে বিশেষ নিবন্ধ রচনার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। শুকলা অবশ্য এই সূত্রে সংবাদ-পত্রের সম্পাদকদের বলে রেখেছিলেন যেন বিশেষ প্রবন্ধে নেহরুর ও জেপি'র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা কোথাও উল্লেখ না করা হয়।

স্বাস্থ্য ছাড়াও শ্রীমতী গান্ধী জেপি সম্পর্কে অন্য কিছু কথা চিন্তা করতেও উৎসাহী হয়েছিলেন। কেননা তার একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল যে, জেপি দেশের এবং দেশের মানুষের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে নিজেকেই দায়ী করছিলেন। হাকসারের পর তাঁর সুযোগ্য সচিব পি এন, ধার দীর্ঘ শলা-

পরামর্শের পর ইন্সটিট্যুট অব গান্ধী স্টাডিজের সুগত দাশগুপ্তকে জেপির কাছে পাঠান তাঁর মনোভাব কী তা জানার জন্য। পি, এন দার মনে করতেন যে একটা 'ভুলবোঝাবুঝির' জন্যই জেপি এবং শ্রীমতী গান্ধী একে অপর থেকে দূরে সরে গেছেন। এই ভুলবোঝাবুঝির অবসান এখনও ঘটানো যায়। দাশগুপ্ত জানালেন, জেপি এখন অতীত ঘটনাবলী খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন। প্রকৃত-পক্ষে আটক হবার পর দাশগুপ্তের কাছ থেকেই প্রথম দেশের প্রকৃত পরিস্থিতির একটা চিত্র দেখতে পান এবং তাতে তিনি বিশেষ বেদনা বোধ করেন।

বিহারের বন্যাপীড়িতদের সাহায্য করার জন্য তিনি সেখানে যেতে চাইছিলেন। সেইজন্য ২৭ আগস্ট তিনি একমাসের জন্য প্যারোলে মুক্তি চেয়ে সরকারের কাছে আবেদনও পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি নিজে গিয়ে বন্যা-পীড়িতদের সাহায্য করতে পারেন। জেপিকে প্যারোলে মুক্তি না দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী তার পরিবর্তে কৃষিমন্ত্রকের সচিব বলবীর ভোরাকে জেপি'র কাছে পাঠান এবং পাটনার বন্যাপীড়িতদের জন্য কী কী ত্রাণকার্য করা হয়েছে তার রিপোর্ট দেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের বন্যাপীড়িতদের জন্য কী ত্রাণকার্য করা হয়েছে তার কোন রিপোর্ট ভোরা না দেওয়ায় জেপি বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েন।

কিন্তু ১৭ সেপ্টেম্বর লেখা এক চিঠিতে জেপি কেবল মাত্র বন্যার বিষয়েই নয় অন্যান্য বিষয়েও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'বিহারের বন্যা পরিস্থিতিই যে শুধু অবনতির দিকে গেছে তা নয়, দেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলই বন্যাপীড়িত হয়েছে। এই রকম একটা সময়ে কেউ আন্দোলন বা সংগ্রাম পরিচালনা করবে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না। রাজনৈতিক জরুরী অবস্থা যে কোন সময়ে থাকতে পারে। কিন্তু এখন তার সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। দুঃখপীড়িত মানুষের সেবাকাজের যে জরুরী অবস্থা এখন এসেছে সেজন্য জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচী গ্রহণ করে কাজে নামতে হবে।'

এই চিঠির ভাষায় যা লেখা ছিল শ্রীমতী গান্ধী বোধহয় তার চেয়ে বেশী কিছু পড়লেন ঐ চিঠিতে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে জে-পি নিরাশ হয়ে গেছেন। কিন্তু এটাও ঠিক যে স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর যে সঙ্কল্প—তা বিন্দুমাত্র দুর্বল হয়নি। জেপির 'মোহ ভঙ্গ' হওয়া সম্পর্কে শ্রীমতী গান্ধী বোধ হয় একটু বেশীই ভেবে নিয়েছিলেন। তিনি স্থির করলেন জেপিকে প্রথমে ত্রিরিশ দিনের প্যারোলে মুক্তি দিয়ে তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখবেন।

সঞ্জয় জে-পির মুক্তির বিরুদ্ধে ছিল। তারপর সে যখন দেখলো যে

প্যারোলে মুক্তি পেলে তিনি রাজনীতির বাইরেই থাকবেন এবং কোন ক্ষতি করতে পারবেন না তখন সে এই নিয়ে বেশী ঘাটালো না। জে-পি কিন্তু সরকারকে জানিয়ে দিলেন যে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে তাঁর কার্যকলাপ তিনি আবার শুরু করে দেবেন।

১২ নভেম্বর জেপি ছাড়া পেলেন। সংবাদ পত্রে এ খবর বেশ বড় আকারেই ছাপা হল। তবে প্যারোলের সর্তাদি সরকার পক্ষ থেকে জানানো হল না। তাঁর রাজনৈতিক সহযোগীরা জানালেন যে চিকিৎসার জন্য তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মূত্রাশয়ের ইনফেকশনে জেপি শরীর খুব দুর্বল হয়ে গেছে বলে চিকিৎসকরা জানালেন।

শ্রীমতী গান্ধী দেখতে চাইছিলেন যে জে-পি এবং জনগণ কী রকম আচরণ করেন। দেখা গেল পরিস্থিতি তাঁর পক্ষেই রয়েছে—বিমুখ হয় নি।

## ৩। সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

জনগণের মুখে চোখে জেপি ভয়ের ছায়া দেখলেন। চণ্ডীগড়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বেশী কেউ উপস্থিত ছিলেন না। চণ্ডীগড় থেকে দুদিন পরে তিনি ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের বিমানে করে দিল্লি এলেন। দিল্লি বিমান-ঘাঁটিতে যে ক'জন উপস্থিত ছিলেন, গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা তাদের নাড়ীনক্ষত্রের খবর নিয়ে নিল। দিল্লির গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশানের বাড়ীতে জেপির থাকার ব্যবস্থা হল। ঐ বাড়ীর ওপর গোয়েন্দা বিভাগ কড়া নজর রাখলো।

শ্রীমতী গান্ধী যদি মনে করে থাকেন যে জেপির মনোভাবে পরিবর্তন এসেছে তাহলে তিনি ভুল করবেন। তিনি তো সেই নাইজেরীয় কবি ও নাট্যকার উলে সোয়িঙ্কার মত যিনি দু'বছর জেলে থাকার পর বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, 'আপনি যে বিশ্বাস নিয়ে জেলের ভিতর গিয়েছিলেন দুবছর পর জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর দেখা গেল শুধু যে সে বিশ্বাস আপনার আছে তাই নয় সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে।'

জেপি স্বগতকে যে কথা বলেছিলেন, দায় ঠিক অতটা ভাবেন নি। জেপি বলেছিলেন, এতকাণ্ড ঘটে যাওয়ার পর আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না যে আমি শ্রীমতী গান্ধীকে সমর্থন করবো বা তাঁর।সঙ্গে সহযোগিতা করবো। নির্বাচন যদি ঘোষিত হয় তাহলে তিনি সরকারের সঙ্গে বিরোধিতাকে শেষ করার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করবেন। দিল্লিতে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই জেপি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। ঐ সম্মেলনে একমাত্র বিদেশী সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় কোন রিপোর্টার ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে যান নি পাছে পুলিশের খাতায় তাদের নাম উঠে যায়। এই সাংবাদিক সম্মেলন মোট পনেরো মিনিট স্থায়ী হয়। জে-পি খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেন সুস্থ হলেই তিনি নৈতিক আদর্শের উপর নির্ভরশীল প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

'এই নৈতিক আদর্শকে শ্রীমতী গান্ধী ধ্বংস করেছেন। বৃটিশ আমলের

চেয়ে আমাদের খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে যেসব শক্তি আছে আমার কাজ হবে তাদের ঐক্যবদ্ধ করায় সর্বশক্তি নিয়োগ করা।' জে-পি সাংবাদিকদের আরও বলেন, 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ খুব হতাশ হয়ে পড়েছে। তারা জানে না যে তারা কী করবে। বিরোধী পক্ষের সকলে এখন জেলে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরুদ্ধ। ভয় এড়াতে গিয়ে তিনি এতকিছু করেছেন—এতে তিনি নিজেও এখন ভীত।'

জেপি সম্পর্কে সরকারের কাছে যা খবর ছিল তার সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। এ তো সম্পূর্ণ আলাদা জেপি। গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন খবর দিয়েছিল যে জেপির মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে। সেই সময় দার নিজেও আমাকে বলেছিলেন, 'জেপির মোহভঙ্গ হয়েছে এবং তিনি এখন স্মৃতিচারণ করছেন।' দেখা যাচ্ছে তাঁকে ভুল বোঝা হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্কল্প এখনও তেমনি দৃঢ় আছে।

যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উমাশঙ্কর দীক্ষিত ও দার দেখা করতে যান তখন জে-পিকে তাদের মোটেই নমনীয় মনে হয় নি। জেপি তাঁর দাবিতে অবিচল ছিলেন। সমস্ত বন্দী মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, প্রেস সেন্সরশিপ প্রত্যাহার এবং শীঘ্র নির্বাচনের দিন ঘোষণা না করলে কোন আলোচনাই হতে পারে না।

তিনি বোম্বাইতে আমাকেও ঠিক ঐ একই কথা বলেছিলেন। তাঁর মূত্রাশয় একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি ওখানে ডায়ালিসিসের জন্য গিয়েছিলেন। তাঁর মূত্রাশয় (কিড্‌নি) কী ভাবে যে নষ্ট হয়ে গেল এও এক রহস্য। তাঁর নিজের ধারণা চিকিৎসার জন্য যখন তাঁকে চণ্ডীগড়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ইন্সটিটুট অব মেডিকেল রিসার্চে রাখা হয়েছিল তখনই তাঁর এই কিড্‌নির গণ্ডগোল হয়।

জেপি নিজেও এ গুজব শুনেছেন যে, তাঁকে নাকি বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে 'বিবিসি'কে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ২৭ সেপ্টেম্বরের পর থেকে 'অস্বাভাবিক কারণ বশতঃ' তাঁর শরীরের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। বাইরে থেকে কোন কিছু প্রয়োগের ফলে এমন হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি 'বিবিসি'কে বলেন, 'পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আমি একথা বলছি যে, আমার মনেও এবিষয়ে কিছুটা সন্দেহ আছে।'

তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় বেশ ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছি যে জরুরী অবস্থা ও তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ তাঁর শরীর ও মনের উপর কী রকম প্রভাব বিস্তার

করেছিল। তিনি প্রকৃতই বেশ হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন এবং যেসব ঘটনা তারপর ঘটেছে সেজন্য তিনি নিজেকেই দায়ী করেছেন। তবে যে ঘটনা তাঁকে খুব খুশী করেছিল তাহল জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, 'একলাখ লোকের জেলে যাওয়া খুব কথা নয়।' তবে বিচারপতি ও আইনজীবীরা ছাড়া অন্য শ্রেণীর মানুষ বেশী সাহস না দেখানোতে তিনি একটু ক্ষুব্ধ হন।

তিনি মনে করেন, দেশের পক্ষে তাঁর আর 'কোন প্রয়োজন নেই।' দেশের জন্য সেবা করার কাজে তাঁর আর কোন কার্যকারিতাই নেই। তিনি তাঁর জেল ডায়েরীতে লিখেছেন, 'এক ব্যাপক হত্যালীলার মাঝখানে যেন আমার পৃথিবী সীমিত হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর একথা ঠিক নয়। কিন্তু তখনও কি তিনি ভাবতে পেরেছেন যে এত শীঘ্র তিনিই এদেশে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারবেন এবং সেই ধ্বংস স্তূপ থেকে জন্ম নেবে এক নতুন ভারত।

এর আরম্ভটা অবশ্য তখনই প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। ১৪ নভেম্বর থেকে সারা দেশে লোকসংঘর্ষ সমিতির উদ্যোগে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূত্রপাত। ঐ দিনটি আবার নেহরুর জন্মদিন। একদিন জেপি সম্পর্কে নেহরু বলেছিলেন যে, একদিন ভারতের ইতিহাসে সে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে। এক লক্ষেরও বেশী স্বেচ্ছাসেবক ত্যাগ স্বীকারে রাজী এই শপথ পত্রে স্বাক্ষর করলেন।

দিল্লিতে ৭ জন মহিলা ও ৬ জন শিশুসহ মোট ১০৮ জন দিল্লির চাঁদনী চৌকে গ্রেপ্তার বরণ করেন। শান্তিবনে শ্রীমতী গান্ধীর উপস্থিতিতেই ৫০ জন সর্বোদয় কর্মী গ্রেপ্তার বরণ করেন। শ্রীমতী ওখানে এসেছিলেন পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। সত্যাগ্রহীদের মুখে ধ্বনি ছিল, 'ভারত মাতা কী জয়' এবং তানাশাহী নহী চলেগী (স্বৈরতন্ত্র চলবে না)।

প্রবীন স্বাধীনতা যোদ্ধা ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য টেনেটি বিশ্বনাথন অন্ধ্র প্রদেশে সত্যাগ্রহী দলের নেতৃত্ব করেন। সমস্ত জেলাতেই সত্যাগ্রহীরা গ্রেপ্তার বরণ করেন। ওড়িশার সম্বলপুরে এবং কটকে সত্যাগ্রহ শুরু হয়। প্রথম দিনে গ্রেপ্তার হয় সাত জন। কেরলে সত্যাগ্রহের ডাক জেলা কেন্দ্রগুলি অতিক্রম করে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যায়। অনেক অজ পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত হাতে লেখা পোস্টার দেখা যায়। কেরলের মোট ১১টি জেলার মধ্যে ১০টি জেলা থেকে ২৮০ জন গ্রেপ্তার বরণ করেন। কালিকটের কাছে পুলিশ সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি চার্জ করে।

দেশের সর্বত্র সত্যাগ্রহ হয়। প্রত্যেকটি রাজ্য থেকেই গ্রেপ্তারের সংবাদ

আসতে থাকে। ২৯ জুন জে-পি'র ডাকে যে সত্যাগ্রহ হয়েছিল তার সঙ্গে এই সত্যাগ্রহের পার্থক্য ছিল। তখন লোকে এত ভীত ছিল যে রাস্তায় পর্যন্ত বেরোত না। আর এখন সত্যাগ্রহ দেখার জন্যই রাস্তায় ভীড় জমে যায়। সত্যাগ্রহীরা যেসব প্রচারপত্র বা প্যাম্‌প্লেট বিলি করতো সেগুলি গ্রহণ করতেও আর তারা দ্বিধা বা ভয় করতো না। পুলিশের ব্যবহারেও অনেক পার্থক্য এসেছিল। তারা আগের তুলনায় অনেক বেশী নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে শুরু করেছিল। জনসাধারণকে ছত্রভঙ্গ করার নাম করে তাদের উপর বলপ্রয়োগ করতে বা লাঠিচার্জ করতে তাদের এতটুকুও মর্মযন্ত্রনা বা দ্বিধা পর্যন্ত হত না।

সরকারও আরও বেশী করে স্বৈরতান্ত্রিকতার পরিচয় দিচ্ছিলেন। জরুরী অবস্থা জারির সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মৌলিক স্বাধীনতা ও অধিকার এমনিতেই প্রত্যাহৃত হয়ে গিয়েছিল। তবুও সরকার আবার ১৯ নম্বর ধারায় অন্তর্গত সপ্ত-স্বাধীনতা প্রত্যাহার করে নেবার জন্য স্পেশাল অর্ডার দেন। রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদের স্বাক্ষরযুক্ত আরেকটি আদেশপত্রে ঐ সপ্ত-স্বাধীনতা আদায়ের জন্য কেউ যাতে আদালত মুখো হতে না পারে সেজন্য নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়। সাংবিধানিক অধিকারের বিরুদ্ধে এই নতুন বিধিনিষেধ জারি করার জন্য কোন কারণ দেখানো হয় নি। প্রকৃতপক্ষে জরুরী অবস্থা জারি করার পর এই একইভাবে এই নিয়ে চারটি বিশেষ অর্ডার জারি করা হয়।

আশা করা গিয়েছিল যে এইবার হয়তো শ্রীমতী গান্ধী আটক বন্দীদের মুক্তি দেবেন। কিন্তু তিনি চললেন একেবারে উল্টো রাস্তায়। সম্ভবতঃ সত্যাগ্রহের পক্ষে ঐরকম জন-সমর্থন দেখেই সরকার সতর্ক হয়ে যান এবং বিরোধীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করতে এগিয়ে আসেন।

৪ ডিসেম্বর জে-পির ওপর থেকে প্যারোলের বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়। তবে তাঁর গতিবিধির উপর গোয়েন্দা বিভাগের কড়া নজর থাকেই। তিনি কোথায় যান, না-যান, তাঁর সঙ্গে কারা দেখা করতে আসে এবং, তাঁর চিঠিপত্র আদান-প্রদান প্রভৃতি সব কিছুর উপরই গোয়েন্দা দপ্তরের কড়া নজর থাকে।

তা যদি না হত তাহলে, যেমন জে-পি আমাকে বলেছেন, ইন্দিরাজীর স্থান হত পৃথিবীর সবার উপরে। তাঁকে দেবী-দুর্গা হিসাবেও বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁকে মাঝে মাঝে এমন দেখাত যে মনে হত বুঝি সত্যিই তিনি শক্তির অবতার। সর্বোত্তম ফললাভের জন্য কীভাবে কাজ করা উচিত এ বিদ্যা তাঁর খুব ভালোভাবেই জানা ছিল। একটি গ্রামে গিয়ে তিনি অতীব বিনয়ীর মত

সেখানকার প্রথামত একটি ধুতি পরেছিলেন এবং সলজ্জ নববধূর মাথায় যেমন ঘোমটা থাকে তিনিও মাথায় তেমনই একটি ঘোমটা টেনে দিয়েছিলেন। কাশ্মীরে গিয়ে তিনি পুরো কাশ্মীরীদের মত বেশভূষা করেন আবার পাঞ্জাবে গিয়ে তিনি সালোয়ার কামিজ ইত্যাদি পরে পাঞ্জাবী মেয়ে হয়ে যান এবং বলেন, আমরা তো পাঞ্জাবীই কেননা আমার বাড়ীর ছোট বউ অর্থাৎ সঞ্জয়ের স্ত্রী মেনোকা তো পাঞ্জাবেরই মেয়ে। এছাড়া তিনি নিজেকে গুজরাটের বধূ বলেও দাবি করেন কেননা তাঁর স্বামী ফিরোজ গান্ধী ছিলেন গুজরাটি। তিনি জানতেন এসবই করা হয় সাধারণ মানুষের চোখে একটু ধাঁধা লাগাবার উদ্দেশ্যে। তবু কিছুদিন ধরে তিনি এই রকমই চালাচ্ছিলেন।'

তিনি 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের' যে কাঠামোটি দাঁড় করিয়েছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন সেটা এবার স্থায়ীরূপ নিয়ে ফেলেছে। মনে হচ্ছিল যেন দেশের বহু মানুষই শ্রীমতী গান্ধীর রাজনৈতিক বক্তব্য মেনে নিচ্ছে। বহুজন বিশেষ করে সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা নির্লজ্জভাবে বলেছে, 'আমরা সবসময়ই এমন একজন শক্ত নেতা চেয়েছি যিনি আমাদের দিয়ে যা খুশী তাই করিয়ে নিতে পারেন। আমরা মোগলদের পেয়েছিলাম, পেয়েছিলাম বৃটিশদের এবং এখন পেয়েছি শ্রীমতী গান্ধীকে। তিনি কি এমন খারাপ ?'

সঞ্জয়ের লাভ হয়েছে দুইরকমের, রাজনৈতিক প্রভাব তার যেমন বেড়েছে তেমনি আবার মায়ের বদান্যতায় অর্থপূর্ণ মর্যাদাও সে লাভ করেছে। কোন মুখ্যমন্ত্রীই মনে করতেন না যে তাঁর দিল্লি সফর সফল হয়েছে যদি না সঞ্জয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হত। দিল্লি এলে একবার সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবেই। মুখ্যমন্ত্রীরা সঞ্জয়কে নিজের রাজ্যে ডাকার ব্যাপারে একে অপরের সঙ্গে রেষারেষি পর্যন্ত জুড়ে দিতেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই—তাহল সঞ্জয়কে দেখানো যে তার রাজ্যে সঞ্জয় কত জনপ্রিয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত জনসভার খরচ সরকারকেই বহন করতে হত তা বলাই বাহুল্য।

শ্রীমতী গান্ধী সত্যিসত্যিই বিশ্বাস করতেন যে সঞ্জয় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একবার চন্দ্রজিত যাদব অভিযোগ করেছিলেন যে সঞ্জয়ের সম্বর্ধনার জন্য যে সব সভা আয়োজিত হয়, সেগুলি সবই সরকারী উদ্যোগে হয়ে থাকে। এতে শ্রীমতী গান্ধী খুব রেগে যান এবং বলেন, 'সঞ্জয় যে সত্যিই জনপ্রিয়, অনেকেই এটা ভালো চোখে দেখে না।' ইউনুস অবশ্য তাঁর এই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিলেন। ইউনুস এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন যা বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ প্রবন্ধে বলা হয়েছিল যে সঞ্জয়

একটি সম্ভাবনাময় চরিত্র। আসল ঘটনা হল সঞ্জয়কে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য যারা আসতো তারা ছিল সব ভাড়াটে লোক।

কিন্তু যে ব্যাপারটা শ্রীমতী গান্ধীকেও একটু বিচলিত করেছিল তা হল মুখ্যমন্ত্রীদের পর্যন্ত বিমানঘাঁটিতে গিয়ে সঞ্জয়কে সম্বর্ধনা জানানো। সিদ্ধার্থ রায় এই বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়ুয়ার মাধ্যমে শ্রীমতী গান্ধী সকল মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে দেন যে, তাঁরা যেন তাঁর ছেলেকে সম্বর্ধনা জানাতে বিমানঘাঁটিতে অথবা রেলস্টেশনে না যান।

মুখ্যমন্ত্রীরা এই চিঠির বিশেষ কোন গুরুত্বই দেন নি। কেননা সঞ্জয় কোন রাজ্যে যাবার আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে একটি সার্কুলার আসতো এবং তাতে লেখা থাকতো যে সঞ্জয়ের সম্বর্ধনার 'যথাযথ ব্যবস্থা' হওয়া দরকার। সকলেই জানতেন এই 'যথাযথ' শব্দটির অর্থ কী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সার্কুলারে সঞ্জয়ের নিরাপত্তার জন্য কী কী করতে হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকতো। যেমন যে সব সভায় সঞ্জয় বক্তৃতা দেবে তাতে জনসাধারণকে পিস্তল রেঞ্জের বাইরে বসাতে হবে। মঞ্চের পেছনে যে পর্দা লাগানো থাকবে সেটা যেন 'বুলেট প্রুফ হয়। মঞ্চের আশেপাশে যে সব জায়গা খালি থাকবে সেগুলিতে যেন পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনেরা থাকে। এ ছাড়া তার সঙ্গে তো চব্বিশ ঘণ্টা সিকিউরিটির লোক থাকবেই।

সঞ্জয় মাঝে মাঝেই ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্সের (আই এ এফ) বিমানে ঘোরাফেরা করত। সরকারীভাবে বলা হত যে, এ হল মন্ত্রীর সফর। আসলে কিন্তু ঐ বিমানে থাকতো সঞ্জয়। ওম মেহতাই সাধারণভাবে সঞ্জয়ের জন্য বিমানের ব্যবস্থা করে দিতেন। শ্রীমতী গান্ধীর আমলের পূর্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কখনই আই এ এফ বিমান পাওয়ার অধিকারী ছিলেন না। শ্রীমতী গান্ধীই এই সুযোগ করে দেন। এখন এবং মাঝে মাঝে সেশানও স্থির করে দিতেন যে কোন্ মন্ত্রী এবার নিজের জন্য বিমান নিয়ে তা সঞ্জয়কে দেবেন। একবার কি দু'বার এমনও হয়েছে যে যাঁর নামে বিমান নেওয়া হয়েছে সেই মন্ত্রীই শেষ মুহূর্তে ঐ বিমানে যেতে পারলেন না। অবশেষে সঞ্জয় একাই বিমানে ভ্রমণ করলেন।

বেশীর ভাগ মুখ্যমন্ত্রীই জানতেন যে শ্রীমতী গান্ধী কী চান আর সেইজন্যই তাঁরা সব সময় সঞ্জয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হরিদেও যোশী রাজ্যের কোন একটা ব্যাপার নিয়ে সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করতে অনীহা প্রকাশ করায় তাঁর অবস্থা বেশ শোচনীয় হয়ে পড়ে। শেষে

তিনিও সঞ্জয়ের রাজস্থান সফর উপলক্ষে এক জয়পুর শহরেই সঞ্জয়ের সম্মানে ২০০ তোরণদ্বার নির্মাণ করে তবে নিষ্কৃতি পান। শ্রীমতী গান্ধী নিজে সঞ্জয়ের এই সফর স্থগিত করে দেন। কেননা এইভাবে সরকারী অর্থের অপচয় হলে লোকে সরকারের উপর রেগে যাবে। যাই হোক হরিদেও যোশী তাঁর আন্তরিকতার সাক্ষ্য আসল জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত শ্রীমতী গান্ধী দেওয়া সত্ত্বেও হিতেন্দ্র দেশাই তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। হিতেন্দ্র ছিলেন মোরারজীর একান্ত অনুগত লোক। কিন্তু পরে তিনি ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগদান করেন। সঞ্জয়কে কুর্নিশ না করায় পরবর্তীকালে দিল্লিতে গিয়ে হিতেন্দ্রকে ইন্দিরাজীর সাক্ষাৎ পেতে বহু কাঠখড় পোড়াতে হত। ইন্দিরার কাছে যাবার আগে যে সঞ্জয়কে কুর্নিশ করতে হয় এ বিদ্যাটাও হিতেন্দ্র শিখে নিয়েছিলেন।

গিয়ানী জইল সিং তো ধবনকে পর্যন্ত সম্মান জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সব দিক থেকে ছোট হওয়া সত্ত্বেও ধবনকে 'ধবন' না বলে জইল সিং 'ধবনজী' বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। একবার সঞ্জয় তাড়াহুড়া করে বিমানে উঠতে গিয়ে একপাটি চটিজুতো পড়ে যায়। জইল দৌড়ে গিয়ে অন্য সকলকে পেছনে ফেলে ঐ চটিজুতো বিমানে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

পি সি শেঠীকে সরিয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীপদে বসেছিলেন শ্যামাচরণ শুক্ল। সঞ্জয়ের তাঁবেদার কুলের অন্যতম ছিলেন শ্যামাচরণ। শ্যামা এমনিতেই দীর্ঘদিন চোখের আড়ালে পড়েছিলেন। সুযোগ যখন পেয়েছেন তখন পাদপ্রদীপের আলো থেকে মিলিয়ে যেতে চান না তিনি। সঞ্জয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশই যদি শ্রীমতী গান্ধীকে খুশী করার মূল্য হয় তাহলে শ্যামাচরণেরই বা সে মূল্য দিতে আপত্তি কোথায়? তিনি তো তৈরী ছিলেনই।

সঞ্জয়ের পক্ষে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার কাজটা খুব সহজ হয়ে গিয়েছিল। যুব কংগ্রেসের মাধ্যমে সে তখন তার নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়। উল্লেখ্য, সঞ্জয় ১০ ডিসেম্বর যুব কংগ্রেসে যোগদান করে এবং বড়ুয়াই তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কাজ করতে বলেন। সঞ্জয় ঢুকেই যুব কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই ভাবাপন্ন নেতা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীকে হটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে এবং সেখানে বসিয়ে দেয় নির্ভরযোগ্য এক পাঞ্জাবী মহিলাকে—নাম তার অম্বিকা সোনী।

এর পর সঞ্জয়ের মাথায় আসে একটা অন্য চিন্তা। তা হল এমার্জেন্সীকে

কিভাবে স্থায়ী করা যায়। কেননা তার মা বারবার বলতেন, এমার্জেন্সী চিরকাল চলতে পারে না। আজ হোক, কাল হোক একে প্রত্যাহার করতেই হবে। সঞ্জয়ের মাথায় ঘুরতে লাগলো যে, এমার্জেন্সী প্রত্যাহৃত হোক ক্ষতি নেই কিন্তু যে ক্ষমতা এর দ্বারা পাওয়া গেছে সেগুলিকে যেন নির্ভরযোগ্যভাবে স্থায়ীরূপ দেওয়া যায়।

সঞ্জয় আবার সংবাদপত্রের মাধ্যমেই তার কাজ শুরু করলো। শুকলা জানিয়ে দিলেন যে, প্রায় সকল সংবাদপত্র এবং সাংবাদিক এমার্জেন্সীর রীতি-নীতি মেনে চলতে শিখেছেন এবং তাঁরা এখন আর কোন সমস্যা নয়। তাঁরা এখন স্বনিয়োজিত সেন্সরশিপ অনুধাবন করছেন।

স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে যে 'আপত্তিজনক বিষয় প্রকাশ নিরোধ আইন' ছিল, একটি অর্ডিনান্সের মাধ্যমে তাকে আবার জিইয়ে তোলা হল। ঐ আইনে বলা ছিল যে আইনসঙ্গত উপায়ে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ অথবা ভালবাসাহীনতার ভাবকে উত্তেজিত করতে পারে এমন কথা, ইঙ্গিত কিম্বা এমন কোন রকম কাজ দেখা যায় বা যদি করা যায় তাহলে সেটা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ। বৃটিশ আমলে 'আপত্তিজনক বিষয়' লেখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করা হত। একজন সিনিয়র জজ এর বিচার করতেন এবং জুরি হিসাবে রাখতে হত সাংবাদিকতা ও সামাজিক ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিকে। কিন্তু গৃহীত অর্ডিনান্সে ঐ ব্যাপারটাকে সরকার একেবারে নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। সরকারই বিচার করবার, শাস্তি দেবার এবং প্রথম আপীল শোনার অধিকারী হলেন। এ সব চুকেবুকে গেলে বুকের পাটা থাকলে তারপর অপরাধী হাইকোর্টের শরণাপন্ন হতে পারেন।

সরকার সেই সমস্ত সংবাদপত্রের মুদ্রক, প্রকাশক ও সম্পাদক—প্রত্যেকের কাছ থেকে নগদ 'বস্তু' আদায়ের ক্ষমতা লাভ করলেন যারা শুধুমাত্র 'নির্দিষ্ট' বিষয়বস্তু ছাপার জন্য দায়ী। কোন বিষয় ছাপার পর সরকারী বিবেচনায় যদি 'ক্ষতিকারক' বলে চিহ্নিত হয় তাহলে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রেস বন্ধ করে দিতে পারেন।

কয়েকজন অনুগত সম্পাদক সংবাদপত্রগুলির জন্য একটি আচরণবিধি তৈরী করলেন। এ এক অদ্ভুত আচরণবিধি। তিন হাজার শব্দের এই বিবৃতির কোন একটি জায়গাতেও 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা' এই দুটি শব্দের উল্লেখ ছিল না।

সংবাদপত্রের প্রায় ৪০জন সাংবাদিকের 'অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড' বাতিল

করে দেওয়া হল। সাংবাদিকদের বলা হ'ল যে তারা নিজেদের কাজ করতে পারে—কিন্তু বড় বড় সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের ঢুকতে দেওয়া হত না এবং পার্লামেন্টের অধিবেশনে প্রবেশের অধিকারও তাদের ছিল না। (আমার নামও সেই তালিকায় ছিল যাদের অ্যাক্রিডিটেশন বাতিল হয়েছিল)।

সাংবাদিক এবং সংবাদপত্র গোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত দশ বছরের পুরনো প্রেস কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়াকেও বাতিল করে দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে নিরপেক্ষ নজর রাখাই ছিল এই সংস্থার কাজ। এই বাতিল করার ব্যাপারে কিষণকুমার বিড়লার চাপ খুব কাজে লাগে। তিনি সঞ্জয়ের খুব কাছের লোক ছিলেন এবং এই কাছের লোক হতে পেরেছিলেন মারুতি গাড়িকে রাস্তায় নামানো ও তৎসংক্রান্ত বহু ব্যাপারে অনেক অমূল্য উপদেশ দিয়ে। বিড়লাদের সংবাপত্র 'হিন্দুস্থান টাইমসের' সম্পাদক বি, জি, ভার্গিজের পদচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিলে যে মামলা ঝুলছিল কে, কে, বিড়লা ছিলেন তার প্রতিবাদী পক্ষ। বলা হয়েছিল যে ভার্গিজের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল শাসক কংগ্রেসের কিছু সদস্যের নির্দেশে যারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিলকুল বিশ্বাস করতেন না।

কাউন্সিলের আলোচনা সূত্রে কে কে বিড়লা জানতে পারেন যে, ভার্গিজের মামলার রায় তাদের বিরুদ্ধে যাবে। বিচারের রায় বিড়লার বিরুদ্ধে গিয়েও ছিল। কিন্তু সে রায় কোন দিন প্রকাশ্য আলোকের সাক্ষাৎ পায় নি। সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাতে চেয়ারম্যান তাঁর রায় লিখে ফেলেছিলেন এবং তাতে বিড়লা ও হিন্দুস্থান টাইম্‌সের অপর একজন ডিরেক্টরকে অভিযুক্ত করার কথা ছিল।

সেই রায়ের খসড়ায় বলা হয়েছিল যে, ভার্গিজকে পদচ্যুত করার ঘটনায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সম্পাদকীয় স্বাতন্ত্র্যকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। বিড়লা ও ভার্গিজের মধ্যে যে পত্রালাপ হয় সেগুলি প্রকাশ করতে না দেওয়াতেও কাউন্সিল বিড়লার নিন্দা করেন। প্রেস কাউন্সিল এই রায় প্রকাশ করতে পারেন নি, কারণ ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রেস কাউন্সিলকেই বাতিল করে দেওয়া হয়।

সংসদীয় কার্যবিবরণীর রিপোর্ট প্রকাশের ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলির যে বিশেষ অধিকার ছিল তা-ও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সঞ্জয়ের খুব ভয় ছিল যে নাগরওয়ালা, আমদানী লাইসেন্স ও মারুতি কেলেঙ্কারী সম্পর্কে সংসদে যেসব কথা বলা হয়েছিল তা হয়তো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে যাবে।

সে মোটেই চাইছিল না যে আবার ধুলো ওড়ানো হোক। মজার ব্যাপার হল সঞ্জয়ের পিতা ফিরোজ গান্ধীই একদিন একটি বিল এনে সংসদের উভয় কক্ষের কার্যবিবরণী যাতে স্বাধীনভাবে সংবাদপত্রে ছাপা যায় তার ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী এক সময় এই বিলটিকে বলবৎ রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সঞ্জয় বাদ সাধলো এবং সে তার নিজস্ব পথ ধরলো। সে তার মাকে সাফ বলে দিল যে, প্রশাসনিক কাজকর্মে সেন্টিমেন্টের কোন দাম নেই।

সংবাদপত্র যখন সরকারী গেজেটে রূপান্তরিত হয়েছে এবং স্বনিয়োজিত সেন্সরশিপের ঠ্যালায় যখন জয়প্রকাশের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বুলেটিনও সরকারী অনুমতি ব্যতিরেকে ছাপা হচ্ছে না তখনও শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর ছেলে খুশী হতে পারছিলেন না। 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' গোষ্ঠীর পত্রিকাগুলিকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছিল না। একমাত্র পথ ছিল এই পত্রিকাগুলি কিনে নেওয়া। এবং রামনাথ গোয়েঙ্কাকে বলাও হয়েছিল যে তিনি যেন তাঁর প্রকাশন সাম্রাজ্যকে বিক্রী করে দেন। কিন্তু তাঁর পক্ষেও এই রকম একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থাকে বিক্রী করে দেওয়া খুব সহজ ছিল না। কেননা দীর্ঘদিনের সাধনায় একটু একটু করে তৈরী হয়েছিল এই বিরাট সংস্থা। তিনি এই প্রস্তাবকে চিন্তা করার জন্য খানিকটা সময় চেয়ে আপাততঃ ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়তো এই আশা ছিল যে ইতিমধ্যে সরকার হয়তো তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করবেন। তাঁকে চিন্তা করার সময় দেওয়া হল বটে কিন্তু তিনি দেখলেন সরকারী মনোভাবে কোন পরিবর্তন আসেনি। তাই তিনিই সরকারী প্রস্তাব মেনে নিলেন। বললেন, তিনি তাঁর 'প্রকাশন সাম্রাজ্য' বিক্রী করতে রাজী আছেন। কিন্তু একটি সর্ত আছে। তাহল এজন্য তাঁকে উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে এবং পুরো টাকাটাই তার 'হোয়াইট মানিতে' বা সোজা কথায় ব্যাঙ্কের চেকে চাই। তিনি জানতেন এ সর্ত মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

গোয়েঙ্কার ব্যাপারটা ক্রমেই বেশ ঘোরালো হয়ে উঠছিল। এই সমস্যা মেটাতে সরকারকেও বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। সেইজন্য সরকারপক্ষ পরবর্তী প্রয়াস হিসাবে স্থির করলেন গোয়েঙ্কা সংস্থার তেরো জন ডিরেক্টরকে নিজেদের তাঁবে আনতে হবে। সঞ্জয় পুরো বোর্ড অব ডিরেক্টরস্‌কেই পরিবর্তন করে দিতে চাইল এবং নতুন বোর্ডে সদস্য করতে চাইল মাত্র ছয় জনকে। তার মধ্যে সঞ্জয়ের প্রস্তাব অনুসারে চেয়ারম্যান হবেন কে কে বিড়লা এবং অন্যতম ডিরেক্টর হবে কমল নাথ যে দুন স্কুলের সময় থেকে সঞ্জয়ের বন্ধু। এর ফলে বোর্ড অব

ডিরেক্টরসের মধ্যে সরকারী প্রতিনিধিদের প্রাধান্য সুনিশ্চিত হয়ে যায়। নতুন বোর্ডের প্রথম কাজ হল এডিটর-ইন-চীফ মুলগাঁওকরকে বাধ্যতামূলক ভাবে অবসর গ্রহণ করিয়ে দেওয়া। যুক্তি হল, তার অবসর গ্রহণের বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু ওটা কোন কারণ নয়—কারণ হল সরকার ওখানে নিজেদের লোককে বসাতে চাইছিলো। আমাকে এবং অজিত ভট্টাচার্যকেও সরিয়ে দেবার সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তাতে বাধা দেন গোয়েঙ্কা নিজে।

সরকার তবুও ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের 'সুর' মোটেই পছন্দ করছিলেন না। শুক্লা সমস্ত সরকারী বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং গোপন সার্কুলার পাঠিয়ে সকল সরকারী, আধা সরকারী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন এক্সপ্রেস গোষ্ঠীর সংবাদপত্রকে কোন বিজ্ঞাপন না দেয়। ফলে প্রতিমাসে ক্ষতির পরিমাণ দাড়ালো ১৫ লক্ষ টাকা।

সংবাদপত্রের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্বেও শুক্লা সাংবাদিকতার কাঠামোকেই পরিবর্তন করে দিতে চাইলেন যাতে সংবাদপত্র শিল্প অতঃপর জনগণ, সমাজ ও দেশের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। এ হল সংবাদ-পত্রে তাঁবেদার করে রাখার কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা যা এমারজেন্সী চলাকালে প্রাপ্ত ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল থাকবে না।

এই উদ্দেশ্যেই দুটি ইংরাজী সংবাদ সরবরাহ সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া ও ইউনাইটেড নিউজ অব ইণ্ডিয়া এবং দুটি হিন্দী সংবাদ সরবরাহ সংস্থা হিন্দু-স্থান সমাচার ও সমাচার ভারতী এই চারটিকে নিয়ে একটি মাত্র নতুন সংস্থা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। এর সুবিধা হল একটি মাত্র স্থানে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করলেই চলবে। শুক্লা সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মালিকদের বিরুদ্ধে নিজের জোর খাটিয়ে শেষ পর্যন্ত উপরোক্ত চারটি সংস্থার মিলনে সমাচার নামে একটি সংবাদ সংস্থা গঠন করলেন। কিছু ডিরেক্টর এবং পদস্থ কর্মচারী এই ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। তখন শুক্লা সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলিকে আকাশবাণী যে অর্থ দিত তা বন্ধ করে দিলেন এবং সংবাদ সংস্থার এ ছিল বিরাট আয়ের উৎস স্বরূপ। ফলে সকলেই 'সমাচার'-এর জন্মকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন।

সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৭৬-এর জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে জানিয়ে দেওয়া হল যে, নতুন সংবাদ সংস্থার জন্য ১৫ জনের যে পরিচালন পরিষদ গঠিত হবে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি তাদের নাম ও পরিষদের চেয়ার-ম্যানের নাম অচিরেই ঘোষণা করবেন। রাষ্ট্রপতিকে এই অধিকার দেওয়া হল

যে, তিনি যদি মনে করেন যে, সংবাদ সংস্থার কাজ সন্তোষজনক ভাবে চলছে না তাহলে পরিচালনা পরিষদের বিরুদ্ধে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন যে, রাষ্ট্রপতির ব্যবস্থা গ্রহণের অর্থ এই করা হবে যে সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করছেন। সেইজন্য সরকার পক্ষ আগেভাগেই প্রচার শুরু করে দিলেন যে সংবাদপত্র জগতে যে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী আছে তাকে ভেঙে দেওয়ার জন্যই সরকার এই ব্যবস্থা নিচ্ছেন। ১ ফেব্রুয়ারী থেকে নতুন সংবাদ সংস্থা 'সমাচারেরর' জন্ম হয়।

এদিকে সংবাদপত্র জগতের পুনর্গঠন যখন চলছিল তখন সঞ্জয় আরেকটি দিকে নজর দিল। আর সেটা হল সরকারের কাঠামোতে পরিবর্তন করা। সে তার মাকে সরাসরি বলতো যে তার উপর যদি সব কিছু ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সে সরকারের খোল নল্‌চে পর্যন্ত বদলে দিতে পারে। সেই সূত্রেই সে মায়ের কাছে দাবি করলো যে তাঁর ৫৪ সদস্যের কেন্দ্রীয় মন্ত্রি পরিষদের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশকে হটিয়ে দিয়ে সেখানে যুব কংগ্রেসের সদস্যদের ঢোকাতে হবে। ইতিমধ্যেই সে উচ্চ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছিল। বড় বড় অফিসারদের ১ সফদরজং রোডে ডেকে পাঠানো হতে থাকলো। সেখানে হয় সঞ্জয় না হয় ধবন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তারপর সিদ্ধান্ত নিত যে তাকে রাখা হবে কি হবে না।

কিন্তু এটাই সব নয়। সঞ্জয় তার লোকেদের কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মন্ত্রিসভায় ঢুকিয়ে দিতে চাইছিল। কেননা বর্তমান অবস্থায় সে মোটেই নিশ্চিত হতে পারছিল না যে তার নির্দেশ পুরোপুরি পালিত হবে কি না। বংশীলাল তার নিজের লোক—হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট আনুগত্যসম্পন্ন। বংশীলালকে কেন্দ্রীয় কেবিনেটে ঢুকিয়ে দেওয়া গেছে। মন্ত্রিসভার মধ্যেও সে কঠোরতা অবলম্বন করতে চাইছিল এবং বংশীলালকে সে কড়া মানুষ হিসাবে ওখানে ঢুকিয়েছিল। বংশীলালের জন্য প্রতিরক্ষা দপ্তরটিও সে আদায় করে দিয়েছিল। কেন্দ্রের মন্ত্রী হলেও বংশীলাল তাঁর মূল ঘাঁটি হরিয়ানা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিলেন না। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বসানো হল বনারসী দাসগুপ্তাকে। (বংশীলালই একে চয়ন ও মনোনয়ন করেছিলেন)। বনারসী দাসকে স্পষ্ট কথায় বুঝিয়ে দেওয়া হল যে হরিয়ানার আসল মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন বংশীলালই, বনারসী দাসকে কেবল আজ্ঞাবহ হিসেবে থাকতে হবে।

আশি বছর বয়স্ক দীক্ষিতকে মন্ত্রিসভা থেকে হটানোর ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধীকে সঞ্জয়ের ইচ্ছার সামনে মাথা নোয়াতে হয়। শ্রীমতী গান্ধীর নিজের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন ছিল। কেননা ১৯৭১ সালের নির্বাচনের সময় থেকে দীক্ষিত তাঁর দলের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ ও বণ্টন করেছেন। শেষের দিকে তাঁদের মধ্যে কিছুটা মন কষাকষি হয়। কারণ দীক্ষিতের পুত্রবধূ তখন প্রশাসনিক ব্যাপারে নাক গলাতে থাকে। শ্রীমতী গান্ধী প্রশাসনে এই অনধিকার হস্তক্ষেপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য দীক্ষিতের ছেলেকে (ছেলে সিভিল সার্ভিসে ছিল) ট্রান্সফার করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাহলে কী হয় ছেলে ট্রান্সফার হলেও ঐ অবাঞ্ছিত পুত্রবধূ শ্বশুরকে সাহায্য করার জন্য দিল্লিতেই থেকে যায়। পুত্রবধূদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয় তার কিছুটা অভিজ্ঞতা শ্রীমতী গান্ধীর ছিল। কিছুকাল আগে আরেক পুত্রবধূ অর্থাৎ কমলাপতি ত্রিপাঠীর 'বহুর্জী'র বহু ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রী কেড়ে নিয়েছিলেন। কমলাপতি ত্রিপাঠী তখন দিল্লিতেই ছিলেন।

কেবিনেট থেকে হটিয়ে দেবার পর খুব বেশীদিন তাঁকে বসে থাকতে হয় নি—অবিলম্বে তাঁকে কর্নাটকের রাজ্যপাল করে দেওয়া হয়। এতে অন্যান্য মন্ত্রীরা বিশেষ আঘাত পান। তাদের চিন্তা হল দীক্ষিতের মত লোকেরও যদি মন্ত্রিত্ব যায়—তাহলে তারা তো কোন্ ছার। ফলে তাদের ভেতর ক্রীতদাসসুলভ ব্যবহার আরও বেশী করে প্রকট হয়ে ওঠে।

এই সূত্রে তিনি একটা পুরনো ঝগড়াও মিটিয়ে ফেললেন। স্বরণ সিংকেও তিনি এক ধাক্কায় কেবিনেটের বাইরে বের করে দিলেন। স্পষ্টতঃই প্রধানমন্ত্রী সেই দিনগুলির কথা ভুলতে পারছিলেন না। যখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বেরুবার পর প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থাসূচক প্রস্তাবের ওপর যে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হল তাতে সই করতে এই স্বরণ সিং পুরো একটা দিন দেরী করে ফেলেছিলেন। এই সুযোগে তিনি স্পীকার ধীলনকে এবং বলিরাম ভগতকেও স্বপদ থেকে হটিয়ে দিলেন। বলিরাম অবশ্য মন্ত্রীত্ব যাবার পরও ইন্দিরা পরিবারকে একনিষ্ঠভাবে সেবা করে গেছেন। ভগত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী। ধীলনের স্পীকার পদটা গেলেও শিখ বলে সর্দার স্বরণ সিংয়ের জায়গায় এনে তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়।

সার ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে শ্রীমতী গান্ধী পি, সি, শেঠিকে নিয়ে আসেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হবার পরই শেঠী প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে যান। দীক্ষিত চলে যাবার পর তাঁর কাজগুলো কাউকে

না কাউকে করতেই হত। অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ হিসাবে বড় বড় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। শেঠী সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে দেন।

কেন্দ্রে নিজের লোক বসিয়ে দিয়েই সঞ্জয় খুশী ছিল না। রাজ্যগুলিতেও তার নিজস্ব মুখ্যমন্ত্রী দরকার ছিল। সঞ্জয় ঝাঁটা হাতে করে প্রথমে উত্তরপ্রদেশ সাফাইয়ের কাজে লাগলো এবং প্রথমে সে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে এইচ, এন, বহুগুণাকে হটিয়ে দিয়ে উৎকৃষ্ট সাফাই কর্তার পরিচয় দিল। মা ও ছেলে উভয়েই এই পরিবর্তনের পক্ষে ছিল। বহুগুণা তখনই ওদের নজর থেকে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা ওঁরা জেনে ফেলেছিলেন। তাঁরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন এইজন্য যে তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, বহুগুণা হয়তো নিজেকে জাতীয় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং সুযোগ পেলে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের বিকল্পও হতে চান। ১৯৭৪ সালে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার নির্বাচনের পর জনগণকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য যে পোস্টারটি ছাপা হয়েছিল তাতে বহুগুণার নিজের ছবি ছিল। এই একটা পোস্টারই বহুগুণার উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। কেননা শ্রীমতী গান্ধীও উত্তরপ্রদেশের লোক, তবু ছবি না ছাপা হওয়াতেই বহুগুণার আসল মতলবটা ধরা পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে জুন, ১৯৭৫-য়েই বহুগুণাকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এমার্জেন্সী ঘোষিত হওয়ায় এই ব্যাপারটা একটু পিছিয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, তাকে জুনের আগে চলে যেতে হত। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্টের মামলায় তিনি হয়তো খানিকটা প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন এই আশা করেই তাঁকে আরও আগে বিদায় দেওয়া হয় নি।

এরপর থেকেই তাঁদের হাতে বহুগুণাকে হটাবার পক্ষে আরও কড়া যুক্তি এসে যায়। শ্রীমতী গান্ধীর হয়ে উত্তরপ্রদেশের কাজকর্ম দেখাশুনা করছিলেন যশপাল কাপুর। তিনি আবিষ্কার করেন যে, বহুগুণা চারজন তান্ত্রিককে ডেকে এনে তাদের দিয়ে এক মহাযজ্ঞ শুরু করেন যার উদ্দেশ্য হল শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর ছেলে যেন চিরতরের জন্যে উচ্ছন্নে যান এবং সেজন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা। এই চারজন তান্ত্রিকের দুজন আসল ঘটনার কথা স্বীকার করে। ওদিকে কাপুর মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পি সি শেঠীর সাহায্যে অপর দুজন তান্ত্রিকেরও সন্ধান পান এবং তাদের মিসায় গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করে।

( বহুগুণা পরে আমাকে বলেন, এই পুরোটাই একটা উদ্ভট ব্যাপার। যে সব তান্ত্রিকের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন তেমন কোন তান্ত্রিকের অস্তিত্বই

নেই। হয়তো কোন পুরনো বৈদ্যকে অথবা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসককে তাঁরা তান্ত্রিক হিসাবে ধরে নেন। অথচ এই বৈদ্য কমলাপতি ত্রিপাঠীরও চিকিৎসা করেন।)

শ্রীমতী গান্ধী বহুগুণাকে পদত্যাগ করতে বলেন এবং ২৯ নভেম্বর তিনি তা করেন। মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগের পর বহুগুণা শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাও করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। তিনি কিছুতেই বহুগুণার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হন নি। বহুগুণা কিছুতেই তাঁর নিজের বক্তব্য নিজমুখে শ্রীমতী গান্ধীকে জানাতে না পেরে চিঠি লিখে জানাবাব চেষ্টা করেন। জানা গেছে ঐ চিঠির সেন্সর করা কিছুটা অংশই কেবল প্রধানমন্ত্রীর হাতে দেওয়া হয়েছিল।

বহুগুণার জায়গায় সঞ্জয় এন ডি তেওয়ারীকে বসালে এন, ডি, তেওয়ারীর নয়াদিল্লি যাতায়াত এত বেড়ে গিয়েছিল যে লোকে তাঁকে এন ডি না বলে নয়াদিল্লি তেওয়ারী বলে ডাকতো। ইউ পির সমস্ত কেন্দ্রীয় নেতাই তেওয়ারীর মুখ্যমন্ত্রী হবার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু যেখানে সঞ্জয় চায় যে তার লোক ঐ আসনে বসবে এবং তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সঞ্জয়ই উত্তরপ্রদেশ শাসন করবে তখন কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে এতে আপত্তি জানায়। সঞ্জয় যখনই লখ্‌নৌ গেছে তখন রাজ্য মন্ত্রিসভার সব সদস্য তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অনেকটা কুচকাওয়াজের নিয়মে। অতঃপর তার নির্দেশেই চলেছে উত্তরপ্রদেশের শাসনব্যবস্থা।

শ্রীমতী গান্ধী মাঝে মাঝেই এই রকম পরিবর্তন করতেন। তাঁর সরকারী ব্যবস্থায় কিছু নূতনত্ব এসেছে এটা বোঝাবার জন্যই হয়তো এমন পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এতে ভালো হয় নি না দেশের, না-দলের। কেন্দ্রে ও রাজ্যে এবারকার রদবদলের পটভূমি ছিল একটু অন্য রকম। আস্থাবানদের পুরস্কার ও সন্দেহজনক ব্যক্তিদের শাস্তিপ্রদান এই ছিল এই রদবদলের মূল কথা। যাই হোক না কেন, এ ছিল স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা—দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে কিছু একটা করার প্রয়োজন ছিল।

যাই হোক তাঁর নজর নিবদ্ধ হয়েছিল সংবিধানের উপর। কেননা সংবিধানের সংস্থান ও পদ্ধতি অনুসারে বিরোধীদের হাতেও প্রচুর ক্ষমতা ছিল যার সাহায্যে তারা প্রতি পদক্ষেপে বাধা সৃষ্টি করে সরকারকে উত্যক্ত এবং 'জটিল সমস্যার সৃষ্টি করতো।' তিনি ভেবে দেখলেন, সরকারের যেমন নিজ ইচ্ছানুযায়ী কর্মসূচী স্থির করার অধিকার আছে তেমনি বিরোধীরাও তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারে। সেইজন্য তিনি বলতে শুরু করলেন যে,

জনসাধারণের বহু অধিকার যেমন আছে তেমন কিছু কর্তব্যও আছে। তিনি এই কর্তব্যগুলির একটি তালিকা তৈরী করে বললেন, এগুলি মেনে না চললে শাস্তি দেওয়া হবে।

এটা তাঁর পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এ ছিল একান্ত বাইরের ব্যাপার। তাঁর মনযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল অন্য একটি বৃহত্তর বিষয়ের দিকে। তা হল ভারতে ফ্রান্সের মত রাষ্ট্রপতি নির্ভর সরকার গঠন করা উচিত হবে কিনা? ফ্রান্স সম্পর্কে ইন্দিরা সব সময়ই প্রশংসাসূচক মনোভাব ব্যক্ত করে থাকেন। সংসদীয় পদ্ধতির গতি খুবই মন্থর, মাঝে মাঝে এর দ্বারা কোন ফললাভও হয় না এবং এই পদ্ধতিতে উচ্চাসনে বসা মানুষটি কোনদিনই স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারে না।

এই পদ্ধতিকে সঞ্জয়ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমর্থন জানিয়েছিল। কেননা রাষ্ট্রপতি নির্ভর পদ্ধতিতে সমস্ত ক্ষমতা থাকে একজন মানুষের হাতে। সংসদ বা মন্ত্রিসভার কোন নিয়ন্ত্রণ তার উপর থাকে না। এমন কি অনাস্থাসূচক ভোটাভুটির কোন ভয়ও এই ব্যবস্থায় নেই। সঞ্জয় আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ সংবিধানেরই খোল নলচে বদলে দেবার উদ্দেশ্যে একটি নিয়মতন্ত্র গঠনকারী পরিষদ গঠনেরও প্রস্তাব দেয়।

গোখ্‌লে এবং অন্যান্যরাও মাঝে মাঝে বিচারপদ্ধতির মৌলিক পরিবর্তনের কথা বলে আসছিলেন। কিন্তু তারা কোনদিন মন খুলে একথা বলেন নি যে, তাঁরা আসলে কি চান।

বাস্তবিক, সংবিধান পরিবর্তনের পক্ষে তখন এক 'প্রগতিশীল' মতবাদ কাজ করছিল যাতে সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি আরও 'সুবিচার' করা যায়। তাঁরা সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারভূক্ত রাখতে চাইছিলেন না। আবার সংসদের উপর সংবিধানের ব্যাখ্যাকারী হিসাবে বিচারবিভাগের প্রাধান্যও তাঁরা মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক যে 'প্রগতিশীলরা' সংবিধানের আমূল পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা সংবিধানের দরজাকে পুরোপুরি খুলে রাখার বিপক্ষে ছিলেন।

শ্রীমতী গান্ধীকে ঘিরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কিন্তু বার বার প্রেসিডেন্ট নির্ভর শাসন ব্যবস্থার জন্য চাপ দিচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল এর ফলে দেশ সুশাসিত হবে। কিন্তু 'প্রগতিবাদীরা' এর বিপক্ষে ছিলেন। তারা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা ব্যক্তিবর্গের এই যুক্তি মোটেই মেনে নিতে পারছিলেন না যে, এমার-

জেন্সীর মাধ্যমে আগত 'শৃঙ্খলা' এবং 'শান্তি' কেবল মাত্র 'রাষ্ট্রপতি নির্ভর শাসন ব্যবস্থার দ্বারাই' চিরস্থায়ী করা যাবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা শ্রীমতী গান্ধীকে দেন লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার এবং তাঁর নিকট আত্মীয় বি, কে, নেহরু। তিনি ফরাসী দেশের ন্যায় সংবিধান তৈরীর কথা বললেন যেখানে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিই থাকবেন সব কিছুর শীর্ষে। বি, কে, নেহরু শ্রীমতী গান্ধীকে স্তুগল করতে চাইছিলেন।

বোম্বাইয়ের রজনী প্যাটেল এই চিন্তাটাকেই আরেকটু প্রসারিত করে একটি বিরাট 'নোট' আকারে সেটা প্রচার করলেন। গুপ্ত প্রচার পত্র যেমন-ভাবে বিলি হয় এ-ও যেন তেমন ভাবেই বিলি হল। কেউ এটাকে নিজের বলে দাবি করলেন না এবং কেউ এ সম্পর্কে খুব বেশী উৎসাহও দেখালেন না। তবে এই 'নোটটি'র সঙ্গে ১৯৬৯ সালে বাঙ্গালোর এ আই সিসিতে প্রদত্ত শ্রীমতী গান্ধীর 'বিক্ষিপ্ত চিন্তার' অনেক সামঞ্জস্য ছিল। ঐ বছরই কংগ্রেস দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

ঐ নোটে বলা হয়, 'গত পঁচিশ বছর ধরে এদেশে গণতান্ত্রিক কার্য পদ্ধতির যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সংবিধানকে পরিবর্তন করা খুবই দরকার। 'ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত যে অবাধ ও ন্যায় সঙ্গত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ সময় যেন প্রশাসন বিভাগ জনগণের স্বার্থে নির্বিঘ্নে কাজ করে যেতে পারে। এর ফলে প্রশাসন বিভাগের যিনি মুখ্য অধিকর্তা থাকবেন তিনি কোন প্রকার বিপদ আপদ ভয় বা অনুগ্রহ ছাড়াই নিজের বুদ্ধি ও বিবেককে সম্পূর্ণ-রূপে দেশের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারেন।'

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পরামর্শও দেওয়া হল রাষ্ট্রপতি বা তদর্থে মুখ্য অধিকর্তা দেশের সকল মানুষের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হবে। তাঁর নির্বাচন মার্কিন প্রেসিডেন্টের মত ইলেক্‌টোরাল কলেজের মাধ্যমে হবে না। তবে তাঁর কার্যকাল হবে ছয় বছর—সংসদের আয়ুও ঐ এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হবে। 'যেহেতু আমাদের রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন সেইহেতু তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাও মার্কিন প্রেসিডেন্টের তুলনায় অনেক বেশী থাকবে।'

রাষ্ট্রপতি নির্ভর শাসন ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চলতে থাকলেও বেশী কংগ্রেসী এই টোপ গিলতে চান নি। এমারজেন্সীর বিরুদ্ধে এরা একটা

কথা না বললেও, এমারজেন্সীর পীড়ন সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট সচেতন। সুতরাং ঐ অবস্থাকে তাঁরা মোটেই চিরস্থায়ী করতে চান না। তাঁদের ভয় ছিল যে একবার রাষ্ট্রপতি নির্ভর শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হলে ঐ দমন পীড়নের রাজত্বই চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

শ্রীমতী গান্ধী বিষয়টাকে এখানেই পরিত্যাগ করলেন এবং এর পরিবর্তে বরং তিনি সংবিধানের খোল নলচে বদলানোর কাজেই বেশী উৎসাহ দেখালেন। পরে যদি কখনও সম্ভব হয়, রাষ্ট্রপতি নির্ভর শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করে দিলেই চলবে।

৩০ ডিসেম্বর চণ্ডীগড়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই মর্মেই প্রস্তাব গৃহীত হল যে, সংবিধানকে এমন ভাবে সংশোধন করা হোক যাতে, 'দেশের মানুষের বর্তমান চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে সংবিধান আরও বেশী কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।'

শ্রীমতী গান্ধী যদি নিজে না চেয়েও থাকেন তবু সঞ্জয় জরুরী অবস্থার সময়কে আরও প্রলম্বিত করতে চাইছিল এবং ১৯৭৬ সালের মার্চে যে নির্বাচন হবার কথা ছিল সঞ্জয় সেটাও অনির্দিষ্ট কাল স্থগিত রাখার পক্ষপাতী ছিল। কিছু-কাল ধরে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে প্রচার করা হতে থাকে যে, 'এমার-জেন্সীতে যে লাভ' হয়েছে তাকে স্থায়ী করতে হবে। ইউনুস জিজ্ঞাসা করলেন, 'নির্বাচনের জন্য এত তাড়া কিসের?' নির্বাচন একটা বিলাসিতা বৈ তো কিছু নয়। ঐ বিলাসিতা চার-পাঁচ বছর পর করলেও কোন ক্ষতি হবার নেই।

সঞ্জয়ের ইঙ্গিত পেয়েই, বংশীলাল গাইতে শুরু করেন যে এখন নির্বাচন নয়। তিনি কংগ্রেস এম-পিদের বললেন যে, জনসাধারণ নির্বাচনের চেয়ে জীবিকা উপার্জন সম্পর্কেই বেশী চিন্তিত। 'জনসাধারণকে খাদ্য দিন, দেখবেন, কোন রকম ঝামেলা না করেই তাদের শাসন করতে পারছেন। শ্রীরামচন্দ্রের চটি জুতো সিংহাসনে রেখে ভরত চোদ্দ বছর পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেছিলেন।'

সিদ্ধার্থ কর্তৃক উত্থাপিত একটা প্রস্তাব অধিবেশনে গৃহীত হয়: 'সাধারণ মানুষের জন্য আর্থিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার জন্য কংগ্রেস তার সংসদীয় দলের উদ্দেশে এই আহ্বান জানাচ্ছে যে তাঁরা যেন সংবিধানের ৮৩ নম্বর ধারা অনুসারে বর্তমান লোকসভার বয়স বাড়াবার জন্য বিল উত্থাপন করেন।'

ইনিই সেই সিদ্ধার্থ যিনি জরুরী অবস্থার চিন্তাকে একটি আইন সম্মত রূপ দিয়েছিলেন।

জরুরী অবস্থায় কার্যকাল বাড়াবার জন্যও অধিবেশন সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করে। শ্রীমতী গান্ধী উপস্থিত প্রতিনিধিদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এমারজেন্সী প্রত্যাহার করে নেওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। দেশের মধ্যে ঐক্য স্থাপন ও দেশের স্বনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকার মত অবস্থা এসেছে কি না সেটা আগে দেখা হবে।

এই ভাবেই শ্রীমতী গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রীরা এবং সরকারী অফিসাররা এক একটি কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী গড়ে তুলতে প্রয়াস পায়। এ সবের কোন সমালোচনাও ছিল না—কোন বিরোধিতাও ছিল না। তাঁদের ইচ্ছাই ছিল, আইন। তাঁদের মুখ হতে একটি বাক্য নিঃসৃত হবারই তখন প্রতীক্ষা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তা পালিত হত। কারণ ওদের মতে সরকারী যন্ত্র তখন হয়ে উঠেছিল 'কার্যকর প্রশাসন'।

এর পরেই কেবিনেট মিটিংয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় এবং সেই অনুযায়ী নির্বাচন এক বছরের জন্য স্থগিত রাখবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোন মন্ত্রীই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন নি। প্রকৃত পক্ষে বংশীলাল তো হাসতে হাসতে এই কথা বলেন যে নির্বাচন যেন পাঁচ বছরের জন্য স্থগিত করে রাখা হয়।

কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে সঞ্জয়কে আনুষ্ঠানিক ভাবে সকলের সামনে নেতা হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। এ ছিল এক ক্ষুদ্র আনুষ্ঠানিকতা। পুত্র তো আগে থেকেই সব কিছু দখল করে রেখেছিল। মায়ের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। প্রায় দুই দশক আগে শ্রীমতী গান্ধী যখন কংগ্রেসের সভাপতি হন তখন তাঁর পিতা নেহরু তাঁর সামনে মাথা নত করে বলেছিলেন, 'আমাদের সভাপতি।'

কংগ্রেস প্যাণ্ডেলের মধ্যে মাত্র তিনটি ঘর—একটি শ্রীমতী গান্ধীর, দ্বিতীয়টি কংগ্রেস সভাপতির এবং তৃতীয় ঘরখানা নির্দিষ্ট ছিল সঞ্জয়ের জন্য। সঞ্জয়ের ঘরের সামনেই ভিড় সব চেয়ে বেশী ছিল। তার উপর হীন চাটুকারিতা বর্ষণের মাত্রা খুব বেশী ছিল। কেন না কংগ্রেসের সকলেই বুঝে গিয়েছিল যে, সঞ্জয়ই হচ্ছে আসল লোক যে হবে এখানকার ভবিষ্যত রাষ্ট্র নিয়ন্তা। সঞ্জয় যেখানেই যাচ্ছিল তার সঙ্গে কংগ্রেসীদের ভীড় লেগেছিল। সঞ্জয়ের জনপ্রিয়তার আরও প্রমাণ শ্রীমতী গান্ধী স্বচক্ষে এখানে দেখেন। তিনি অবশ্য এটা বুঝতে চাইলেন না যে, এই 'জনপ্রিয়তা' প্রকৃত পক্ষে তাঁরই জনপ্রিয়তা—সঞ্জয় তাতে ভাগ বসিয়েছে। কৃত্রিম ভাবে বিশ্বাস করানোর ঐ আবহাওয়া এমনই ছিল

যে কেউ আর আসল সত্যটা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করলো না। কোন সংবাদ পত্র বা কোন মঞ্চ এমন ছিল না যেখান থেকে এই সত্য কথাটা প্রচার করা যায়।

গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টে বলা হল যে, সংবাদ পত্রে সংবাদ ছাপতে না দেওয়ায় বুদ্ধিজীবীরা 'বিষণ্ণ' এবং তারা অগত্যা বি বি সি ও ভয়েস অব আমেরিকার বেতার প্রচার শুনতে আরম্ভ করেছে।

বুদ্ধিজীবীদের ওপর সঞ্জয়ের খুব রাগ ছিল সে কথা সে বার বার বলেছেও। ফলপ্রসূ কাজ করার একটা নিজস্ব পদ্ধতি সঞ্জয় তৈরী করেছিল।

যেসব শিল্পপতি, ব্যবসায়ী অথবা সরকারী অফিসার 'অবাধ্যতা' করতেন তাদের বাড়িতে হানা দেবার জন্য এবং তাদের দশ বছরের আয়করের হিসাব খতিয়ে দেখার জন্য সঞ্জয় প্রণব মুখার্জীর মাধ্যমে আয়কর, আবগারী ও এনফোর্সমেণ্ট বিভাগকে আদেশ দিত। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে যারা একটু স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ দেখাতে চাইতো—সঞ্জয় ওম মেহতার মাধ্যমে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোকে ঐ লোকগুলোকে উত্যক্ত করার কথা বলতো। আয়কর বিভাগ, আবগারী বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় তদন্তব্যুরোর প্রধান ব্যক্তি যাঁরা হতেন তাঁরা সকলেই ছিলেন সঞ্জয়ের আস্থাভাজন ব্যক্তি এবং সঞ্জয়ের ইচ্ছা তাঁদের কাছে আদেশ স্বরূপ ছিল। সঞ্জয়ও এদের চাকরিকালের বৃদ্ধি, মর্যাদাবৃদ্ধি এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির প্রতি উপযুক্ত নজর দিত।

যে বাহিনীর উপর সঞ্জয় এবং শ্রীমতী গান্ধী উভয়কে নির্ভর করতে হত সেই পুলিশ বাহিনীর প্রতি তাঁরা বিশেষ নজর নিতেন। ২৫ জুন সকালে, সরকারী ভাবে জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে স্বরাষ্ট্র সচিবের অফিস ঘরে যে সভা হয় সেখানে প্রথমেই বলে দেওয়া হয় যে, পুলিশের 'মনোবল' যাতে উঁচু থাকে সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। এর পরেই তাদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সামরিক বাহিনীর লোকদের ক্ষেত্রে শুধু মাইনেই বাড়ানো হয় না তাদের অবসর গ্রহণের বয়সও বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ এবং অন্যান্যরা বেশ 'ভালো কাজের' নজীর রাখে যাতে সর্বত্র 'শান্তি' স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন যেন কোন কিছুতেই খুব আনন্দিত হয় না। ঝড়ের আগে যে এই রকম একটা থমথমে ভাব থাকে একথা তো সকলেই জানে। কমপক্ষে শ্রীমতী গান্ধীর সচিব দার জনে জনে ধরে ধরে একথা জিজ্ঞাসা করেছেন যে 'শান্তি' সম্পর্কিত গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট সত্য কিনা।

একজনও এর বিপরীত কোন কথা বলে নি। শ্রীমতী গান্ধীও ইদানিং নিজে যা শুনতে ভালবাসেন তেমন কথা কেউ বললে আগ্রহ সহকারে শুনতেন। তাঁর মনেও মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠতো যে কথা তিনি শুনছেন তা সত্য এবং নির্ভরশীল তো? কেননা অজানা ভয়ে তখন সকলেই শঙ্কিত ছিলেন।

৫ জানুয়ারী সরকার পক্ষ সংসদের সামনে কংগ্রেস পার্টি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যাতে জরুরী অবস্থার আয়ু বৃদ্ধি করা এবং মার্চের পরিবর্তে নির্বাচন এক বছরের জন্য স্থগিত রাখার কথা বলা হয়েছিল।

বিরোধী পক্ষের বেশীর ভাগ সদস্যই সংসদের প্রথম দিনে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণ বয়কট করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর বক্তৃতায় গরীবদের সাহায্যের জন্য নূতন কর্মসূচী গ্রহণ, জোরদার ভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর রূপায়ন, এবং কিছু কিছু ব্যবসার ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার প্রভৃতি বিষয়ের উপর জোর দেয়। সরকার বিরোধী সদস্যরা এরপর এসে তাদের আসন গ্রহণ করেন এবং জরুরী অবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। পি. জি. মবলঙ্কর বলেন, 'সংসদীয় গণতন্ত্রকে তুবড়ে-মুচড়ে নষ্ট করা হয়েছে'। অপর সদস্য সমর মুখার্জী বলেন, 'সংসদীয় গণতন্ত্রকে অনেকাংশে ধ্বংস করে আনা হয়েছে। মনে হচ্ছে একে আরও ধ্বংস করা হবে।

কৃষ্ণকান্ত বলেন, '......আমাদের কি আজ মুসোলিনীর তত্ত্বকথা থেকে পাতা ছিঁড়ে তার সাহায্যে ট্রেন চলাচলে সময়ানুবর্তিতা আনতে হবে? অফিসে এবং আর্থিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনার জন্য কি আমাদের হিটলারের পথ অনুসরণ করতে হবে? জিনিস পত্রের দাম কমানোর জন্য কি আমাদের আয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের পাঠশালায় শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে? নাগরিক অধিকার কেড়ে নেবার জন্য আমাদেরও কি সেই একই যুক্তি দিতে হবে যা ইদি-আমিন উগাণ্ডার জন্য দিয়ে থাকেন। মারকোস দিয়ে থাকেন ফিলিপাইনসের জন্য এবং সামরিক বাহিনীর জেনারেলরা দিয়ে থাকেন গ্রীসের জন্য? এমন কি চার্চিলের মত লোকও যখন মুসোলিনীর সাময়িক সাফল্যে অভিভূত হয়ে সীমিত অর্থে স্বৈরতন্ত্রের সমর্থন করতে এগিয়ে আসেন তখন জওহরলাল নেহরুর মত অনুভূতি প্রবণ পর্যবেক্ষক তাকে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁরা এই বহিরঙ্গ বিভূষিত ব্যবস্থাদির পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন এবং প্রকৃত অবস্থা কী তা দেখেছেন। এই জন্যই আমরা গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় সম্পূর্ণ অন্য পথ অবলম্বন করেছি।

'মূল যে প্রশ্নটির দিকে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি তাহল।

সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আমরা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর নিজেদের আস্থা রেখেছি কি? এমার্জেন্সীর ফললাভ সম্পর্কে যে সোচ্চার প্রচার চলছে তা কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যর্থতার স্বীকৃতিকেই আরও বেশী করে স্বতঃ প্রচার করছে না এবং প্রমাণ করছে না কি যে এ সবের কোনটার প্রতিই আমাদের আস্থা নেই?

'একথা বোধ হয় আমাদের পুনরায় স্মরণ করা অন্যায় হবে যে ১৯৬৯ সালে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য স্বৈরতন্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া স্বৈরতন্ত্র কখনই মানুষের মনে-প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে না।' আসল সঙ্কট দেখা দিয়েছে ভারতের রাজনীতিতে। রাজনৈতিক দুর্নীতির জন্যই এখানে জনজীবনের আদর্শবোধ নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারই পরিণতিতে দেখা দিয়েছে আর্থিক ও সামাজিক সঙ্কট।

এমার্জেন্সীকে প্রলম্বিত করা এবং নির্বাচনকে স্থগিত রাখার প্রস্তাব যে সংসদের স্বীকৃতি পাবে এটা তো জানা কথা ছিলই। কংগ্রেসীরা এখন বেশ খুশী। অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ভোটদাতাদের একথা বোঝাতে হবে না যে 'কেন' জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছিল।

কয়েক জন সদস্য ভারতীয় সংবিধান তৈরীর জন্য যে পরিষদ গঠিত হয়েছিল তার কার্য বিবরনীর কথা উল্লেখ করেন। তাতে জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত মূল ধারার খসড়ায় ( তখন ২৭৫ ) বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি যদি সুনিশ্চিত ভাবে জানেন যে, ভারতের এমন এক জরুরী অবস্থা বিরাজ করছে যার জন্য দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে—( বাইরের যুদ্ধ কিম্বা অভ্যন্তরীণ হাঙ্গামার জন্য এমন হতে পারে ) তাহলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করতে পারেন।'

মূল এই ভাষার খানিকটা পরিবর্তন করা হয়। যেখানে 'যুদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ হাঙ্গামা' এই কথা কটি ছিল সেখানে লেখা হয়, 'যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ হাঙ্গামা'। কেননা তৎকালীন আইন মন্ত্রী ডঃ আম্বেদকর বলেন, 'অভ্যন্তরীণ হাঙ্গামা দ্বারা বহিরাক্রমণ না-ও বোঝাতে পারে।'

তখন এ নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির হাতে এই বিরাট ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য অনেকেই বিরোধিতা করেছিলেন। অধ্যাপক কে, টি. শাহ বলেছিলেন, 'গণতান্ত্রিক দায়িত্বসম্পন্ন সরকারের সঙ্গে এই প্রস্তাব মোটেই খাপ খায় না।' এইচ. ভি. কামাথ কোন গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানেই এই রকম ধারা নেই বলে জানান। তিনি বলেন, ওয়েমার

সংবিধানে এই রকম ধারার সমাবেশ ঘটেছিল বলেই হিটলারের উত্থান সম্ভব হয়েছিল এবং পরিশেষে ওয়েমার সংবিধানও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণমাচারি অবশ্য সেদিন রাষ্ট্রপতির হাতে ঐ ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টি সমর্থন করেছিলেন।

পরিষদ ঐ নতুন খসড়াটি অনুমোদন করেন পরে সেটি সংবিধানের ৩৫২ ধারা হিসাবে চিহ্নিত হয়।

মিসা সংশোধন করে সরকার নিজের হাতে আরও ক্ষমতা নিয়ে নেন। এখন ঐ আইনে রাজনৈতিক আটক বন্দীদের ক্ষেত্রে আটক করার কারণ জানাবার কোন দায়িত্ব সরকারের রইল না। এমন কি আদালতকে কারণ জানাতেও সরকার বাধ্য থাকলেন না। সেই সঙ্গে সেই সমস্ত লোককে আবার গ্রেপ্তার করারও অধিকার দেওয়া হল যাদের আটকের মেয়াদ শেষ হয়েছে কিম্বা অন্য কোন ভাবে মুক্তি পেয়েছে। ২২ জানুয়ারী লোকসভায় এই বিলটি ১৮১-২৭ ভোটে গৃহীত হয়।

মস্কোপন্থী কম্যুনিস্টপার্টি যারা জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যাপারে সরকারের সমর্থক ছিলেন তাঁরা এই প্রথম অন্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আটক রাখার ক্ষমতাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। কম্যুনিস্টরা এদিন অন্যান্যদের সঙ্গে ওয়াক আউটও করেছিলেন যখন একটি বিল উত্থাপন করে সরকার পক্ষ ১৯৭৬ সালের বোনাস অর্ধেক কেটে নেওয়ার এবং ১৯৭৭ সালে যে সব সংস্থা লাভ করেনি তাদের পক্ষে বোনাস না দেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

মিসা আইনকে এইভাবে আরও কঠোর করার বিরুদ্ধে কেবিনেট সভায় গোখলে নিজেই আওয়াজ তুলেছিলেন। তিনি বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার বেশী পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁর আপত্তি তখন প্রত্যাহার করে নেন যখন স্থির হয় যে, একটি সমীক্ষক বোর্ড থাকবেই এবং তারা যদি আটক বন্দীকে মুক্তি দিতে না পারে তাহলে তারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আদালতে যাবার অনুমতি দেবে।

তামিলনাড়ুর মোকাবিলা করার জন্যই বোধ হয় মিসায় নতুন সংশোধন করা হয়। কেন না ২১ জানুয়ারী করুণানিধির সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করে দেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে বসে তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের রিপোর্ট তৈরী হয় এবং রাজ্যপাল কে, কে, শাহ ঐ রিপোর্ট স্বাক্ষর দিয়ে কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দেন। ঐ রিপোর্টে বলা হয় যে জরুরী অবস্থা-জনিত ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করা ছাড়াও তারা ব্যাপক দুর্নীতি অবলম্বন করেছিল এবং বিভিন্ন সময়ে তামিলনাড়ু সরকার 'পরোক্ষভাবে ভারত থেকে

বিচ্ছিন্ন হবার জন্য হুমকিও দিয়েছিল। নয়াদিল্লি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি আর এস সরকারিয়ার অধীন একটি কমিশন নিয়োগ করে তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকার ও মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে অসংলগ্নতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ না মানায় করুণানিধিকে শাস্তিভোগ করতে হবেই।

এর পরেই তামিলনাড়ু সরকার অধিগ্রহণ করা হয়। প্রায় ৯০০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েকদিন পরে অবশ্য এই গ্রেপ্তারের সংখ্যা ২০০-এ নেমে যায়।

তামিলনাড়ুর মত গুজরাটও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মানছিল না এবং এমার্জেন্সীর বিরোধিতা করছিল। ততদিনে হিতেন্দ্র দেশাই গুজরাটে কংগ্রেস দলের নেতা হয়ে গেছেন। তিনি ফেব্রুয়ারী মাসে একটি রিপোর্ট দিলেন যে, গুজরাটের অকংগ্রেস সরকার শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। ১৯৭৬ সালের ১৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি গুজরাটের শাসনভারও গ্রহণ করেন।

যেভাবে তামিলনাড়ু ও গুজরাটের অকংগ্রেসী সরকারের পতন ঘটিয়ে সেখানে কংগ্রেসের প্রভুত্ব স্থাপন করা হল তাতে বিরোধী দলগুলি অত্যধিক সতর্ক হয়ে গেল এই ভেবে যে এর পর যদি শুধুমাত্র বিরোধী দল হিসাবেও বেঁচে থাকতে হয় তাহলেও সকলকে একত্রিত হতে হবেই। এছাড়া বাঁচার অন্য কোন পথ নেই। জরুরী অবস্থার সময় যে কষ্ট তাদের স্বীকার করতে হল তার মধ্যেই তারা পেল ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা। চারটি দল যথা—সংগঠন কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, ভারতীয় লোক দল এবং সমাজতন্ত্রী দল ২৬ মার্চ ঘোষণা করলো যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য তারা চারটি দল মিলে একটি নতুন দল গঠন করবে। এই মিলন যাতে সুসম্পন্ন হয় সেজন্য চার সদস্যের একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হল। সামরিক ভাবে কোন কিছু করার খুব দরকার। এক বিবৃতিতে এর প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করে বলা হল যে, সরকার যেভাবে ইচ্ছে করে গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙ্গে চুরমার করছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠান করে তারা একে স্থায়ী রূপ দিতে চাইছে—তাতে এর বিরুদ্ধে এমনই রুখে দাঁড়ানো দরকার। বিবৃতিতে আরও বলা হল জেপি তাঁর 'উপদেশ ও পথ নির্দেশ' দিয়েছেন।

চরণ সিং হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি তৎক্ষণাৎ চারটি দলের সম্পূর্ণ মিলন (মার্জার) চাইছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ একথা বলেও আসছিলেন।

তিনি দেখেছিলেন যে গুজরাটে কী ভাবে যুক্তফ্রণ্ট কংগ্রেসের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। জনসঙ্ঘ এবং সমাজতন্ত্রী দলেরও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ সকলে জেলে আটক ছিলেন। কাজেই তাদের অনুমতি পাওয়ার প্রয়োজন ছিল। সংগঠন কংগ্রেস বললো বাকী দলগুলির উচিত হবে সংগঠন কংগ্রেসে মিলিত হয়ে যাওয়া, তার কারণ ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে যাবার পর সংগঠন কংগ্রেস যে সব সম্পত্তির মালিক হয় তার প্রতিমাসেই আয়ই হল এক লক্ষ টাকার উপর। কাজেই সংগঠন কংগ্রেস যদি অপর দলের সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে কিন্তু ঐ মাসিক লক্ষ টাকাব আয় শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেসের দিকে চলে যাবে।

চার দল মিলে একদল গঠনের কথা বার বারই উঠতে থাকে। কিন্তু বহু মাস ধরে এর কোন সুফল পাওয়া যায় না। একদল গঠনের পথে অনেক রকমেব বাধা দেখা দেয় যা অতিক্রম করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

দেশের ভিতর যখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা ঐক্যবদ্ধ বিবোধী দল গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা চলছিল তখন ৩০০ প্রবাসী ভাবতীয় ২৪ এপ্রিল লণ্ডনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করলো, যেখানে ভারতের দমনমূলক শাসন ব্যবস্থাব বিরুদ্ধে অভিযানের কথা ঘোষণা করা হল।

এই সম্মেলনে আগত বহু প্রতিনিধি বললেন। বিদেশে ভারত সরকারেব যে সব অফিসার আছেন তাদের প্রচার এবং ভারতীয় সংবাদেব উপর সেন্সর শিপ চাপিয়ে দেওয়ায় ভাবতের রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা ও তাদের উপর অকথ্য অত্যাচারের বিষয় আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে নি। বেশ কিছু প্রতিনিধি একথাও বললেন যে, ১,৭৫,০০০ জন বিরোধী রাজনৈতিক দলেব সদস্যদেব ভারত সবকাব জেলে পুরে রেখেছে এবং তাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাচ্ছে।

যাই হোক ভারতের স্বাধীনতাকামীদের জন্য তখন একটা অতি খারাপ সময় চলছিল। বিনা বিচারে রাজনৈতিক বিবোধীদেব আটক রাখাব সবকারী অধিকারকে ২৮ এপ্রিল সুপ্রীমকোর্ট স্বীকার করে নেন। ৪—১ রুলিংয়ে সুপ্রীমকোর্ট সরকারের বক্তব্যকেই মেনে নেন। ঐ ব্যক্তব্যে সরকার বলেছিলেন যে, ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা জারির পব যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে হেবিয়াস কার্পাস আবেদনপত্রেও লোয়ার ট্রাইনালের মাধ্যমেও তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কোন ক্ষমতা থাকবে না।

এদিকে সাতটি হাইকোর্ট—এলাহাবাদ, বোম্বাই, দিল্লি, কর্ণাটক, মধ্য-

প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং রাজস্থান—১৩জন আটকবন্দীর ক্ষেত্রে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন মঞ্জুর করেছেন। আদালতগুলি বলেন যে, যদিও তাঁরা আটক আদেশ বাতিল করে দিতে পারেন না, তবুও তাঁরা এ বিচার নিশ্চয়ই করতে পারেন যে আটক আদেশ বৈধ কি না এবং স্বাভাবিক ন্যায়বিচার ও সাধারণ আইনসম্মত কি না। সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে আদালতগুলি হেবিয়াস কর্পাসের রিট জারি করতে পারেন এবং যেহেতু সংবিধানের এই ধারার অধিকার সংবিধানের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে পড়ে না, সেই হেতু জরুরী অবস্থাকালেও এই ক্ষমতা বাতিল করা যায় না।

সরকার পক্ষের হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে নীরেণ দে বলেন, 'জরুরী অবস্থাকালে ব্যক্তির স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থকে অনেক ওপরে স্থান দেওয়া হয়—এমন কি মৌলিক অধিকারও এক্ষেত্রে গৌণ', 'জরুরী অবস্থা চলাকালে তাই যে কোন প্রকার ব্যক্তিগত অধিকার আদায় করার জন্য চেষ্টা করা নিষিদ্ধ' এবং 'এই সময়ের জন্য ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোন আইনই কার্যকর থাকে না'। অপর পক্ষে শান্তিভূষণ বলেন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাভোগের অধিকারসহ কিছু অধিকার এমন আছে যা 'সংবিধানের উপসংহার' নয়—যা গণতন্ত্রে মৌল চিন্তাধারার অন্তর্গত সেই অধিকারগুলিকে জরুরী অবস্থা চলাকালেও বাতিল করা যায় না।

সুপ্রীমকোর্টের রুলিংয়ে বলা হয় ২৭ জুন ১৯৭৫-এ রাষ্ট্রপতির আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আটক আদেশ আইনসঙ্গত কি না এটা কোন ব্যক্তি রিটপিটিশনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করার অধিকারী নয় এবং ১৯৭৫-এর ২৯ জুন যে অর্ডিনান্স জারি করা হয় তাকেও চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব নয়। ঐ অর্ডিনান্স বলে মিসায় গ্রেপ্তার করলে যে কারণ দর্শাবার একটি সর্ত ছিল তাও তুলে নেওয়া হয়। সুপ্রীম কোর্টের এই রুলিয়ের পক্ষে মত দেন এ, এন, রায়, এম, এই, বেগ, ওয়াই, ভি, চন্দ্রচূড় এবং পি, এন, ভগবতী। এর বিরুদ্ধে রায় দেন খান্না।

খান্না তাঁর একক রায়ে বলেন, সংবিধান কোন কর্তৃপক্ষকেই এমন অধিকার দেন না যাতে তিনি হাইকোর্টের হেবিয়াস কর্পাসের রিট দেওয়ার অধিকারকে বাতিল করে দিতে পারেন। এমন কি জরুরী অবস্থা চলাকালেও কোন মানুষকে তার জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন আইন-সঙ্গত অধিকার রাষ্ট্রের নেই। জীবন ও স্বাধীনতা সম্পর্কে এই পবিত্রতার বোধ যদি না থাকে, তাহলে আইনবর্জিত সমাজ ও যে সমাজে আইনশৃঙ্খলা আছে—এ দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সরকারের যুক্তি যদি মেনে

নেওয়া যায় তাহলে যে কোন অফিসার আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ছাড়াই যে কোন ব্যক্তিকে অনির্দিষ্টকাল আটক করে রাখতে পারেন। আদতে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে কি না সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল সরকারের যুক্তি মেনে নিলে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

সুপ্রীমকোর্টের এই রায় অনেককে বিস্মিত করে। বহু লোককে আবার এই রায় হতাশ করে এইজন্য যে, তাদের একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, চন্দ্রচূড় এবং ভগবতী আটক বন্দীদের পক্ষে রায় দেবেন অর্থাৎ হেবিয়াস কর্পাসের মামলা ৩-২ ভোটে জয়লাভ করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষের একজন বিচারপতি লক্ষ্য করেছিলেন যে, কৌঁসুলীরা তাঁদের আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেন যে যদি আদালতের বিচার হয় তাহলে আটক বন্দীদের বেত মারা, উলঙ্গ করে খাদ্য পানীয় না দিয়ে ফেলে রাখা সব কিছুই চলতে পারে, এমন কি তাকে যদি হত্যাও করা হয় তবুও কিছু করার নেই। ঐ বিচারপতি এই বলে স্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন যে, স্বাধীন ভারতে এমন কোন ঘটনার রেকর্ড নেই। সুতরাং তিনি আশা করেছিলেন যে, ঐ সব ভয়ানক ঘটনা এদেশে কোনদিনও ঘটবে না।

এই আশা যে কত ভুল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ডজন ডজন নৃশংস ও বীভৎস বন্দী নির্যাতনের ঘটনার মধ্যে।

বন্দীদের উপর বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার চালানো হয়। যেমন খালি গায়ের উপর সবুট পায়ে স্ট্যাম্প মারার মত করে মারা। পায়ের নীচে সাংঘাতিকভাবে আঘাত করা। খালি শরীরে বন্দীকে চিৎ করে শুইয়ে তার শরীরের উপর দিয়ে একটি বাঁশ যার উপর একজন পুলিশ বসে থাকে—তা গড়িয়ে (রোল করে) নিয়ে যাওয়া। চেয়ার ছাড়াই বসে আছে এমন অবস্থায় ঘন্টার পর ঘন্টা রাখা। শিরদাঁড়ার উপর আঘাত করা, যতক্ষণ না জ্ঞান হারায় ততক্ষণ দুই কান পীঠে চড় মারতে থাকা। রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারা। শরীরের কোমল জায়গায় বিদ্যুতের তরঙ্গ প্রবহমান আছে এমন তার ঢুকিয়ে দেওয়া। সত্যাগ্রহীদের উলঙ্গ করে বরফের উপর শুইয়ে রাখা। জলন্ত সিগারেট বা মোমবাতি দিয়ে শরীরে বিভিন্ন অংশে ছ্যাকা দিয়ে দেওয়া। খাদ্য, জল এবং ঘুমোতে না দেওয়া। নিজেরই প্রস্রাব পানে সত্যাগ্রহীকে বাধ্য করা। সত্যাগ্রহীর হাত পেছনে বেঁধে তাকে শূন্যে 'অ্যারোপ্লেনের' মত ঝুলিয়ে রাখা। (এই পদ্ধতটা হল—বন্দীর দুই হাত পেছমোড়া করে বাঁধা হয়, তার পর সেই বাঁধা হাতের দড়ি একটি পুলিতে করে টেনে ওপরে তোলা

হয়। সম্পূর্ণ শরীরটা এইভাবে জমি থেকে কয়েক ফুট ওপরে উঠলে তাকে সেইভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়।)

বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে এই সব অত্যাচার করা হয়। দশ বারো জনের এক এক দল কনস্টেবল কোন একজন আটক বন্দীকে ঘিরে এই ধরনের অত্যাচার চালায়। যখন যে প্রকারের অত্যাচার চালাতে ইচ্ছা হয় সেই প্রকার অত্যাচার চালায়। অত্যাচার করতে করতে যদি বন্দীর শরীরে কোন দাগ পড়ে যায় তাহলে তাকে আর আদালতে হাজির করা হয় না— পাছে আদালতের কাছে এজন্য কঠোরভাবে তিরস্কৃত হতে হয়। কর্তৃপক্ষের হাতে মিসা এক অমোঘ অস্ত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়। কেননা মিসায় ধরলে আটক বন্দীর আইনগত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আর কোন সুযোগই থাকে না।

বাঙ্গালোরে নিজের বাড়ী থেকে লরেন্স ফার্নাণ্ডেজকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় তার ভাই—জর্জ ফার্নাণ্ডেজ কোথায় তার খোঁজখবর নিতে। তাঁর নিজের কথাতেই তাঁর কাহিনী শুনুন:

১৯৭৬-এর মে মাস। রাত্তিরবেলা কেউ যেন আমার ডাকনাম ধরে ডাকছে। মনে হল আমার কোন বন্ধু হবে। আমি তাই দরজার দিকে এগোলাম। দেখলাম, পুলিশের জীপ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে যে ডাকছিল সে একজন সাদা পোষাকের পুলিশ। সে আমাকে জানালো যে পুলিশ আমার ছোট ভাই মাইকেলের (ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রিসের ইঞ্জিনিয়ার। তাকেও মিসায় গ্রেপ্তার করা হয়) রিট পিটিশনের ব্যাপারে আমার একটি বিবৃতি নিতে চায়। এতে বেশী সময় লাগবে না মনে করে আমি আমার বাবা মাকে না জানিয়েই পুলিশের সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম।

পুলিশ প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আমার বিবৃতি গ্রহণ করলো। তারপর আমাকে নিয়ে গেল গোয়েন্দাদের মাঝখানে। সেখানে সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে কে যেন আমাকে এক চড় মারলো। অন্ধকার বেশ কয়েক মিনিট ছিল। আমার সম্বিৎ ফিরতেই বুঝলাম ওরা আমাকে উলঙ্গ করে ফেলেছে।

সেখানে দশজন পুলিশ ছিল। তারা আমার উপর তাদের বীরত্ব ফলাতে শুরু করলো। চারখানা লাঠি ভেঙ্গে গেল। আমার সর্বাঙ্গে তারা একের পর এক ঘুষি চালাতে লাগলো। আমি যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলাম। আমি তাদের কৃপা ভিক্ষা করছিলাম। হামাগুড়ি দিয়ে

এগোচ্ছিলাম, আবার কৃপা চাইছিলাম। আর ওরা আমাকে ফুটবলের মত 'কিক্' করে চলেছিল। তারা এরপর একটি কাঠের শক্ত কাটার যন্ত্র নিয়ে এসে তাই দিয়ে আমার উপর আঘাত করতে থাকে। আমি যন্ত্রনায় ভেঙ্গে পড়ি।

তারপর এল সেই চূড়ান্ত আঘাত। তারা একটা কলাগাছের গোড়া নিয়ে আমার পশ্চাতে এসে হাজির হল। আমি তখন উপুড় হয়ে শুয়ে আছি—অর্ধচেতন ও অচেতন অবস্থার মাঝামাঝি একটা পর্যায়ে তখন আমি ছিলাম।

তখন ভোর রাত্রি ৩টে। চোখ খুলেই আমি জল জল করতে থাকলাম। তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। আমি কাতরভাবে জল চাইতে থাকায় একজন অফিসার এসে কনস্টেবলকে আমার মুখে প্রস্রাব করতে আদেশ দিল। কিন্তু তারা প্রস্রাব করে নি। যখন আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হয়েছিল তখন আমার মুখে একজন এসে কয়েক চামচ জল দিল। তারা জানতে চাইছিল যে জর্জ কোথায় এবং লায়লা (জর্জের স্ত্রী) ও তাদের ছেলে ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরে কেন বাঙ্গালোরে এসেছিল। তারা আরও জানতে চাইছিল যে ফিরে যাবার সময় আমি কেন মাদ্রাজ পর্যন্ত তাদের সঙ্গী হয়েছিলাম।

আমার অবস্থা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে তারা মনে করলো আমি যে কোন সময়ে হয়তো মারা যেতে পারি। একজন অফিসার কনস্টেবলকে বললো সে যেন জীপ তৈরী রাখে। তারপর আমি শুনলাম সে বললো, 'চলো এটাকে কোন চলন্ত গাড়ীর সামনে ফেলে দিয়ে আসি, আর পরে না হয় প্রচার করে দেওয়া যাবে যে ও আত্মহত্যা করেছে। আমার অবস্থা তখন কাহিল। আমার শরীরের বাঁ দিককার হাড়গুলো সব ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমার উরু নাড়তে পারছিলাম না। পা ও হাত ফুলে ঢোল হয়েছিল।

একটি জীপে করে আমাকে তারপর মাল্লেশ্বরমের দিকে নিয়ে যাওয়া হতে থাকলো। আমি মনে করলাম অফিসারটি বোধ হয় তার কথা অনুযায়ী কাজ করতে চলেছে আমি তার কাছে করুণা ভিক্ষা চাইলাম। তারা তাদের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে পরিবর্তন করে ফেলেছিল। সেইজন্য তারা আমাকে নিয়ে ব্যালিকাবল পুলিশ লক-আপে নিয়ে এল। পরের দিন আবার আমাকে সিওডিতে (কর্পস্ অব ডিটেকটিভস্) নিয়ে আসা হয়।

সেখানে এই প্রথম আমি একটি পরিচিত নারী কণ্ঠ শুনলাম। সে হ'ল স্নেহলতা রেড্ডীর কণ্ঠ, সে চিৎকার করছিল। পুলিশ কোন একজনকে ডেকে এনেছিল আমাকে 'ব্যাণ্ডেজ' করে দেবার জন্য। সে বিভিন্ন অঙ্গে তেল দিয়ে মালিশ করার চেষ্টা করলো বটে। কিন্তু বেশীদূর এগোতে পারলো না। সে

অফিসারদের জানালো, ম্যাসেজ করে এর কিছু করা যাবে না। একে আপনারা হাসপাতালে পাঠান। তারা ওসবের কিছুই করলো না।

পরের দিন আমাকে একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে কোন ঘরে জর্জ ছিল তা আমাকে চিনিয়ে দিতে বলা হল। কিছুক্ষণ পরে আবার আমাকে সিওডি অফিসে নিয়ে আসা হল। আমি সেখানে অভুক্ত অবস্থায় পড়ে রইলাম। আমি খাবার চাইলে পর কনস্টেবলরা আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিল। একজন ডাক্তার এলেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করলেন এবং ওষুধ পথ্য কী খেতে হবে তা লিখে দিয়ে গেলেন। তার পরের কয়েকদিন আমি মল্লেশ্বরম্ পুলিশ স্টেশনে ছিলাম।

আমার অবস্থা এমন হয়েছিল যে প্রস্রাব পায়খানা করতে পর্যন্ত কনস্টেবলরা আমাকে তুলে নিয়ে যেত। ৯ মে জোর করে আমার চুল কেটে দেওয়া হল, দাড়ি কামানো হল এবং আমাকে চান করানো হল। কিন্তু সেই একই ময়লা জামা-কাপড় আমাকে পরিয়ে রাখা হল।

কিছুক্ষণ পরে সাদা পোশাকের দুজন অফিসার এলেন এবং আমাকে একটি গাড়ীতে বসিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি ভেঙে পড়লাম এবং কাঁদতে থাকলাম। তাঁরা বললেন যা কিছু ঘটে গেছে এজন্য তাঁরা দায়ী নন। তাঁদের দায়িত্ব শুধু এইটুকু যে, আমাকে তাঁরা চিত্রদুর্গে গ্রেপ্তার করেছেন এটা দেখানো ( চিত্রদুর্গ একটি ছোট শহর। এখান থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত )।

কিন্তু আমাকে নিয়ে যাওয়া হল দাভানগেরেতে। এখানে এনে আমাকে বলা হল যে আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হবে এবং আমি যেন ম্যাজিস্ট্রেটকে বলি যে ঐদিনই আমাকে বাস স্ট্যাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারপর আমাকে একটি গর্ত জাতীয় জায়গায় ফেলে দেওয়া হল যেখানে কেবল ছারপোকা আর আরশোলার বাস।

স্থানীয় দুজন ইন্সপেক্টর এসে আমাকে শাসিয়ে গেল যে আমি যদি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পুলিশী অত্যাচারের কথা বলি তাহলে আমার পরিবার-বর্গকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে। তারা আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মাঝপথ পর্যন্ত গিয়ে তাদের মতির পরিবর্তন হয়, তারা আবার ফিরে আসে এবং আমাকে আবার পুলিশ স্টেশনের সেলের মধ্যে পুরে দেয়।

পরে আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে যাবার

পরে আমাকে খালি পায়ে চলতে বাধ্য করা হয়। আমার পা ফুলে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট আমার কাছে জানতে চাইলেন যে আমি কখন গ্রেপ্তার হয়েছি। আমি আমতা আমতা করতে থাকলাম। কেননা অফিসাররা আমাকে যে তারিখ ও সময় বলেছিল আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। ম্যাজিস্ট্রেট তখন নিজেই দিনক্ষণ বললেন। আমি তাতে সায় দিলাম। পরে আবার যখন ম্যাজিস্ট্রেট জানতে চাইলেন যে আমি পূর্বদিন বাস স্ট্যাণ্ডে ধরা পড়েছি কি না। আমি চুপ করে রইলাম। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে ২০ মে পর্যন্ত পুলিশ হাজতে থাকার আদেশ দিলেন।

আমাকে এরপর একটি বড় লক-আপে থাকার ব্যবস্থা করা হল। সেখানে আরেকটি লোক ছিল। ৫০,০০০ টাকা চুরির মামলায় সে যা বলছে পুলিশ তাই শুনছে। খাদ্য, সিগারেট প্রভৃতি তার যখন যা প্রয়োজন তাই সে পেয়ে যাচ্ছে। সে আমাকে কথা দিল যে আমার যখন যা প্রয়োজন সে তার ব্যবস্থা করে দেবে। কনস্টেবল এবং ইন্সপেক্টররা যেন তার তাঁবেদার। পরে তার সঙ্গে আমার জেলেও দেখা হয়েছিল, তখন তার শাস্তি হয়েছে।

১১ মে তারা আবার আমাকে বাঙ্গালোরে নিয়ে এল এবং সেই মল্লেশ্বরম্ লক-আপে আমাকে রাখলো। পরে আমাকে মল্লেশ্বরম্ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তাররা আমার এক্স-রে করতে বলেন। পুলিশ অফিসাররা এক্স-রে করার অনুমতি দেয় না এবং আমাকে আবার থানায় নিয়ে আসে।

পরের দিন আমাকে আবার আরেকটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেটা হল ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বউরিং হাসপাতাল। সেখানে ডাক্তাররা ওপর ওপর কি একটা যেন পরীক্ষা করে এবং তাদের ব্যবহারও ছিল খুব রুক্ষ।

আমাকে আবার মল্লেশ্বরমে নিয়ে আসা হয় এবং ওষুধ পত্র খাওয়ানো হতে থাকে। এর ফলে আমার আমাশা হয়ে যায়। তিন দিন আমাশায় খুব ভুগি। তারা আবার আমাকে অন্য কিছু ওষুধ দেয় তাতে আবার আমার আমাশা সেরে যায়। ২৮ মে আমাকে আবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার কথা, সুতরাং তার আগে পুলিশ আমাকে সুস্থ করে তুলতে খুব আগ্রহী।

মল্লেশ্বরমের পুলিশ অফিসার আমাকে রোজ জোর করে মদ খাওয়াতে চাইতো, যাবার অপর একজন কনস্টেবল আমাকে মদ খেতে মানা করতো।

পরের দিন একজন পদস্থ অফিসার এলেন। তিনি বললেন, আমার কষ্টের কথা নাকি তিনি সবই জানেন। তিনি আমাকে কথা দিলেন যে ২০ মে আমি যাতে মুক্তি পাই তিনি তাঁর ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু পরের দিন আমাকে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হল তখন আমি কাউকেই দেখতে পেলাম না যে আমাকে জামিনে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করতে পারে। আমার উপর অত্যাচারের কথা আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালাম। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, তিনি ঐ অভিযোগের কথা লিখে নিয়েছেন।

ওখান থেকে সোজা তারা আমাকে নিয়ে সেণ্ট্রাল জেলে এল এবং আমার মুক্তির সমস্ত আশা মিথ্যা হয়ে গেল। জীপ একেবারে সেলের দরজা পর্যন্ত গেল। আমার দুর্ভাগ্য, সেখানে যে ওয়ার্ডেনটি ছিল সে-ও ছয়ফুট লম্বা মিশকালো একটা দৈত্যাকার লোক। তাকে দেখেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তারা আবার আমাকে উলঙ্গ করে ফেললো, পকেটে যে কয়টা বিড়ি ছিল তা নিয়ে নিল এবং একটি কনডেম্‌ড সেলের মধ্যে আমাকে একরকম ছুঁড়ে ফেলে দিল। চারিদিকে ঘন কালো অন্ধকার এবং দুর্গন্ধে ভরা। আমার যেন আবার ব্ল্যাক আউটের অভিজ্ঞতা হল।

তারপর আমি বারবার একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। কেউ যেন আমাকে ডাকছে। চারিদিকে সেই আওয়াজ ভাসতে লাগলো। আমার মনে হল ঐ আওয়াজের মধ্যে একটা চেনা স্বর আছে। হ্যাঁ ওটা মধুর ( মধু দণ্ডবতে ) গলার স্বর। আমি নিজের শরীরটাকে টানতে টানতে সেলের গেটের কাছে নিয়ে গেলাম এবং লোহার গরাদগুলো ধরে কোন মতে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম।

মধু বললো, তুমি কি নরেন্দ্র? আমাকে উত্তর দাও। তোমাকে কি ওরা অত্যাচার করেছে ?

আমি অস্ফুট স্বরে বললাম, হ্যাঁ এবং বাইরে তখন একটা ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছিল। জেলে তখন একটা গুজব খুব জোর ছড়িয়ে পড়েছিল তাহল বেলগাঁও জেলের এক পলাতক কয়েদী আবার ধরা পড়েছে এবং তাকে এখানে আনা হয়েছে।

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস্, জেল সুপার এবং ডাক্তারকে দেখা গেল। তাঁরা সবাই প্রাণপণে চীৎকার করছেন। আমার মনে হয় তাঁরা সবাই মিলে আমাকে পাগল করে দিতে চেয়েছিলেন। যাই হোক আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট ছিল বলে আমাকে বাইরে শোয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

তারপর দণ্ডবতে ও অন্যান্য মিসা আটক বন্দীরা অনশন ধর্মঘট করলেন, তাদের দাবি হল আমাকে কনডেমড্ সেল থেকে সরিয়ে অন্য কোন ভালো ওয়ার্ডে রাখতে হবে।

পরের দিন মনে হল আমার একেবারে ছোট ভাই রিচার্ড মাকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ঐ সাক্ষাতের কথা আমি কিছুতেই ভালোভাবে মনে করতে পারি না। জেল একটা সম্পূর্ণ আলাদা জগত। আমি যদি মুক্তি পাই তাহলে আমি জেল সংস্কারের ব্যবস্থা করবো।

জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমার এক্সরে হল এবং প্লাস্টার করে দেওয়া হল। আমার উপর মিসা আদেশ জারি করা হল ২২ মে। সুপার পরে ওটা আমার কাছে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি দিতে অস্বীকার করি। আমি যখন পায়খানায় ছিলাম তখন তিনি একবার আমার 'সেল' সার্চও করেছিলেন কিন্তু ওটা পান নি।

কিছু দিন পরে জেল দেখতে এসে তিনি আমার সেলের সামনে আসেন। জিজ্ঞাসা করেন আমি কেমন আছি। এতে আমি খুব রেগে যাই এবং তাকে সেল থেকে বেরিয়ে যেতে বলি। কেননা তিনি মোটেই তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখছিলেন না। তিনি আমাকে তালা দিয়ে রাখার হুমকি দিলেন এবং আমিও তখন তাঁকে বললাম যে, তালা কেন? আমাকে গুলির মুখে দাঁড় করিয়ে দিন। মৃত্যু তো আমার ও আপনার দুজনের কাছেই সমান।

আরেকটি হৃদয় বিদারক কাহিনী হল স্নেহলতা রেড্ডীর ঘটনা। দুর্বল মেয়ে স্নেহলতা রেড্ডীকে রাজনৈতিক সন্দেহবশতঃ ১ মে, ১৯৭৬-তারিখে বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ আনা হয় নি। কোন প্রশ্নও তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

চলচ্চিত্র যারা দেখে স্নেহলতা তাদের কাছে খুবই পরিচিত নাম। একাধিক পুরস্কার-প্রাপ্ত কন্নড় ছবি 'সংস্কার'-এর তিনি ছিলেন নায়িকা। তাঁর স্বামী পট্টাভি ছিলেন ঐ ছবির প্রযোজক ও পরিচালক। বাঙ্গালোরের নাটক ও শিল্পের জগতেও স্নেহলতা রেড্ডী ছিল একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

কিন্তু তার চেয়েও বেশী, সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে স্নেহলতার ছিল প্রীতির সম্পর্ক। যেমন সমাজতন্ত্রী নেতা এবং বুদ্ধিজীবী, ভারত ও বহির্ভারতের থিয়েটার-শিল্পী, লেখক, চিত্রকর, যাদুকর, এবং সবার উপরে সেই সব যুবক যারা জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পেতে চায়—এদের সকলের সঙ্গেই তাঁর

মেলামেশা ছিল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাঁর বাড়ীর দরজা ছিল বন্ধুবান্ধবদের জন্য উন্মুক্ত।

এই বিরাট ও ব্যাপক বন্ধুত্বের জন্যই তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর সঙ্গে জর্জ ফার্নেণ্ডেজের বন্ধুত্ব ছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই অতি সাধারণ বন্ধুত্বের ব্যাপারটিও এক অস্বাভাবিক ও দুঃখদায়ক পরিণতির দিকে সব-কিছুকে টেনে নিয়ে গেল।

রাতারাতি তাঁর সুন্দর পৃথিবী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। ভয় এবং অনিশ্চয়তার দুঃস্বপ্ন নিয়ে তাঁকে রাত কাটাতে হল। অন্ততঃ বার দুয়েক তাঁর ছোট্ট মেয়েকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল। আর পুরো পরিবারের উপরই গোয়েন্দা দপ্তর রেখেছিল কড়া নজর।

২৭ এপ্রিল তাঁর এবং পট্টভির মাদ্রাজ যাবার কথা। তাদের নতুন ফিলমের স্যুটিংয়ের জন্য আলোর ব্যবস্থা করতেই তাঁরা মাদ্রাজ যাবেন। বিকেল ৪ টার সময় পুলিশ আবার নন্দনাকে থানায় নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। এই নিয়ে তিনবার নন্দনাকে থানায় আনা হল।

সে যখন ফিরলো তখন সন্ধ্যে সাতটা। কাউকেই সে কিছু বলে যায় নি। ফলে পরিবারের সকলেই খুব চিন্তিত ছিলেন। নন্দনার হঠাৎ এরকম অদৃশ্য হওয়ায় তাদের মাদ্রাজ যাত্রার প্রোগ্রামও বাতিল হতে বসেছিল। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত তাঁরা ছেলে কোনারককে বাড়িতে রেখে রাত নটার সময় মাদ্রাজ রওনা হলেন।

মাঝরাতে 'টেলিগ্রাম' বলে কেউ এসে দরজা ধাক্কা দিতে শুরু করায় কোনারক গিয়ে দরজা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একজন পুলিশ তাকে দুই হাতে চেপে ধরে এবং একগাদা পুলিশ হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। তখন তারা দেখে যে বাড়ীতে আর কেউ নেই, সকলে মাদ্রাজ চলে গেছে। তখন তারা কোনারককেই থানায় নিয়ে যায়। বেশীর ভাগ পুলিশ থেকে যায় বাড়ির মাল-পত্র ভেঙ্গে-চুরে নষ্ট করার জন্য। স্নেহর চুরাশি বছর বয়স্ক বাবাকে পুলিশ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। যাই হোক পুলিশ ঐ বাড়ি ছেড়ে যায় পরের দিন প্রায় ভোর ছটায়।

মাদ্রাজে গিয়ে স্নেহ ও তাঁর স্বামী প্রথম যে খবরটি শোনেন তাহল তাঁদের বহু কালের বন্ধু আপ্পারাও ও-তার মেয়েকে পুলিশ সেদিনই ভোর রাত্রে ধরে নিয়ে গেছে। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালোরে ফোন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের ফোন কেটে দেওয়া হয়েছিল। এক প্রতিবেশীকে ফোন করে তাঁরা

রাতে যে পুলিশের তাণ্ডব হয়েছিল সে ঘটনা পুরো শোনেন। তাঁরা বাঙ্গালোর ফিরে যেতে মনস্থ করেন এবং স্থির করেন যে এখুনি হোটেলে গিয়ে বেঁধে-ছেঁদে তৈরী হয়ে থাকবেন।

তাঁরা বাঙ্গালোরে পৌঁছতেই তাঁদের কার্লটন হাউসে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেই স্নেহ এবং তাঁর স্বামীকে আটক করে রাখা হয়েছিল, বাকীদের পুলিশ বাড়ি নিয়ে যায়। কোনারকের তখনও কোন খবর নেই। স্নেহ এবং পট্টভি দুজনেই খুব ক্লান্ত ছিলেন। আগের দিন মাদ্রাজ যাবার ধকল গেছে, তারপর মাদ্রাজ গিয়ে কোনরকম বিশ্রাম না করেই আবার তাদের বাঙ্গালোর ফিরতে হয়েছে। ফলে সত্যিই তাঁরা খুব ক্লান্ত ছিলেন।

সারা রাত তাদের ঐ বাড়ির একটি ঘরে বসিয়ে রাখা হয়। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই প্রহরী জবাব দেয়, 'সাইক্র ইস্ট বারতার' (এখুনী অফিসার আসছেন)। সে রাতে ওখানে কেউ এল না।

পরের দিন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের একটি অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পুলিশকে দেখেই স্নেহ নিজের থেকে বললেন, 'আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন, আমার স্বামীকে মুক্তি দিন এবং অঙ্গীকার করুন যে আমার মেয়েকে আর আপনারা উত্যক্ত করবেন না। তাহলে আমি যা জানি সব কিছু আপনাদের বলে দেব।'

এতটার জন্য বোধহয় পুলিশ প্রস্তুত ছিল না। তারা কেবল ফর্জের সঙ্গে স্নেহ'র বন্ধুত্ব আছে এইটুকুই জানতো। পুলিশ তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকেই ঘরে এনে হাজির করে দেখায় যে তারা সকলে সুস্থ সবল আছে। সকলকেই তারা বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। কেবল মাত্র স্নেহলতাকে তারা আটক করে।

স্নেহকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না। বাড়ি থেকে বিছানা, জামা কাপড়ও খাদ্য আনতে দেওয়া এবং পরিবারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতেরও অনুমতি দেওয়া হয়। স্নেহকে মোটামুটি ভাবে রাজনৈতিক আটক বন্দীর মত রাখা হয়।

সন্ধ্যা সাতটায় রাতের খাবার নিয়ে পট্টভি কার্লটন হাউসে গিয়ে দেখে তালা ঝুলছে—সেখানে কেউ নেই। তাঁরা মনে করলেন যে হয়তো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁরা খাবার নিয়ে তাই রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তখনও ওরা ফিরলো না। ফলে পট্টভি ফিরে এলেন। আবার মাঝ রাতে তিনি কার্লটন হাউসে গেলেন।

তখনও সেখানে তালা ঝুলছে, কেউ নেই। সারারাত সেদিন বাড়ির কারও ঘুম হল না। পরের দিন সকালে কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ফোনে জানালো যে তাঁকে হয়তো জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশ স্নেহলতার সঙ্গে তাদের পরিচিত খেলা খেলতে থাকে। প্রথমে তাকে জেলে নিয়ে যায়। তারপর সেখানে গিয়ে বলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধু যাবার পথে একবার ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন, 'স্নেহলতাকে আটক রাখার নির্দেশ দেওয়া হল'। স্নেহলতা বলেন, তবে যে বললেন ছাড়া পাব। পুলিশের চটপট উত্তর : 'পাবেনই তো। বাড়ি থেকে জামিনের টাকার ব্যবস্থা করুন। মুক্তি পেয়ে যাবেন।' একজন পুলিশ অফিসার এমন ভাব দেখায় যেন সে স্নেহলতার বাড়িতে ফোন করলো। আসলে কিছুই না। পুরোটাই ধোঁকাবাজি।

পরের দিন পুলিশের অর্ডার প্রভৃতি যাবতীয় জিনিস তৈরী। স্নেহকে আবার কার্লটন হাউসে নিয়ে আসা হল। তখন বিকেল হয়ে গেছে। স্নেহকে নিয়ে পুলিশের জীপ হাজির হল বাঙ্গালোর সেণ্ট্রাল জেলে। সেখানে তাদের নিয়মানুসারে স্নেহলতাকে উলঙ্গ করে সার্চ করা হল। তার সই নেওয়া হল খাতায়। তারপর তাঁকে একটি স্যাঁতসেঁতে সেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। স্নেহ সেখানকার একমাত্র বাসিন্দা। সেলের মধ্যে একটা গর্ত। সেটাই প্রস্রাব পায়খানার ব্যবস্থা। ভাগ্যিস, স্নেহলতার নিজস্ব বিছানাটা তাঁকে আনতে দেওয়া হয়েছিল। তাতে তিনি মেঝের ওপর শুয়ে রাত কাটালেন। জেলে এসে স্নেহলতার মনে মনে খুব দুঃখ হয়েছিল। বাড়ীর লোকে জামিন দেবার একটা ব্যবস্থা পর্যন্ত করলেন না। কিন্তু স্নেহ তখনও জানতেন না যে পুলিশ তাঁর বাড়িতে ফোন করার ভান করলেও আসলে ফোনই করে নি।

পরের দিন বাড়ির লোকজন দেখা করতে এলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গেলেন জামিন নেবার জন্য। ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন, জামিন পাবেন, তবে একজন উকিলের মাধ্যমে পিটিশন করুন। পট্টভি উকিল ঠিক করে জামিনের জন্য পিটিশন করার ব্যবস্থা করলেন। পুলিশ উকিলকে গোপনে জানিয়ে দিল যে এটা 'নন্-বেলেবেল কেস' অর্থাৎ এক্ষেত্রে জামিন দেওয়া হবে না। ফলে স্নেহলতার ভাগ্যে কারাবাসের বীভৎস অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হতে থাকলো।

স্নেহকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ এবং ১২০ (ক) ধারায় অভিযুক্ত করা হল। কিন্তু এই অভিযোগ প্রমাণ করতে না পেরে পুলিশ শেষ পর্যন্ত মিসার আদেশ বলেই স্নেহকে জেলে পুরে রেখে দিল।

ধীরে ধীরে স্নেহের শরীরের উপর জেলের প্রভাব দেখা দিল। তার শরীর ভেঙ্গে গেল এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণেই স্নেহকে পরে মুক্তিও দিতে হয়েছিল। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেই ২০ জানুয়ারী ১৯৭৭ স্নেহ হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং পরলোক গমন করেন।

লরেন্স ও স্নেহলতা রেড্ডীর মত ঘটনা ভূরি ভূরি আছে। সকলেই তারা অত্যাচার দমন-পীড়নের শিকার হয়েছিল।

কানাড়া কলেজের (মাঙ্গালোর) ছাত্রনেতা উদয় শঙ্করকে পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। বন্দর পুলিশ স্টেশনে পুলিশ তাকে ভীষণভাবে বেত্রাঘাত করতে থাকে। তাকে জল কিম্বা খাদ্য কিছুই দেওয়া হয় না। আইনের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র এবং বিদ্যার্থী পরিষদের কর্নাটক রাজ্য-শাখার যুগ্ম সম্পাদক শ্রীকান্ত দেশাইকে ধরে নিয়ে গিয়েও পুলিশ প্রচণ্ড মারপিট করে। তারপর সেই অমানুষিক 'এরোপ্লেন' অবস্থায় তাকে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রাখে।

সি পি আই (এম) কর্মী রবীন কলিতাকে মিসায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং এত মারধর করা হয় যে তাকে শেষ পর্যন্ত গৌহাটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তার অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। ফলে পুলিশ তার আত্মীয়স্বজন কাউকেই সেখানে যেতে দেয় না। হাসপাতালে যখন তার চিকিৎসা চলছিল তখনও কিন্তু তার হাতে হাতকড়া পরানো ছিল। হাতকড়া লাগানো অবস্থাতেই রবীন কলিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

নয়াদিল্লির বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে পিক্‌নিক করতে গিয়েছিল হেমন্ত কুমার বিশনয়। পুলিশ সেখান থেকে তাকে ধরে আনে। থানার লকআপে পা দুটো বেঁধে তাকে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তার পা ওপরে, মাথা নিচেয় ঐ অবস্থায় সে ঝুলতে থাকে। তার অনাবৃত শরীরে জলন্ত মোমবাতির ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। নাকে এবং মলদ্বারে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া হয়। এত অত্যাচার সত্ত্বেও সে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তের কথা বলতেই পারে না। কারণ তেমন কোন চক্রান্তে সে ছিলই না। শেষে পুলিশ রণে ভঙ্গ দেয়।

রাষ্ট্রপতি নয়াদিল্লির একটি সভায় যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন সেখানে গুপ্ত প্রচার পত্র বণ্টনের দায়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে রাজেশ ও অনিলকে। এদের বয়স যথাক্রমে পনেরো ও তেরো বছর। পুলিশ নির্দয়ভাবে এদের মারধর করে

প্রাং তারপর পুলিশ থানায় প্রতিটি আনাচ কানাচ পর্যন্ত ঝাড়ু দিতে ওদের বাধ্য করা হয়।

যোগীওয়ারা থেকে পুলিশ দুটি বাচ্চা ছেলেকে হাউজখাস থানায় ধরে নিয়ে আসে। এদের নাম সুনীল ও মনোজ। এই বালক দুটিকে গ্রেপ্তার করার জন্য স্থানীয় কংগ্রেসীরা ভীষণ চাপ সৃষ্টি করেছিল। তাদের খুশী করার জন্য পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করে। তাদের প্রচণ্ড মারপিট করে পুলিশ ইচ্ছামত রচিত এক বিবৃতিতে তাদের দিয়ে সই করিয়ে নেয়।

চণ্ডীগড়ের অ্যাডভোকেট সি এল লক্ষ্মণ পাল জেলের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় তাঁর হাতে হাতকড়া দিয়ে পি জি আই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জেলে থাকার সময় কর্তৃপক্ষ তাঁর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই করেন নি।

পুলিশের ক্রোধ প্রধানতঃ শিক্ষিত সমাজের উপরই কেন্দ্রীভূত ছিল বলে মনে হয়। ২৬জুন ভোর রাতেই ঐ জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০ জনেরও বেশী অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করা হয়। ওদের মধ্যে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও, পি, কোহলিকে পুলিশ এক নাগাড়ে চব্বিশঘণ্টা থানা লকআপে দাঁড় করিয়ে রেখে দেয়। তারপর তাঁর উপর গালিবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে পড়তে লাগলো প্রচণ্ড মার। কখনো জুতো পেটা করা হল, কখনও কনুই এবং মুষ্টিযোগে আপ্যায়ণ করা হল। অনেকবার তিনি মার খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আবার মারধর করা হল। ক্লাশে পড়াচ্ছেন এমন অবস্থায় শিক্ষককে গ্রেপ্তার। ধৃত শিক্ষককে মুক্তি দিয়ে জেল গেটেই আবার গ্রেপ্তার প্রভৃতি ঘটনা ভূরিভুরি ঘটতে থাকলো। ছাত্ররা এক সঙ্গে রুখে দাঁড়ালে অনেক সময় সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার এড়ানো যেত।

নকশালপন্থী ও উগ্রপন্থীদের উপর এই অত্যাচারের জের চলছিল এমার্জেন্সীরও অনেক আগে থেকে। নকশালপন্থীদের সঙ্গে পুলিশের সশস্ত্র সংগ্রামেরও অনেক খবর আসতে লাগলো। কিন্তু এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে নকশালরা কিছু সংখ্যক মাত্র পুরনো ও সেকেলে বন্দুক রাইফেলের সাহায্যে কিভাবে এত বড় সুশিক্ষিত ও সুসংগঠিত পুলিশবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারে।

মিস মেরী টাইলার যাকে ছয় বছর জেলে আটক করে রাখা হয়েছিল,

তিনি ৬ জুলাই ছাড়া পেয়ে জানিয়ে দিলেন যে 'বিহারে গেরিলা বেস তৈরার চেষ্টা' সংক্রান্ত অভিযোগটি পুলিশের তৈরী একটি আষাঢ়ে গল্প। ঐ গোষ্ঠী কোন গেরিলা নয়—শ্রীমতী টাইলার বলেন, ওরা হল বামপন্থী অ্যাক্টিভিস্ট। তারা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অজ পাড়াগাঁয়ে ঘুরে ঘুরে সরল সাদাসিধে কৃষকদের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছে তা হ'ল সুদখোর ও জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে যেন তারা নিজেরাই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ভূমি-সংস্কার আইনগুলিকে কার্যকর করতে সাহায্য করে। জেলে আসার আগে পর্যন্ত তারা একে অপরকে চিনতো না। গ্রেপ্তারের পর হাজারিবাগ জেলের এক নির্জন 'সেলে' মিস টাইলারকে রাখা হয়েছিল। পরে তাঁকে আদালতে নিয়ে যাবার সুবিধার জন্য জামশেদপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ছাড়া পেয়ে বললেন, যে জেলে থাকার কথা মাত্র ১৩৭ জনের সেখানে রাখা হয়েছিল ১২০৯ জনকে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরেই গ্রেপ্তারের সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যায়।

নকশালদের সমস্যা কোন নতুন ব্যাপার নয়। ১৯৬৭ চরম বামপন্থীরা ভারত-চীন সীমান্তের কাছে পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়া নামক এলাকায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে জমিদারদের উৎখাত করে জমি দখলের যে চেষ্টা করে তাই পরবর্তীকালে নকশালপন্থী আন্দোলন নামে খ্যাত হয়।

কর্তৃপক্ষ সারা দেশে চলমান গোপন কাজ সম্পর্কেই বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন। প্রায় এক বছর হয়ে গেল তারা জর্জ ফার্নাণ্ডেজকে গ্রেপ্তারই করতে পারে নি। শ্রীমতী গান্ধী পদস্থ অফিসারদের এক বৈঠকে ডেকে তাদের রীতিমত ভর্ৎসনা করলেন। এতদিন হয়ে গেল তবু ফার্নাণ্ডেজকে কেন ধরতে পারা যাচ্ছে না এই ছিল তার অভিযোগ। একজন অফিসার বললেন, যে তিনি ফার্নাণ্ডেজের দুর্গে ঢুকতে সমর্থ হয়েছেন এবং তাঁর লোক এখন ঐ দুর্গের সদস্য। সুতরাং কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা ফার্নাণ্ডেজকে গ্রেপ্তার করবেন। তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এই প্রতীজ্ঞা গ্রহণ করলেন। সত্যিই তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রাখলেন। ১০জুন কলকাতার চার্চ সংলগ্ন একটি বাড়ি থেকে ফার্নাণ্ডেজকে গ্রেপ্তার করা হল। ফার্নাণ্ডেজের গ্রেপ্তার গোপন কাজের ক্ষেত্রে এক বিরাট আঘাত স্বরূপ।

সঞ্জয়ের চোখে এই গোপন কাজ ছিল একটা অতি সামান্য ব্যাপার। পরিবার পরিকল্পনার নাম করে সে যে সব দমনমূলক কাজ করেছে তার বহু ঘটনাই গোপন প্রচারপত্র মারফৎ ছড়ানো হয়েছিল। বাস্তবিকই, সঞ্জয়

নির্দয়ভাবে ঐ পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে চেয়েছিল। সঞ্জয় এক একজন মুখ্যমন্ত্রীকে ডেকে স্থির করে দিত যে কোন রাজ্যে কত সংখ্যক নাসবন্দী হবে এবং মুখ্যমন্ত্রীরা আবার সেই সংখ্যা নিজ নিজ রাজ্যের আমলাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। সঞ্জয়কে একটু বেশী খুশী করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে রেষারেষিও করতেন। নাসবন্দীকে কে কত বেশী করতে পারে এই নিয়ে হত প্রতিযোগিতা। নাসবন্দীর নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছনো নিয়ে ছিল কথা। কী ভাবে ঐ লক্ষ্যে পৌছনো হল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় সঞ্জয় বা শ্রীমতী ইন্দিরা কারোই ছিল না। লক্ষ্যে পৌছনো গেছে? ব্যস, আর কিছু জানার দরকার নেই। সঞ্জয় চিরকালই কাজটা কিভাবে করা হল তার উপর গুরুত্ব দিত না—তার কাজ ছিল কাজটা হয়েছে কিনা তা দেখা। ফলে জোর করে নাসবন্দীর কাজ এগোতে লাগলো জোরকদমে।

দিল্লির মোহময়ী মহিলা রুকসানা এই সময় দৃশ্যপটে এসে হাজির হয়। সঞ্জয় তার কাছে ভগবান। পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রুকসানার ভূমিকা অসামান্য। রুকসানার কোন সরকারী পদমর্যাদা ছিল না—কিন্তু রূপ ছিল। সে একাই—পাঁচিলে ঘেরা দিল্লি শহরে পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সামনে একখানা জীপ, পেছনে একখানা গাড়ী যেন কোথাকার মহারাণী। পরে সে এক সাক্ষাৎকারে বলেছে যে সঞ্জয় এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে সে ধন্য হয়েছে।

সঞ্জয়কে খুশী করতে উত্তর প্রদেশ সরকার কেন্দ্র নির্দিষ্ট চার লক্ষ নাসবন্দীর জায়গায় পনেরো লক্ষ নাসবন্দী করলো। উত্তর প্রদেশে এজন্য সকল সরকারী দপ্তরের জন্য, জেলার জন্য, শিক্ষকদের জন্য, চিকিৎসা বিভাগের জন্য, ডাক্তারদের জন্য—সবার জন্য আলাদা আলাদা কোটা স্থির করে দেওয়া হল। ঐ 'কোটা' পূর্ণ হলে চাকরিতে উন্নতি আছে, মাইনে বৃদ্ধি আছে—আছে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। কিন্তু ব্যর্থ হলেই সব বন্ধ। প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট কোন কিছুই নেই।

জুলাই মাসে নাসবন্দী কর্মসূচীর উপর জোর দেওয়া হয়—আগস্টে এই কার্যক্রম তীব্ররূপ ধারণ করে। এর ফলে বিক্ষোভ সঞ্চার হতে থাকে। বাধ্যতামূলক নাসবন্দীর বিরুদ্ধে অন্ততঃ ২৪০টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এদিকে জুনে যেখানে নাসবন্দী দৈনিক ছিল ৩৩১ জুলাইতে সেটা হয় ১,৫৭৮ এবং আগস্টে দৈনিক গড়ে ৫৬৪৪টি করে নাসবন্দীর অস্ত্রোপচার হতে থাকে।

মুড়িমুড়কির মত এই অস্ত্রোপচার হতে থাকে, বয়স—বিবাহ, শারীরিক অবস্থা প্রভৃতি কোনকিছুর প্রতি বিন্দুমাত্র নজর দেওয়া হয় না।

নাসবন্দী নিয়ে প্রথম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে সুলতানপুর জেলার নারকাদিহি গ্রামে। দিনটা ছিল ২৭ আগস্ট। বিভাগীয় কমিশনার কিছু লোককে সঙ্গে ঐ গ্রামে এসেছিলেন লোকদের নাসবন্দী করাতে উৎসাহিত করবার জন্য। কিন্তু গ্রামের লোক একসঙ্গে মিলিত হয়ে ওদের সকলকে গ্রামের বাইরে তাড়িয়ে দেয়। এতে বিভাগীয় কমিশনার মহাশয় ক্ষেপে যান এবং পুলিশকে গুলি চালানোর আদেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গুলিতে ১৩ জন গ্রামবাসী ধরাশায়ী হয়ে পড়েন। এছাড়া বহুলোক বুলেটের আঘাতে আহত হন।

পুলিশ যেন বন্যজন্তুর মত ক্ষেপে যায়। জেলার কর্তা ব্যক্তির কাছ থেকে আদেশ পেয়ে তারা তক্ষুনী গ্রাম ঘিরে ফেলে এবং সবাইকে ধরে ধরে জোর করে নাসবন্দী করে দেয়। গ্রামের পর গ্রামে সশস্ত্র পুলিশের এই তাণ্ডব চলতে থাকে। ভয় ও আতঙ্ক সকলকে শঙ্কিত করে তোলে। বৌ-ঝিদের সম্মান বাঁচাতে এবং নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে কৃষকরা গম ক্ষেতে ধান ক্ষেতে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগলো। এককালে যখন চিঠি দিয়ে ডাকাতরা আসতো তখনও গ্রামবাসীরা ভয়ে এমনভাবে ঘরছাড়া হয়নি, আর এখন পুলিশের ভয়ে লোকে ঘরে থাকতে সাহস পর্যন্ত করতো না।

নাসবন্দী অস্ত্রোপচারের প্রতিদিনের রেকর্ড এই রাজ্যে যখন ৬০০০-যে উঠে যায় তখন ১৮ অক্টোবর আবার মুজঃফর নগরে হাঙ্গামা হয়। মুজঃফর নগরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পরিবার পরিকল্পনা শিবিরের আয়োজন করতেন এবং সেজন্য পয়সা আদায় করতেন জনসাধারণের কাছ থেকে। কেউ দিতে না চাইলে কিম্বা দিতে না পারলে মিসা কিম্বা ডি আই আর-য়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হত। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে কিম্বা রেল স্টেশন থেকে শিকারী পুলিশের দল নতুন নতুন লোক ধরে নিয়ে আসতো।

এই জেলারই একটি এলাকা থেকে বিবাহিত কিম্বা অবিবাহিত, শিশু অথবা শিশু নয়, তরুণ অথবা বৃদ্ধ সকলকে ধরে এনে নাসবন্দী করে দেওয়া হচ্ছিল। তিন দিন ধরে সমানে ঐ এলাকায় ঐ কাণ্ড চলছিল। একদিন যখন ১৮টি যুবককে ধরে এনে পরিবার পরিকল্পনা শিবিরের মধ্যে পুরে দেওয়া হল—তখন বিক্ষোভ চরমে উঠলো। চারিদিক থেকে ওদের মুক্তির জন্য দাবি উঠলো। তারপর উত্তেজিত জনতা শিবির লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুঁড়তে লাগলো। পুলিশ তখন কাঁদানে গ্যাস সেল ফাটালো। তাতে কোন কাজ হল

না। জনতা তখন দুর্বার গতিতে শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি চললো—পুলিশের গুলি খেয়ে পঁচিশটি দেহ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে গেল। আরও আটজনকে পুলিশ কোথায় যেন গুম্ করে দিল। আজও পর্যন্ত তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। এই ঘটনাটি এ অঞ্চলে 'মিনি জালিয়ানওয়ালাবাগ' নামেই পরিচিত। ঐ এলাকায় কর্ফু জারি হল এবং কার্ফু আদেশ ভঙ্গ করার জন্য অপর একটি এলাকার অন্ততঃ চার-জনকে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়।

সেন্সরশিপ সংবাদপত্রের উপর থাকলেও লোকের মুখে মুখে এইসব ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। মুজঃফরনগর থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরবর্তী কেরানাতে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল প্রস্তু বেরিয়েছিল। সমাজ-সেবীদের অনুরোধে মিছিলের লোক-জনেরা যখন গৃহাভিমুখী হল তখন পুলিশ তাদের পিছু নিল এবং বিক্ষোভকারীর আত্মরক্ষার্থে একটি মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিলে পুলিশ তার উপর চড়াও হয়। নির্বিচারে সেখানে গুলি চালিয়ে তারা তিনজনকে হত্যা করে।

বস্তী জেলার একজন ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী এবং একজন গ্রামসেবক যখন পরিবার পরিকল্পনার পরিসংখ্যান গ্রহণ করতে যায়, তখন ওখানকার ক্ষিপ্ত জনতা তাদের তিনজনকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এতে পুলিশ ভীষণভাবে চটে যায়। তারা প্রতিশোধ নেবার জন্য তখন বন্য পশুর ন্যায় আচরণ করে এবং তাদের অত্যাচার নৃশংসতা ও বর্বরতার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

হরিয়ানাতেও বহুলোক নাসবন্দীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সরকারী অফিসারদের তারা বাধ্যতামূলকভাবে নাসবন্দী করতে চাওয়ার জন্য প্রতিরোধ করতে থাকে। তখন পুলিশ এদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করতে শুরু করে এবং এদের উপর চালায় বিভিন্ন ধরণের অকথ্য অত্যাচার। গুরগাঁওয়ের একজন যুবককে গ্রেপ্তার করে তাকে অন্ধকার সেলের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়, কারণ ঐ যুবকটি তার জাতির লোকেদের বাধ্যতামূলক নাসবন্দীর শিকার না হবার জন্য অনুরোধ করেছিল এবং সে কথা প্রচার করেছিল। ঐ যুবকের 'ইন্টারোগেশনের' সময় তার চুল এবং নখগুলি এক এক খানা করে টেনে ছিঁড়ে দেওয়া হয়। একমাস পরে যুবকটিকে যখন মুক্তি দেওয়া হয় সে তখন তার শ্রবণ-শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

মেহেন্দরগড়ের একজন তরুণ সরকারী অফিসার যার একটিও সন্তান ছিল না

—সে নাসবন্দী করতে অস্বীকার করায় তার উপর এমন অত্যাচার চালানো হয় যে, শেষ পর্যন্ত সে পাগল হয়ে যায়।

রোহতকের ঘটনা। এক বৃদ্ধা শিক্ষিকাকে জেলা শিক্ষা অফিসার দুটি নাসবন্দীর 'কেস' আনতে বলেন, কেননা না হলে ঐ শিক্ষিকাকে মাইনে দেওয়া যাবে না। সাদা চুলের ঐ শিক্ষিকা বহু চেষ্টা করেও যখন কাউকে পেলেন না, তখন তাঁকে রাস্তা থেকে দুটি পাগলকে ধরে আনতে বলা হল। অবশেষে ভদ্র মহিলা মাইনে পেয়েছিলেন।

বিহারে আনুগত্য প্রকাশের একমাত্র রাস্তা ছিল নাসবন্দী এবং উপজাতিরা এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অত্যাচারিত হয়েছে। ছোটনাগপুর আদিবাসী অঞ্চলের অন্তর্গত সিংভূম জেলার ডেপুটি কমিশনারই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি পরিবার পরিকল্পনায় ভালো কাজের জন্য প্রথম পুরস্কার পান। রাঁচি জেলাও এই ব্যাপারে পিছিয়ে থাকে না। এটাও আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা। ভোজপুর জেলার সকলের উপরই বাধ্যতামূলকভাবে নাসবন্দী করার জন্য অত্যাচার চালানো হয়।

পূর্ব পাটনাতে বাধ্যতামূলক নাসবন্দীর জন্য লোকে ক্ষেপে গেলে পুলিশ তাদের উপর গুলি চালিয়ে একজনকে হত্যা করে এবং বহু জনকে আহত করে। সেন্সরশিপের গুণে খবরের কাগজে এই ঘটনার সরকারী ভাষ্য প্রকাশিত হয় যাতে বলা হয় যে ফুটপাত থেকে বেআইনী বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে পুলিশকে গুলি চালাতে হয় এবং তাতে একজন মারা যায়। কিন্তু মজা হল পরিবার পরিকল্পনার সুফল ব্যাখ্যা করার জন্য যুবকংগ্রেসীরা শহরের বিভিন্ন জায়গায় যেসব শিবির খুলে বসে সেগুলি রাতারাতি তারা গুটিয়ে নেয়।

কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের জন্য ৩০০,০০০ নাসবন্দীর 'কোটা' বেঁধে দেন। বিহারে এজন্য 'গোল্ড মেডেল' ঘোষণা করায় প্রকৃত নাসবন্দীর সংখ্যা ৬,৫০,০০০ লক্ষে গিয়ে পৌঁছয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিন্ধ্যেশ্বরী দুবে এতে উৎসাহিত হয়ে বছরের শেষে দশলক্ষের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছবার জন্য অফিসারদের উৎসাহিত করেন।

বিহারের এই 'ভালো কাজ' দেখে সঞ্জয় চার চারবার এইরাজ্য সফরে আসেন। কংগ্রেস নেতা ও সরকার তাঁকে খুশী করার সব ব্যবস্থা করেন। প্রদেশকংগ্রেস প্রধান সীতারাম কেশরী সভায় সঞ্জয় সম্পর্কে বলেন, রাজনৈতিক আকাশে নতুন জ্যোতিষ্কের নাম হল সঞ্জয় গান্ধী। যাইহোক সঞ্জয়ের সম্বর্ধনা ও তার জন্য রাজসিক ব্যবস্থা করতে বিহার সরকারের খরচ হয়েছিল

দশ লক্ষ টাকা—যার অর্ধেক দিয়েছিলেন বিহার এবং বাকী অর্ধেক দিয়েছিলেন শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রের দিকপালরা।

পাঞ্জাবে নাসবন্দীর অপারেশন করতে গিয়ে কয়েকজনের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে ঐ রাজ্যে বেশ গণ্ডগোল হয়।

পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে যে সব অত্যাচার হয়েছে তার কোন খবরই সংবাদপত্রে ছাপা হয় নি। ছাপা হলেও শ্রীমতী গান্ধী বা তাঁর বাসভবনের কেউ সে কথা বিশ্বাস করতে রাজি ছিলেন না। যদিও তাঁরা ভালোমতই জানতেন যে, নাসবন্দীর জন্য শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগও তাদের রিপোর্টে এই সংক্রান্ত অত্যাচারের কয়েকটি ঘটনা প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সচিবকে জানিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শাহনওয়াজ খান নিজে মুজঃফরনগর সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর হাতে দিয়েছিলেন। উনি বলেন, এ রিপোর্টের বক্তব্য হল ফাঁপানো বক্তব্য। একটু আধটু শক্তি প্রয়োগ হতেই পারে তবে, এত হয় নি। এই রিপোর্টের কপি ফকরুদ্দিন আলি আমেদকেও দেওয়া হয়। তিনি রিপোর্ট পড়ে মর্মাহত হন। তিনি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন এবং নিজের ডায়েরীতে এর উল্লেখ করেন।

নিয়মানুযায়ী যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী নাসবন্দীর সার্টিফিকেট দেখাতে না পারলে দিল্লি প্রশাসন তাকে মাইনে দিতেন না। দিল্লি করপোরেশনের প্রাথমিক স্কুলের দশ হাজার শিক্ষকের প্রত্যেককে পাঁচটি করে নাসবন্দীর 'কেস' আনতে বলা হয়। প্রধান শিক্ষকদের এই অনুমতি দেওয়া হয় যে তারা ততক্ষণ ছাত্রছাত্রীকে স্কুলেই আটক রাখতে পারবেন যতক্ষণ না তাদের পিতা-মাতার কেউ একজন নাসবন্দী করান। কতিপয় বাণিজ্য প্রতিনিধিকে দিল্লিতে ডেকে নাসবন্দীর 'কোটা' গ্রহণের জন্য বলা হয়।

এ দিকে সরকারও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের জাতীয় নীতি ঘোষণা করেন। সঞ্জয় সন্তানের সংখ্যা দুটি করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী এবং পরিবারের অন্যান্যরা তিনটি সন্তান চাইছিলেন। পরে ঐ সংখ্যাই জাতীয় নীতি হিসাবে গৃহীত হয়। এই নীতির উদ্দেশ্য হল বর্তমানে হাজার প্রতি জন্মহার যেখানে ৩৫ আছে সেখানে ১৯৮৪ সালের মধ্যে ঐ হার হাজার প্রতি ২৫ করা। ততদিনে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২'৪ থেকে ১'৪-য়ে নেমে যাবে। বিবাহের ন্যূনতম বয়সও বাড়িয়ে মেয়েদের পক্ষে করা হয় আঠারো বছর এবং ছেলেদের পক্ষে একুশ বছর। তাছাড়া বাধ্যতামূলক নাসবন্দীর জন্য আর্থিক পুরস্কার তো ছিলই।

পরিবার পরিকল্পনা ছাড়া সঞ্জয়ের আরেকটা গোঁ ছিল—দিল্লীকে সে সুন্দরী নগরী করবেই। তাই দিল্লি ডেভেলপমেণ্ট অথরিটির প্রধান জগমোহনকে সঞ্জয় প্রায় প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করতো যে তিনি দিল্লির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নতুন কী করছেন। অনুমোদিত বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে দেবার পর সেই সব লোকগুলো এদিক ওদিক গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তুর্কমান গেট অঞ্চলেও অনেকে এসেছিল। ওখানে প্রধানতঃ মুসলমানরা থাকলেও কিছু কিছু হিন্দুও ছিল। যাই হোক বৈশাখীর দিন ( নতুন ফসল ঘরে তোলার দিন ) ১৩ এপ্রিল ঐ এলাকায় বেশ কিছু বুলডোজার এসে জমা হয়েছিল।

বুলডোজার দেখে ভয় পেয়ে বস্তীবাসীরা ১৬ এপ্রিল এইচ. কে. এল. ভগতের কাছে গেলেন। তিনি ওদের প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাদের বাড়িঘর ভাঙ্গা হবে না। দীর্ঘ দিনের এই বস্তীকে এক কথায় উড়িয়েই বা দেওয়া হবে কি করে? কিন্তু বুলডোজারগুলি ওখান থেকে চলে গেল না। ১৯ এপ্রিল বুলডোজারগুলি হঠাৎ আবার সবল হয়ে উঠলো এবং তুর্কমান গেটের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো। উপায়ান্তর না দেখে বস্তীবাসীরা দরগা এলাহীর কাছে বুলডোজারগুলির গতি থামানোর জন্য এগিয়ে গেল। বস্তীবাসীদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগলো।

ঠিক দুপুরের সময় ট্রাক ভর্তি পুলিশ ও রাইফেলধারী সি আর পি এসে হাজির হল। ধাক্কাধাক্কি স্লোগান প্রভৃতি চললো কিছুক্ষণ। বিক্ষোভ দেখলেও, হৈচৈ করলেও সম্পূর্ণ শান্তি ছিল। পুলিশই তাদের উপর প্রথম ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করে এবং জনতাও তার প্রতিরোধে এগিয়ে যায়।

প্রায় দেড়টা নাগাদ দরিয়াগঞ্জ সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট লাঠি চার্জের অর্ডার দেন। নৃশংসভাবে লাঠি চার্জ হয়। মানুষ এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। বহুজন আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু তারপরেই শুরু হয়ে যায় পুলিশে-মানুষে নিয়মিত লড়াই। মেয়েরাও হাতা-খুন্তি নিয়ে তাদের কর্তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে যায়।

ঘণ্টা তিনেক ধরে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা পুলিশকে ঠেকিয়ে রাখলো। পুলিশও খুব ক্ষেপে গিয়েছিল। প্রথমে কাঁদানে গ্যাস এবং তারপর গুলি চালাতে থাকলো তারা। পরবর্তী ধাপ হিসাবে কার্ফুর আদেশ এল এবং তার মধ্যেই আবার চলতে শুরু করলো ঐ দৈত্যাকারের বুলডোজারগুলো। দেখতে দেখতে ১০০০ খানা বাড়ি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো এবং অন্ততঃ পক্ষে ১৫০ জন তাতে প্রাণ হারালো। গ্রেপ্তার হল ৭০০ জন। তবু তাদের রাগ কমে না—

পঁয়তাল্লিশ দিন ধরে তারা কার্ফু আদেশ বলবৎ রাখলো। সেই সুযোগে ঐ এলাকা বাড়ি ভাঙ্গা চলতে থাকলো পুরোদমে। আর বাড়ি ভাঙার আগে পুলিশের লোকজন লুঠপাটও করতে থাকলো।

সেন্সর কড়া নজর রাখলেন। কোন সংবাদ পত্রেই এই খবর বেরুলো না। কিন্তু তুর্কমান গেটের নারকীয় অত্যাচারের কথা মুখে মুখে দিল্লিতে এবং পরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। সরকারকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হল যে কিছু হত্যা হয়েছে। কিন্তু সরকারী প্রেস নোটে কখনই সত্য কথা বলা হল না।

তুর্কমান গেট এলাকা যখন এইভাবে পরিষ্কার করা হল তখনও কিন্তু দিল্লি ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি জানে না যে ঐ ফাঁকা জায়গা নিয়ে তারা কী করবে। তিন মাস পরে ওখানকার সম্পর্কে একটি খসড়া পরিকল্পনা রচিত হল যাতে ওখানে একটি পঞ্চাশতলার কমার্শিয়াল বিল্ডিং নির্মানের প্রস্তাব করা হল।

জোর করে যাদের বিতাড়িত করা হয়েছিল তারা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল যমুনার তীরে। সেখানে কোন সুযোগ সুবিধাই ছিল না। এমন কি পানীয় জলটুকু পর্যন্ত সেখানে পাওয়া যেত না। ঘটনার বেশ কিছুদিন পর শেখ আবদুল্লা ওখানকার সদ্য-উদ্বাস্তুদের দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি তুর্কমান গেটের ঘটনাকে 'কারবালা' বলে বর্ণনা করেন। শেখ বেদনার্ত হৃদয়ে ওখানকার অবস্থা দেখে যান। এই এলাকার বাসিন্দারা যখন আবার শ্রীমতী গান্ধীর কাছে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানাতে এল তখন তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করলেন না। দেখা করলো সঞ্জয়। সে বললো, 'তোমরা শেখের কাছে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছ। এজন্য তোমাদের শিক্ষা পেতে হবে।' সে আরও বললো যে 'পুলিশকে আক্রমণ করার' জন্য সেখানকার জনসাধারণকে শাস্তি পেতেই হবে।

সঞ্জয়ের পাঁচদফা কর্মসূচীর মধ্যে কিন্তু বস্তী সাফাইয়ের কোন কথা ছিল না। প্রাথমিক ভাবে তার কর্মসূচী ছিল চারদফা পরে সেটা হয় পাঁচদফা। শ্রীমতী গান্ধীর বিশদফার মতই পাঁচদফাও খুব প্রচার করা হয়। সঞ্জয়ের পাঁচদফা হল পরিবার পরিকল্পনা, বৃক্ষরোপণ, পণপ্রথা নিরোধ, শিক্ষাপ্রসার এবং জাতিপ্রথা বিলোপ।

কর্মসূচী হিসাবে এটা একান্তই নির্দোষ কর্মসূচী, কিন্তু যে পদ্ধতিতে এই কর্মসূচীকে রূপায়ণের চেষ্টা করা হয় তাতে সকলেই খুব রেগে যায়। এই রাগের আরও একটা কারণ ছিল তাহল সঞ্জয়ের সব কাজেই সংবিধান বহির্ভূত কর্তৃত্ব ফলানোর প্রবণতা। যে ক্ষমতা সে ভোগ করতো তার

প্রতি সকলেরই সন্দেহপূর্ণ নজর ছিল। কিন্তু যেহেতু সে ছিল ক্ষমতার উৎস স্বরূপ সেই হেতু আত্ম স্বার্থরক্ষায় মশগুল কংগ্রেসীদের কাছে একান্ত ভাবে পূজ্য ব্যক্তি।

সঞ্জয়ও সময় সুযোগ বুঝে তার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতো। এটা দেখা গেছে মারুতি, পাঁচদফা কর্মসূচী, অথবা যুব কংগ্রেসের ক্ষেত্রে। সেই সঙ্গে সঞ্জয়ের সমালোচকরাও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। সঞ্জয় তাদের হয় আতঙ্কিত করেছে আর না হয় শাস্তি দিয়েছে। একজন কণ্ট্রাক্টর যিনি মারুতির বাড়ির একাংশ তৈরী করেন তিনি সঞ্জয়কে ঠিকমত খুশী করতে পারেন নি বলে সঞ্জয় তাকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করে। সঞ্জয়ের ইচ্ছানুযায়ী কাজ না করায় দিল্লির ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ রাজাগোপালনকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীতে ট্রান্সফার হয়ে যেতে হয়।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান এয়ার মার্শাল পি, সি, লালকে যে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল তার পেছনেও ছিল সঞ্জয়ের হাত। লাল ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। ৩১ জুলাই ১৯৭৬ তাঁর অবসর গ্রহণের কথা। তিনি তাঁর উত্তরসূরী ঠিক করে রেখে যেতে চাই-ছিলেন। তাঁর পরেই ছিলেন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভি, সত্যমূর্তি। মন্ত্রী রাজবাহাদুর এবং প্রধানমন্ত্রীকে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫-য়ে লাল বলেন যে, তাঁর অবসর গ্রহণের পর সত্যমূর্তি চেয়ারম্যান হতে পারেন। রাজবাহাদুর এবং শ্রীমতী গান্ধী উভয়েই এই প্রস্তাবে রাজী। রাজীব এর বিরুদ্ধে ছিল।

অক্টোবরে রাজবাহাদুর লালকে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী তিনজন পাইলটের পদোন্নতি ঘটাতে চান। লাল আপত্তি করেন, কেননা কোন বিচারেই তাঁরা প্রমোশন পাওয়ার যোগ্য নন। লালের এই 'না' প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষুব্ধ করে। রাজবাহাদুরও মন পরিবর্তন করে ফেলেন। অতএব সত্যমূর্তির চেয়ারম্যান হওয়ার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। রাজবাহাদুর লালকে এ কথা জানিয়ে দিলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে যান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি এমন খবর পেয়েছেন যা সত্যমূর্তি খুব একটা 'সৎ' লোক নন। 'ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সে যে কী চলছে সে সবই আমি জানি।'

ডিসেম্বরে লাল কয়েকজনকে ট্রান্সফার করেন। রাজাবাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে লালকে জানিয়ে দেন যে তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে যেন কাউকে ট্রান্সফার করা না হয়। লাল বলেন, এই অর্ডার এসেছে ধবনের কাছ থেকে। জানুয়ারী ১৯৭৬-য়ে রাজবাহাদুর লালের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন যে, বোর্ড অব ডিরেক্টরসে

কোন পরিবর্তন করা হবে না। ফেব্রুয়ারীতে যখন বোর্ড পুনর্গঠিত হয় তখন দেখা যায় বোর্ড থেকে সত্যমূর্তি বাদ পড়েছেন এবং একজন অধস্তন অফিসারকে সেখানে নেওয়া হয়েছে। লাল রাজবাহাদুরের কাছে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী লালের কাজে মোটেই খুশী নন।

এপ্রিলে লাল পদত্যাগ পত্র দেন এবং ছুটি চান। রাজবাহাদুর তাঁর দপ্তরের একজন যুগ্ম সচিবকে লালের কাছে পাঠিয়ে অনুরোধ করেন যে লাল যেন এখন ছুটি না নেন। লাল ছুটির আবেদন প্রত্যাহার করেন। তার পরেই রাজবাহাদুর ধবনের কাছ থেকে খবর পান যে লালকে তো যেতেই হবে। লাল তখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

১৩ এপ্রিল, ১৯৭৬ লাল দেখেন তাঁর অফিসের বাইরে সাদা পোষাকের পুলিশ এবং লবিতে একজন ডি এস পি। লাল ১৯ এপ্রিল থেকে ছুটিতে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু তার আগেই অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক থেকে ১২ এপ্রিল এক সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল যে লাল ছুটিতে আছেন এবং পরে ঐ মন্ত্রক থেকে আরেকটি চিঠি ছাড়া হয় যাতে বলা হয় যে লালের চাকরী খতম করে দেওয়া হল। এর পরেই লালের ট্রান্সফার অর্ডারগুলি বাতিল করা হয় এবং যে তিনজন পাইলটকে তিনি 'যোগ্যতা সম্পন্ন' নয় বলে প্রমোশন দিতে রাজী হন নি তাদের প্রমোশন মঞ্জুর করা হয়।

অতীব পরিচিত পদ্ধতিতেই লাল ও তার ভাইকে আয়কর বিভাগের লোকজন উত্যক্ত করতে থাকে। পরে লাল বলেছেন, কথায় কথায় প্রধানমন্ত্রী একদিন তাঁকে বলেছিলেন যে, সাধারণ প্রধানমন্ত্রী যদি কোন অফিসারের উপর রেগে যান তাহলে তিনি তার সঙ্গে আর দেখাই করেন না। লাল বুঝতে পারছিলেন যে শ্রীমতী গান্ধী সেদিন কী বোঝাতে চেয়েছিলেন।

১১ জানুয়ারী, ১৯৭৬ নৌবহরের একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বংশীলালের সঙ্গে সঞ্জয়ও বোম্বাই যায়। প্রথমেই তাদের রাগের কারণ হয় এই জন্য যে এম-ই-এস বাংলোর সবচেয়ে ভালো ঘর 'দিমুক'য়ে তাদের থাকার ব্যবস্থা না করে অন্য জায়গায় করা হয়। 'দিমুক'-য়ে থাকার ব্যবস্থা হয় আর্মি চীফ এবং এয়ার চীফ মার্শালের জন্য। বংশীলাল নৌবাহিনীর প্রধান এস, এন, কোহলীকে তাঁর ক্ষোভের কথা জানান।

তারপর আনুষ্ঠানিক ভোজ সভাতেও বসার ব্যাপারে গণ্ডগোল করা হয়। টেবিলের সারীতে প্রথম টেবিলের প্রথম দুটি আসন রাখা হয় প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর স্ত্রীর জন্য। তারপর রাজ্যপাল ও তাঁর স্ত্রী, বংশীলাল ও তাঁর স্ত্রী এবং তারপর

ভুজন ফ্ল্যাগ অফিসারের আসেন। সামরিক বাহিনীর প্রধানদের আসন রাখা হয় অন্য একটা টেবিলে। সঞ্জয়ের আসন রাখা হয় নৌবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে। বংশীলাল প্রথম টেবিলে সঞ্জয়ের জন্য আসন চাইছিলেন। নৌবাহিনীর প্রধান কোহলী বললেন, না, সেটা সম্ভব নয়। কোহলীর কথা শুনতেই বংশীলালের মুখ থেকে যে ভাষা বেরিয়ে এল সেটা অতি নিম্নস্তরের গালাগালি। এটাই বংশীলালের অভ্যাস। কেউ অবাধ্য হলেই বংশীলাল তাঁকে নোংরা ভাষায় গালাগালি দিতেন। নৌবাহিনীর অফিসারদের সামনে এই রকম গালাগালি দেওয়ায় কোহলী অবিলম্বে পদত্যাগ করতে উদ্যত হন। এমনিতেও তাঁর আর মাত্র তিনমাস পরে অবসর গ্রহণের কথা। বংশীলাল পদত্যাগের কথা শুনেই কেমন হকচকিয়ে যান। এজন্য তিনি ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুর পাল্টে ফেলেন। বংশীলালের স্ত্রী ভোজসভায় না যাওয়ায় অগত্যা সঞ্জয়কে বংশীলাল সেখানে বসাবার ব্যবস্থা করেন।

বংশীলালের মত শুক্লাও ক্ষমতা মদমত্ত হয়েছিলেন। শুক্লার কাজেরও একটা প্রিয় জায়গা ছিল বোম্বাইয়ের ফিল্ম শিল্প। শুক্লা প্রযোজক, পরিচালক ও শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে নিজের ইচ্ছা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। কিশোর কুমার দিল্লিতে যুব কংগ্রেসের সম্মেলনে গান গাইতে না যাওয়ায় শুক্লার রোষের শিকার হন। কিশোরের গান রেডিও টিভিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঠিক তেমনি শুক্লার বিরাগভাজন হওয়ার জন্য বহু চলচ্চিত্রই সেন্সরে আটকে যায়।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের প্রত্যেকেই ক্ষমতার অপব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সোনিয়া, শ্রীমতী গান্ধীর বড় ছেলের ( রাজীব ) বউ—জাতে ইটালিয়ান তার কাছে ছিল ইটালিয়ান পাসপোর্ট। নিয়ম মাফিক নব্বই দিনের মধ্যে এলিয়েন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী পাস পোর্ট রেজিস্ট্রি করা দরকার। কিন্তু সোনিয়া তা করে নি। সরকারী সংস্থা এল আই সি'র সে এজেন্ট ছিল। তারপর মারুতী কনসালটেন্সী ফার্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। সঞ্জয়ের স্ত্রী মেনোকা 'সূর্য' নামে একটি পত্রিকা শুরু করে। বলা বাহুল্য প্রধানমন্ত্রীত্বের নামের সুযোগ গ্রহণ করে 'সূর্য' অঢেল বিজ্ঞাপনের মালিক হয়।

তারপর ধরা যাক ইউনুসের কথা। তাঁর মুখে একটা কথা লেগেই থাকতো 'পকড়লো' ( গ্রেপ্তার কর )। তিনি পশ্চিম জার্মানীর সাংবাদিকদের 'হিটলার-মনোভাবাপন্ন, বৃটিশদের 'পাগল' এবং আমেরিকানদের 'অভদ্র' বলেছিলেন। আর প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে ইউনুস উল্লেখ করেছিলেন ফুটবল খেলোয়াড়'

বলে। তবুও ইউনুসই প্রেস সেন্সরশিপ শিথিল করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিদেশী সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে এটা করেছিলেনও।

সেন্সর ব্যবস্থা পার্টি এবং ব্যক্তিগত স্বার্থেই ব্যবহৃত হত। কোন সংবাদ বা কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেসের বিবৃতিও অনেক সময় সেন্সর পাশ করতেন না যদি না তা শুকলার মনঃপূত হত। শুকলা আবার ধবন ও তার মাধ্যমে সঞ্জয়ের সঙ্গে এই ব্যাপারে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। শুকলা যে রাজ্যেই যেতেন, সেখানে গিয়ে তাঁর প্রথম কাজ ছিল সেন্সরকে বলে দেওয়া যে তাঁরা যেন কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের খবর একেবারেই পাশ না করেন। মুখ্যমন্ত্রীরা সেন্সরশিপ ব্যবস্থাকে নিজেদের বিরোধীদের খবর ব্ল্যাক করার জন্য কাজে লাগতেন। পাঞ্জাবের কংগ্রেস সভাপতি মহিন্দার সিং গিল কিছুতেই তাঁর বক্তব্য খবরের কাগজে প্রকাশ করতে পারতেন না কারন মুখ্যমন্ত্রী জইল সিং সেন্সরকে বিপরীত নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের তথ্যমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী সেন্সরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তাঁর গোষ্ঠী বিরোধী কোন খবর যেন ছাপা না হয়।

দুটি ইংরাজী সাময়িক পত্রিকা জরুরী অবস্থাজনিত আইনকানুনের বিরোধিতা করায় প্রকাশনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। 'আপত্তিজনক বিষয় প্রকাশ আইন' লঙ্ঘন করায় মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার 'ওপিনিয়ন' পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। মাসিক 'সেমিনার' পত্রিকাকে ১৫ জুলাই থেকে প্রকাশিতব্য সকল ম্যাটার সেন্সরশিপের উদ্দেশ্যে পূর্বাহ্নেই দেবার জন্য সরকার আদেশ দেন। সেমিনার ঐ আদেশ মেনে নেয় নি। পরিবর্তে তারা পত্রিকার প্রকাশনাই বন্ধ করে দেয়। সেমিনার পত্রিকার রমেশ থাপার ও তাঁর স্ত্রী রাজ জানান, 'আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত অধিকারকে এভাবে বিসর্জন দিতে পারি না'। যাই হোক এইভাবে 'সেমিনার' ও 'ওপিনিয়ন' কাগজ দুটির অকাল মৃত্যু ঘটে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মিসার প্রয়োগ এক রকম স্বীকৃত ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। কেরলের মুসলিম লীগ শাসক দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা সরকারের বিরোধিতা করছিল। ফলে তাদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। জেলের মধ্যে আবার এদেরই কানে মন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছিল যে, শাসক দলে যোগদান করলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। ঐ সময়ই গ্রেপ্তার এবং কারাবাসের ভয় দেখিয়ে কেরল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলের সংসর্গ ছাড়তে ও শাসক কংগ্রেসে যুক্ত হতে বাধ্য করা হয়।

কিন্তু তা হলেই বা কি? কেবল কংগ্রেস এমারজেন্সীর সমালোচনা করেই চলেছিল। তখন ওম মেহতার চাপে পড়ে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা কেরল কংগ্রেসের নেতা কে, এম, জর্জ ও তাঁর সহকর্মীদের দিল্লি আসতে বাধ্য করে। সেখানে তাদের বলা হয় যে হয় তারা শাসক দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে মন্ত্রীসভায় স্থান নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হোক, আর না হয় জেলের দরজা তাদের জন্য খোলাই আছে।

হরিয়ানার এক ফ্যাক্টরী ম্যানেজার বংশীলালের নিজস্ব লোককে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ায় বংশীলাল ঐ ম্যানেজারকে মিসায় গ্রেপ্তার করানোর ব্যবস্থা করেন। ম্যানেজারের পক্ষ থেকে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে পর্যন্ত দরবার করা হয়। কিন্তু তিনি এর জন্য কিছুই করেন নি। মনে হয় মিসা ব্যবহারের সম্পূর্ণ পৃথক অধিকার দেওয়া ছিল।

একদিকে যেমন মিসায় অপব্যবহার হচ্ছিল অপরদিকে তেমনি সারা দেশে জনগণ গ্রেপ্তারও হচ্ছিলেন। গুজরাটের জনতা সরকার ১৫ আগস্ট, ১৯৭৬ আমেদাবাদ থেকে দাণ্ডি পর্যন্ত এক পদযাত্রার আয়োজন করেন। ১৯৩০ সালে গান্ধীর দণ্ডী মার্চের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য ছিল। সর্দার প্যাটেলের মেয়ে মণিবেন প্যাটেল এর নেতৃত্ব করেন। কিন্তু তাঁকে ছাড়া পদযাত্রার আর সকলকে গ্রেপ্তার করা হয়। মণিবেনকে গ্রেপ্তার না করার জন্য দিল্লির বিশেষ নির্দেশ ছিল। তিনি ২২ দিনে দাণ্ডিতে পৌছান।

আগস্ট মাসেই গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুভাই প্যাটেলকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

এই ধরণের নির্বিচার গ্রেপ্তারের ফলে বিদেশে যেসব ভারতীয় আছে তাদের সম্পর্কে একটা আশা এখানকার মনে জাগছিল, তাহল এবার হয় তো তারা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করবে। কয়েকটি বিদেশী সংবাদপত্র শ্রীমতী গান্ধীকে আক্রমণের জন্য এসব ঘটনা তুলে ধরতে তিনি খুব চটে গেলেন। প্রকৃত পক্ষে ভারতের জরুরী অবস্থা জারির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ব্যক্তি বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের এই কথাই বললেন যে, কীভাবে ভারতে স্বাধীনতা নামক বস্তুটি একটু একটু করে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

ভারতীয় বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রাম জেঠমালানিকে মার্কিন সরকার ২৭ আগস্ট রাজনৈতিক আশ্রয় দান করেছিল। কেরলে সরকার বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার পর জেঠমালানির মনে হয়েছিল যে এই বার হয়তো তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। সেই জন্য তিনি ২৮ এপ্রিল বিমানে মন্ট্রিলের

( কানাডা ) উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি পৌছান মে মাসে।

জেঠমালানি পরে ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে ভারতীয় বার কাউন্সিলের সহকারী চেয়ারম্যানের কাছে একটি চিঠি লেখেন। এ দিকে জেঠমালানি তখন তুলনামূলক সংবিধান বিষয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। যাই হোক তাঁর চিঠিতে তিনি লেখেন, 'একথা আমি বিশ্বাস করি না আপনাদের বিবেক এত দুর্বল ও হীন হয়ে গেছে যে স্বৈরতন্ত্র ও চক্রান্তের মধ্যেও ভালো কিছু আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন। শ্রীমতী গান্ধীর বড় বড় কথার আওতায় এসে আমাকে অন্ততঃ একথা বলতে আসবেন না বিভিন্ন দিকে ভারতের উন্নতিতে আপনি খুশী হয়েছেন। মুসোলীনী এবং হিটলার শ্রীমতী গান্ধীর তুলনায় অনেক বেশী ভালো কাজের নজীর তুলে ধরেছিলেন।......আমি জানি ভারতের স্বাধীনতার জন্য আজ আমি অনেক বেশী কাজ করছি যা আমি শ্রীমতী গান্ধীর বৃহত্তর কারাগারের অভ্যন্তরে থাকার সময় করতে পারি নি। কোন দিন এই সত্য আপনি জানতে পারবেন। এবিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, শ্রীমতী গান্ধীর চক্রান্ত বেশী দিন স্থায়ী হবে না। তখন কিন্তু আপনারা যারা চুপ করে থেকে এমারজেন্সীর প্রতি পরোক্ষ সমর্থন জুগিয়েছেন এবং যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে একে সমর্থন করেছেন তাদের সকলকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। সেই বিচারের দিন আসতে আর বেশী দেরী নেই।

রাজ্যসভার সদস্য জনসঙ্ঘের সুব্রহ্মনিয়াম স্বামীও এদেশ থেকে চলে যান এবং বিদেশে গিয়ে সরকার বিরোধী কাজ করেন। ওদিকে দেশে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়। তাঁর পাসপোর্ট বাতিল করে দেওয়া হয়। দিল্লিতে তাঁর পরিবারবর্গকে উত্যক্ত করা হয়। পরে ২ সেপ্টেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করবার জন্য রাজ্যসভা একটি কমিটি গঠন করে। বলা হয় যে, তিনি যদি ছয় মাসের মধ্যে একবারও সংসদে উপস্থিত না হন তাহলে তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবে। সদস্যপদ বজায় রাখার জন্য আগস্টে তিনি পুলিশের সঙ্গে বোঝাপড়া করে রহস্যজনকভাবে সভার অধিবেশনে হাজির হন এবং সেই রকম রহস্যজনকভাবে মধ্যেই তিনি অন্তর্ধান করেন। পরে রাজ্যসভা থেকে তাঁর সদস্য পদও বাতিল করে দেওয়া হয়।

রাজ্যসভায় সুব্রহ্মনিয়াম স্বামীর প্রবেশ ও প্রস্থানের ফলে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের সত্যিই বদনাম হল। তাদের অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল। এই বদনাম থেকে খানিকটা নিষ্কৃতি পাওয়া গেল ২৮ সেপ্টেম্বর জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ও

অপর ২৪ জনকে নয়াদিল্লি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করতে পারায়। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল যে, এরা সকলে বরোদা থেকে টনের হিসাবে ডিনামাইট সারা দেশে পাঠাচ্ছিল যাতে 'সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায় এবং রেলওয়ে ব্যবস্থা বানচাল করার জন্য অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করা যায়।'

আসলে 'বরোদা ডিনামাইট মামলার' বিষয়টি গুজরাটের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী চিমন ভাই সবপ্রথম শ্রীমতী গান্ধীর চোখের সামনে তুলে ধরেন। এই ভাবে চিমন ভাই শ্রীমতী গান্ধীকে খুশী করে আবার রাজনৈতিক মঞ্চে হাজির হতে চাইছিলেন। কেন না ১৯৭৪ সালে শ্রীমতী গান্ধীই তাঁকে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

এদিকে শ্রীমতী গান্ধী রিপোর্ট পান যে গুজরাটের প্রশাসন ব্যবস্থা খুব ঢিলে হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী জনতাফ্রন্ট সরকার এমার্জেন্সীর কোন তোয়াক্কা না করে প্রশাসন ব্যবস্থার এই দুরবস্থা করেছে। অতএব শ্রীমতী গান্ধী তেল ও রসায়ন মন্ত্রী পি সি শেঠিকে গুজরাটে পাঠান অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য।

শেঠি আমেদাবাদ বিমান ঘাঁটিতে নেমেই পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ করেন যে তাঁকে কেন গার্ড অব অনর দেওয়া হল না। তিনি তখন তাড়াহুড়ো কিছু পুলিশকে জড়ো করে একটা গার্ড অব অনারের ব্যবস্থা করেন। শেঠির সেটা পছন্দ না হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কমিশনারের চাকরি খতম করার অর্ডার দেন। শেঠি বরখাস্ত করার আদেশ দিলেও পুলিশ-কমিশনারের উৎকৃষ্ট সার্ভিস রেকর্ড থাকায় তাঁকে চাকরি থেকে হটানো হয় না। কিন্তু মজার কথা হল শেঠী দিল্লি ফিরে যাবার পর দেখা গেল যে তিনি আরও বহু পুলিশকে 'ডিসমিস' করে গেছেন।

আমেদাবাদের শ্রমিক এলাকায় স্থানীয় পৌরসভা একটি সভার আয়োজন করেন। শেঠী সেখানে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন তাঁকে হিন্দীতে বলার জন্য অনুরোধ জানান। শেঠী এতে দারুন রেগে যান। বলেন, 'ঐ লোকটাকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না? আপনারা কি আমাকে এখানে অপমান করার জন্য ডেকেছেন?' বলেই শেঠী তরতর করে মঞ্চ থেকে নেমে যান। হিতেন্দ্র দেশাই এবং মেয়র ভাদিলাল কামদার হতচকিত হয়ে যান। মেয়র শেঠীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে এটা কোন অপমান নয়। এতে রাস্তার গুণ্ডার মত শেঠী আমেদাবাদের প্রথম নাগরিককে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেন। হিতেন্দ্র দেশাই শেঠীর সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। শেঠীর সঙ্গে

তিনিও গাড়ীতে উঠতে যান। সঙ্গে সঙ্গে শেঠীর চিৎকার: 'কে আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে বলেছে? বেরিয়ে যান।'

দিল্লি ফিরে শেঠী রিপোর্ট দেন যে, গুজরাটে নৈরাজ্য চলেছে। শ্রীমতী গান্ধী এর পর ওম মেহতাকে গুজরাটে পাঠান। তিনি সেখানে গিয়েই নতুন করে অনেককে গ্রেপ্তার করেন। অথচ রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টারা পর্যন্ত ঐ গ্রেপ্তারের কোন প্রয়োজন দেখেন নি।

গুজরাটে আবার নতুন করে গ্রেপ্তারের মহড়া দেখে অনেকেই মনে করতে শুরু করেছিলেন যে এ সুড়ঙ্গ পথের বুঝি আর শেষ নেই। বহুজন নিজেদের অসহায় মনে করলো, আবার বহুজন নীরবে সবকিছু সয়ে যেতে লাগলো, কিন্তু সবাইতো আর একরকম নয়। ওয়ার্ধার (মহারাষ্ট্র) কাছে সুরগাঁও নামক স্থানের পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক সর্বোদয় কর্মী এবং বিনোবার সহকর্মী প্রভাকর শর্মা ১১ অক্টোবর শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের স্বৈরাচারী রীতি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মাহুতি দেন।

প্রভাকরশর্মা আত্মাহুতি দেবার পূর্বে শ্রীমতী গান্ধীর নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে যান। তাতে তিনি বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ এনে ভারতের যা কিছু সুন্দর, মহান ও পবিত্র—এমারজেন্সীর নামে সে সকল ধ্বংস করার জন্য তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে দায়ী করেন। তিনি লেখেন, 'আপনার মিসা-শাসনে আমলারা দস্যুতে পরিণত হয়েছে এবং জনসাধারণকে কাপুরুষ করে দিয়েছে। নিষ্ঠা সহকারে ও নির্ভয়ে যে দায়িত্ব পালন করে তার ভাগ্যে জোটে কারাগারের অভিশাপ। এখানে ন্যায় বিচার নেই। বিচারপতিরা সব আপনার কেনা গোলাম। এই অবস্থায় জেলে যাওয়া মানে আপনার দমন-নীতিকে মেনে নেওয়া। আপনি আমার সঙ্গে শূয়ারের মত আচরণ করবেন এটা আমি কিছুতেই হতে দেব না। ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় গান্ধীজীর লেখা একটি বাণী তিনি উদ্ধৃত করেন, 'আমরা যদি স্বাধীন নারীপুরুষ হিসাবে বাঁচতে না পারি তাহলে মৃত্যুর মধ্যেই আমাদের শান্তি খুঁজে পাওয়া উচিত।' শেষে তিনি লেখেন, 'আমি জানি আপনার রাজত্বে বসে এই ধরণের চিঠি লেখাও অপরাধ। তাই এই পাপ রাজ্যে আমি আর জীবিত থাকতে চাই না।'

প্রভাকর শর্মার সঙ্গে বিনোবা দেখা করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু কোন ফল হয় নি। ৯ জুন তারিখে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের লোক বিনোবার আশ্রমে হানা দেয় এবং আশ্রম পত্রিকা 'মৈত্রী'র ৪২০০ কপি তারা বাজেয়াপ্ত করে। ঐ পত্রিকায় গোহত্যা নিরোধের জন্য বিনোবা ১১ সেপ্টেম্বর

থেকে অনির্দিষ্টকাল অনশনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এর পরেই অবশ্য সরকার গো হত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার পর প্রথম প্রথম যাঁরা এর সুফলের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন ক্রমে তাঁরাও এমার্জেন্সীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে লাগলেন। দুটি বিষয় এদের ক্রোধের বিশেষ কারণ ঘটিয়েছিল। প্রথম সংবিধান সংশোধন এবং দ্বিতীয়, নির্বাচন স্থগিত করা। ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ কংগ্রেস দল একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি নিয়োগ করে যার চেয়ারম্যান হন স্বরণ সিং। স্বরণ সিং পরে আমাকে বলেছেন, 'ঐ কমিটিতে আমি না থাকলে অবস্থা আরও শোচনীয় হত।' 'তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্ভর শাসনব্যবস্থা এদেশে যাতে আর কোনদিন মাথা চাড়া দিতে না পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'

এই কমিটি সংবিধান সংশোধনের যেসব প্রস্তাব করে তাতে জনসাধারণের মধ্যে বিরাট ক্ষোভের সঞ্চার হয়। শ্রীমতী গান্ধী প্রতিশ্রুতি দেন যে, সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে কোনদিনই ধ্বংস হতে দেওয়া হবে না। সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে 'সামান্য কিছু পরিবর্তন' করা হবে মাত্র। কিন্তু প্রধান-মন্ত্রীর কথায় লোকের মনের আশঙ্কা দূরীভূত হল না। 'বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা বেশী শঙ্কিত ছিলেন। তাই তাঁরা বললেন, নতুন লোকসভা আসার আগে আর কোন সংশোধন নয়। সুপ্রীমকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনও ঐ একই কথা বললেন। ৩০০ শিল্পী ও সাহিত্যিক স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হল যে, সংবিধানের মৌলিক বিষয়ে পরিবর্তন করার রাজনৈতিক বা নৈতিক কোন অধিকারই বর্তমান সংসদের নেই। অকম্যুনিস্ট বিরোধী দলগুলি এবং সিপিআই (এম) সংবিধান সংশোধন বিষয়ে আলোচনার জন্য শাসকদলের সঙ্গে বসতে অস্বীকার করলেন। ২৫ অক্টোবর এই বিল পাশের জন্য সংসদের যে অধিবেশন ডাকা হল তাঁরা সেটাও বয়কট করলেন। ফলে ৩৬৬-৪ ভোটে উনষাটটি ধারাযুক্ত সংবিধান (৪২ তম সংশোধন) বিলটি ২ নভেম্বর পাশ হয়ে গেল। দেশের অধিক সংখ্যক রাজ্য বিধানসভায় বিলটি অনুমোদিত হবার পর ১৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এই বিলে স্বাক্ষর করলেন এবং এটি আইনে পরিণত হল।

এই সংশোধন অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের পূর্বে নির্দেশক নীতির স্থান দেওয়া হল, বাধ্যতামূলক জাতীয় সেবা সমেত নাগরিকদের জন্য দশটি কর্তব্যের কথা বলা হল, লোকসভা এবং বিধানসভাগুলির আয়ু পাঁচ থেকে বাড়িয়ে ছয়

বছর করা হল, রাজ্যগুলিতে গুরুতর আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিলে কেন্দ্র যাতে নিজের থেকে সি আর পি বসাতে পারেন তার অধিকার দেওয়া হল, মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করতে রাষ্ট্রপতিকে বাধ্য থাকার কথা বলা হল, এবং দুবছর পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিকে এই অধিকার দেওয়া হল যে, সংশোধন করার পথে কোন অসুবিধা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতির আদেশেই তা খারিজ করে দেওয়া যাবে। আরও বলা হল যে কোন কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা যাবে না যতক্ষণ না অন্ততঃ সাতজন বিচারপতি নিয়ে গঠিত বেঞ্চের দুই তৃতীয়াংশ ঐ মর্মে রায় দেন। সংবিধানের ভূমিকাও বদলে দেওয়া হল। 'সভ্রেন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক্' স্থলে বসানো হল 'সভ্রেন সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক।' অর্থাৎ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বদলে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এবং 'দেশের ঐক্য' স্থলে করা হল 'দেশের ঐক্য ও সংহতি।'

অনেকে অনেক কথাই বললেন। তার মধ্যে সিদ্ধার্থ বললেন, প্রধান মন্ত্রী যখন কোন পরামর্শ রাষ্ট্রপতির কাছে দেবেন তখন সে নিয়ে মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি ও বর্তমান আইন কমিশনের চেয়ারম্যান পি বি গজেন্দ্রগদ্‌কর এইভাবেই এগিয়ে এলেন শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থনে। তিনি বললেন, 'অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও সমানতার ভিত্তিতে নবরূপায়ণ করতে যাঁরা কৃতসঙ্কল্প তাঁরা যদি ঐ উদ্দেশ্য ও আদর্শে পৌছবার সুবিধার জন্য উপযুক্ত আইন করতে চান, তাহলে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাঁরা সেটা করতে পারেন।

বিরোধীরা অনেকেই তীব্র ভাষায় এর সমালোচনা করলেন। অশোক মেহতা এমারজেন্সীর নামে প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং এখন তার উপর আইনের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টাকে তীব্র নিন্দা করলেন। চারটি অকম্যুনিস্ট দল এক যৌথ বিবৃতিতে 'সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ ও তুল্যমূল্যের ব্যবস্থাকে গুঁড়িয়ে ফেলার' প্রস্তাবে ভবিষ্যতে যে ভীষণ ক্ষতি হতে পারে ক্ষোভের সঙ্গে সেকথার উল্লেখ করলেন। শ্রীমতী গান্ধীও যুক্তি দেখালেন, 'যাঁরা সংবিধানকে অপরিবর্তনীয় রূপ রেখে দিতে চান তাঁদের সঙ্গে নতুন ভারতের মানসিকতার কোন সংযোগ নেই।'

সুপ্রীমকোর্টের রায়ের প্রসঙ্গ তুলে আবার সমালোচনা করা হল। বলা হল, সংবিধানের মৌল কাঠামো পরিবর্তনের কোন অধিকার সংবিধানের নেই। সুপ্রীমকোর্টের বেশীর ভাগ বিচারপতি তাঁদের রায়ে একথা বলেছিলেন।

শ্রীমতী গান্ধী বললেন, 'মৌল কাঠামো নামক গোঁড়ামিকে আমরা স্বীকার করি না।'

সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে একটি তালিকায় লিপিবদ্ধ করা খুব কঠিন নয়। যেমন, অবাধ ও ন্যায়সঙ্গত নির্বাচন, জনসাধারণের কাছে সরকারের জবাবদিহি, স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ দ্বারা জুডিসিয়াল রিভিউ, আইনের শাসন যার অর্থ হল একমাত্র আইনের নির্দেশ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না, আইনের দরবারে সমান বিচার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্ম-নিরপেক্ষতা যার অর্থ হল ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, ধর্মের—ভিত্তিকে কোনরূপ ভেদাভেদ না করা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার।

আসলে সংবিধানের মৌল কাঠামো নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। তাঁর বক্তব্য হল মোটামুটি সবাই যখন তাঁরই সুরে সুর তুলেছে তখন শুধুমাত্র বিচারবিভাগ তা থেকে বাদ যায় কেন? এখনও তারা কেন স্বতন্ত্রভাবে মামলার রায় দেয়—যাতে মাঝে মাঝেই সরকারকে 'সমস্যার' মধ্যে পড়তে হয়। কাজের সময় এই সব ঝুটঝামেলা পোষায় কি? সম্ভবতঃ এই জন্যই বিচারপতিদের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ ষোলোজন বিচারপতিকে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়। যেমন এস ওবাল রেড্ডীকে অন্ধ্র থেকে ট্রান্সফার করা হল গুজরাটে, সি কোণ্ডিয়া অন্ধ্র থেকে মধ্যপ্রদেশে, ও চিন্নাপ্পা রেড্ডী অন্ধ্র থেকে পাঞ্জাবে; এ পি সেন মধ্যপ্রদেশ থেকে রাজস্থানে, সি এম লোধা রাজস্থান থেকে মধ্যপ্রদেশে, এ ডি কোশল পাঞ্জাব থেকে মাদ্রাজে, ডি এস তেবতিয়া পাঞ্জাব থেকে কর্ণাটকে, ডি, বি, লাল হিমাচল প্রদেশ থেকে কর্ণাটকে, বি, জে, দিওয়ান গুজরাট থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে, জে, এম, শেঠ গুজরাট থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে, টি, ইউ, মেহতা গুজরাট থেকে হিমাচলপ্রদেশে, ডি, এম, চন্দ্রশেখর কর্ণাটক থেকে এলাহাবাদে, এম, সদানন্দ স্বামী কর্ণাটক থেকে গৌহাটীতে, জে, এল, ভিমদলাল মহারাষ্ট্র থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে, জি, আই, রঙ্গরাজন দিল্লি থেকে গৌহাটীতে এবং আর সাচারকে দিল্লি থেকে রাজস্থানে ট্রান্সফার করা হয়। শ্রীমতী গান্ধী নিজে এই ট্রান্সফারের ফাইলগুলি দেখেন।

আইনতঃ বিচারপতিদের ট্রান্সফার করা হয় তাদের বার্ষিক সম্মেলনে। প্রধান বিচারপতি এই স্থানান্তর নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা করে সম্মতি পেলে তবেই তাঁকে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু শাস্তিমূলক

ব্যবস্থানুসারে এই ট্রান্সফারগুলি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট বিচারপতির সঙ্গে এ নিয়ে কোন আলোচনাই হয় নি।

দিল্লি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি জে এল আগরওয়াল আমাকে আটক রাখার মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন বলে তাঁর পদাবনতি ঘটিয়ে তাঁকে সেসনস্ জজ করে দেওয়া হয়। আইনমন্ত্রী গোখ্‌লে ও প্রধান বিচারপতি রায় আগরওয়ালাকে স্থায়ী করতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আপত্তি করেন। কেননা ওম মেহ্‌তা শ্রীমতী গান্ধীকে বলেছিলেন, অন্যান্য স্থানান্তরিত বিচারপতিদের মত আগরওয়ালাকেও শাস্তি দিতে হবে।

গোখলে আমাকে বলেন, ওম মেহতা স্বরাষ্ট্র দপ্তরে আসার পর থেকে বিচারপতিদের ব্যাপারে বড্ড বেশী নাক গলাতে থাকেন। কারণ স্বরাষ্ট্রসচিব আইনসচিব হিসাবেও কাজ করতেন। ফলে ওম মেহ্‌তার একটু সুযোগ বেড়ে ছিল। এই ট্রান্সফারজনিত 'শাস্তি'র ফলে দেখা গেল বহু বিচারকের রায়ই সরকারের মন রাখার মত করে ছাঁটকাট হতে থাকলো। গুজরাট হাইকোর্টের একজন বিচারপতি তাঁর ট্রান্সফার আদেশ চ্যালেঞ্জ করেন এবং শুধু নিজের নয় আরও ৪০ জন জজের ট্রান্সফার বন্ধ করে দেন।

সংবাদপত্র এবং বিচার বিভাগের 'মুখে লাগাম পরানোর কাজ যখন সম্পন্ন হল তখন সঞ্জয়ের চোখ পড়লো নির্বাচন কী করে বাতিল করা যায় তার দিকে। সেজন্য নতুন করে সে সংবিধান গঠনকারী পরিষদ তৈরী করার প্রস্তাব দিল যার কাজ সম্পন্ন হতে এমনিতেই দুই তিন বছর সময় লেগে যাবে। শ্রীমতী গান্ধী এই বিষয়ে সঞ্জয়কে মৌখিক সমর্থন জানিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসে কমিটিগুলি উক্ত পরিষদ গঠনে সম্মতি জানায়। প্রতিটি ধারা নিয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার জন্য এও পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন বলে তারা অভিমত প্রকাশ করা হয়।

শ্রীমতী গান্ধী যখন গোখলেকে এ বিষয়ে কিছু করার কথা বলেন, গোখলে আপত্তি জানান। তিনি বলেন এই ব্যবস্থা করতে গেলে অনেক রকম জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। নতুন করে ভাষা সমস্যা, রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের সমস্যা প্রভৃতি অনেক কিছু আবার মাথাঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে। নতুন করে আবার সারা দেশে বিরোধ সংগঠিত হবে এবং এ ব্যাপারে সি পি আইও থাকবে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে। তার উপর বিরোধীরা ঐ পরিষদ গঠনের জন্য ইতিমধ্যেই সরাসরি নির্বাচনের প্রস্তাব করেছে। কেননা তাদের মতে বিধানসভাগুলির ও লোকসভার আয়ু শেষ হয়ে গেছে। অতএব

কনসটিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর জন্ম সদস্য নির্বাচনের কোন অধিকার এদের নেই।
এত কথা শোনার পর শ্রীমতী ইন্দিরা এই চিন্তা পরিত্যাগ করেন।

৫ নভেম্বর লোকসভার আয়ু আরও এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে সাধারণ নির্বাচন যা মার্চ ১৯৭৬-য়ে হবার কথা তা ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে যায়।

এবারকার লোকসভায় কোন মধু লিমায়ে বা শারদ যাদব ছিলেন না যাঁরা পদত্যাগ করতেন। এরা দু'জন লোক সভার আয়ু প্রথমবার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত যখন নেওয়া হয় তখনই পদত্যাগ করেন। মধু লিমায়ে প্রধানমন্ত্রীকে কঠোর ভাষায় লিখিত এক চিঠিতে বলেন, '১৮ মার্চ, ১৯৭৬-য়ের পর ক্ষমতার গদীতে আসীন থাকার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার আপনাদের নেই। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে একমাত্র সংখ্যাধিক্যের জোরেই আপনারা ওখানে আবার আসতে পারেন—তার আগে নয়।'

সরকারের যুক্তি ছিল বড় বিচিত্র। প্রথমবার তাঁরা বললেন, জরুরী অবস্থার সুফলগুলিকে এখনও স্থায়ী করা যায় নি তাই লোকসভার আয়ু বাড়ানো দরকার। দ্বিতীয়বার বিরোধী দলগুলি প্রায় সকলেই আপত্তি জানিয়েছিল। তবু ঐ সংক্রান্ত বিল পাশ হয় ১৮০-৩৪ ভোটে। শ্রীমতী গান্ধী দেশকে এই পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করার দাবিতে সকলের কাছে সরকারী প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন আশা করেন।

নির্বাচনকে কিছুদিনের জন্ম অন্ততঃ ঠেকিয়ে দেবার পর শ্রীমতী গান্ধীর চিন্তা হল সঞ্জয়কে কী করে ঐ পোস্টের উপযুক্ত করে তোলা যায়। এ কথা ঠিক যে সঞ্জয় তখনই রীতিমত গুরুতর কাজের দায়িত্ব পালন করছিল। সঞ্জয় কেবিনেটের সব নথিপত্র দেখছিল, অফিসাররা তার কাছেই আসছিলেন আলোচনার জন্য। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টও তার মাধ্যমেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাচ্ছিল (শুক্লার গতিবিধি সম্পর্কে সে বিশেষ নজর রাখছিল। কেননা শুক্লাকে তার মা একবার বকেছিলেন)। বেশীর ভাগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই সঞ্জয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করছিলেন। নিজেরা না যেতে পারলে তাঁরা আলোচনার জন্ম সচিবদের সঞ্জয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল হাসান একবার তাঁর সচিবকে সঞ্জয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন একটা বিশিষ্ট বিষয়ে সঞ্জয়ের মনোভাব কী জানবার জন্ম। রাজ্যগুলি থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিবরা পর্যন্ত সঞ্জয়ের মন জানার জন্ম ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন।

কিন্তু এ সবই হল সাময়িক। এই আছে এই নেই। তিনি এই সব

কিছুর ওপর একটা আইনের টুপী পরাতে চাইছিলেন। বলা হয়েছিল যে সঞ্জয়কে সংসদে নিয়ে আসুন এবং রাজ্যসভার মাধ্যমে আনা খুবই সোজা। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর কাছে ঐ পদ্ধতিটি মোটেই ভালো মনে হয় নি। কেননা ব্যাপারটা শুধু যে খুব স্থূল হবে তাই নয় লোকেও বুঝে ফেলবে।

তখন ভেবে-চিন্তে স্থির করা হল যুব কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে তার মাধ্যমেই সঞ্জয়ের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হবে বেশী। কেননা বাইরের তো বটেই কংগ্রেসের ভেতরেও তখন সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে একটা গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠছিল। সি পি আই সঞ্জয়ের সমালোচনা করেছিল বলে শ্রীমতী গান্ধীর প্রথম আক্রমণ সি পি আইয়ের দিকেই কেন্দ্রীভূত হয়। কম্যুনিষ্ট এবং তাদের নীতিকে যে সঞ্জয় মোটেই পছন্দ করে না এ কথা সে কখনই গোপন করে নি। সে একাধিকবার এ কথা বলেছে যে ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তারা সোভিয়েট ইউনিয়ন, বৃটিশ ও মিত্র শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কম্যুনিস্টরাই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সঞ্জয়ের এই সমালোচনায় রেগে গিয়ে সি রাজেশ্বর রাও বলেছিলেন, দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের মধ্যে একটা 'দক্ষিণপন্থী কুচক্র' রয়েছে।

রাজেশ্বর রাও-য়ের সমালোচনার উত্তরে কংগ্রেসও সোচ্চার হয়ে উঠলো। সবাই বললো, রাও কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলার কে? শ্রীমতী গান্ধীও ঐ লাইন নিলেন। বহু বছর পর তিনি ২৩ ডিসেম্বর, সি পি আইয়ের নাম ধরে তার সমালোচনা করলেন। তিনি বলেন, কম্যুনিস্টরা বলে থাকে যে তারা নাকি আমাকে সমর্থন করে। কিন্তু আমি প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা বা অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি একথা বলে তারা যে আমার অপমান করেছেন তার চেয়ে বেশী আর কী হতে পারে। নিজের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, 'এ সব ব্যাপারে সে এখনও খুব ছোট। সে প্রধান-মন্ত্রী হতে যাচ্ছে না। কিম্বা প্রেসিডেন্টও হচ্ছে না অথবা ঐ ধরনের কোন কিছু একটা হচ্ছে না। তাহলে আমার মনে হয় এই আক্রমণ আমারই বিরুদ্ধে করা হয়েছে।

শ্রীমতী গান্ধী ২০ নভেম্বর গৌহাটী অধিবেশনের সময়ও সঞ্জয় ও যুবকংগ্রেসের পক্ষ নিয়ে বলতে গিয়ে ঐ ভাবেই নিজের যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন সঞ্জয়ের যে পাঁচ দফা কর্মসূচী তা হল সরকারী বিশ দফা কর্মসূচীরই পরিপূরক। এই দুইয়ে মিলে দেশের অর্থনৈতিক চেহারার পরিবর্তন সাধন সম্ভব হবে। তিনি এই আস্থা প্রকাশ করেন যে, ভারতের ভবিষ্যত যুবকদের

হাতে সুরক্ষিত থাকবে কেননা তারা নিজেদের দায়িত্বপালনে এক নতুন সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে।

গৌহাটি অধিবেশন ছিল সঞ্জয়ের অধিবেশন, একের পর এক সকলে মঞ্চে উঠে কেবল সঞ্জয়েরই প্রশংসা করে গেলেন। মাঝে মাঝে তার মা'র নামও উঠলো। বড়ুয়া তো সঞ্জয়কে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনা করে বসলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন কেরলের কংগ্রেস প্রধান তরুণ এবং সৎ এ, কে, অ্যান্টনী। তিনি ঐ সব মোসায়েবীর কথা না বলে কংগ্রেসের ভুল শোধরাবার কথা বললেন।

গৌহাটি অধিবেশনে যদিও সঞ্জয় ও তাঁর নিজেরই জয়জয়কার হল তবু কোথায় যেন একটা খুঁত থেকে গিয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে যেন কংগ্রেসের ভেতরেই চলছিল এক 'নীরব অসহযোগ' (কংগ্রেস প্রতিনিধিদের মধ্যে এক নৈরাশ্যের ছায়া যেন বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল)। এক বছর আগে চণ্ডীগড় অধিবেশনের সময়ও কংগ্রেস প্রতিনিধিরা যেভাবে জরুরী অবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিল এখন আর তেমন অবস্থা নেই। শ্রীমতী গান্ধী আর যাই হোক অনিচ্ছুক সমর্থকদের উপরে কিছুতেই নির্ভর করতে চান নি। তার চেয়ে বরং তিনি নতুন সমর্থক দল গড়ে তুলবেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন দেশ এখনও তাঁর সঙ্গে আছে।

তিনি যে কেন নতুন সমর্থক দল গড়ে তুলতে চাইছিলেন তার আরও একটা কারণ আছে। তা হল সঞ্জয় নিজের ক্ষমতায় নেতা হোক এটাই ছিল তাঁর ইচ্ছা আর একমাত্র তরুণরাই সঞ্জয়ের প্রতি আনুগত্য সম্পন্ন হতে পারে।

তাছাড়া একদিন তিনি যখন প্রধানমন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়ে সম্ভবতঃ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করতে চলে যাবেন তখন তাঁর শূন্য আসনে বসবে সঞ্জয় এই ছিল তাঁর মনোগত ইচ্ছা। বেশীর ভাগ মুখ্যমন্ত্রীই সঞ্জয়কে সমর্থন করবেন। যেমন বিহারের মিশ্র, উত্তরপ্রদেশের তেওয়ারি, পাঞ্জাবে জইল সিং, হরিয়ানার বনারসী দাসগুপ্তা, রাজস্থানের যোশী, মধ্যপ্রদেশের শুক্লা, অন্ধ্রপ্রদেশের বেঙ্গল রাও, মহারাষ্ট্রের এস, বি, চবন এবং গুজরাটের মাধব সিং সোলাঙ্কি। মাত্র তিনজন মুখ্যমন্ত্রী সঞ্জয়ের প্রতি আনুগত্যসম্পন্ন ছিলেন না। এঁরা হলেন ওড়িশার নন্দিনী শতপথী, পশ্চিমবঙ্গের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং কর্ণাটকের দেবরাজ আর্স। এদের মধ্যে আবার প্রথম দুজন ছিলেন সঞ্জয়ের উগ্র বিরোধী। সঞ্জয়ও এদের পছন্দ করতো না, কেননা তার ধারণা ছিল এরা হল কম্যুনিস্ট।

হয়তো এদের কথা মনে রেখেই শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, 'যেমন প্রত্যেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিজস্ব সাম্রাজ্য আছে তেমনি আমরা দেখছি যে প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রীরও নিজস্ব সাম্রাজ্য আছে। কিন্তু তারা কখনই এটা ভেবে দেখেন না যে সাম্রাজ্যগুলি পরস্পর সংঘর্ষেও লিপ্ত হতে পারে।'

সুতরাং এই সব সাম্রাজ্য কেটেছেঁটে ছোট করার দরকার ছিল। তালিকায় প্রথম নাম ছিল নন্দিনীর। ওড়িশার রাজ্যপাল আকবর আলি যিনি জয়প্রকাশকে প্রশংসা করার দায়ে পদচ্যুত হয়েছিলেন তিনিও প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত বেশ কয়েকখানি চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনীর দুর্নীতি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। নন্দিনী ভুবনেশ্বরে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে বাড়িটি তৈরী করেছিলেন আকবর আলি সে সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। নন্দিনী যে পি ডব্লু ডি ইঞ্জিনিয়ার ও সরকারী মালমশলা এজন্য ব্যবহার করেন তার উল্লেখও ঐ চিঠিতে ছিল।

এদিকে নন্দিনীকে হটাবার জন্য সঞ্জয় তার গুটি সাজিয়ে ফেলেছিল। নন্দিনী মন্ত্রিসভার বিনায়ক আচার্য ছিলেন তার মাথায়। নন্দিনীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল। প্রশাসনিক কাজকর্ম তিনি নিজে দেখা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলেন; তাঁর ছেলেই যা খুশী তাই করতো। কেউ কিছু বলার ছিল না। সঞ্জয়ের এটা মোটেই ভালো লাগে নি। ওদিকে খরার উদয় হওয়ায় রাজ্য প্রশাসন ব্যবস্থা এক রকম ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়।

কিছু লোক নন্দিনীকে বললেন, যে ইন্দিরা তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেছেন। নন্দিনী তা বিশ্বাস করতেন না। কেননা তিনি তো মনে মনে জানতেন যে ইন্দিরার প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ আনুগত্য আছে।

এরপর এ-আই সি সির জেনারেল সেক্রেটারী এ আর অন্টুলে ওড়িশায় আসেন নন্দিনীকে পদত্যাগ করাবার জন্য। তিনি বলেন, 'শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি কার আনুগত্য আছে বা নেই একথা বিচার করার একমাত্র অধিকারী হলেন তিনি স্বয়ং। তাছাড়া আনুগত্যকে কখনও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা যায় না।

নন্দিনী দুদিন আগেও যখন দিল্লিতে গিয়েছিলেন রাজ্যের সমস্ত পরিস্থিতি শ্রীমতী গান্ধীকে জানাবার জন্য তখনও কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর এ সাহস হয় নি যে তিনি নন্দিনীর মুখের উপর পদত্যাগ করার কথা বলেন। দিল্লি থেকে ফিরে নন্দিনী দিনকয়েকের জন্য একটু ছুটি নিয়েছিলেন। সেই সময় দিল্লি থেকে টেলিগ্রাফ এল যে নন্দিনীকে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে হবে যদিও নন্দিনীর

পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিধানসভায় ছিল তবু তাকে ১৬ ডিসেম্বর পদত্যাগ করতে হয়।

সঞ্জয়ের প্রতি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আনুগত্য প্রথম থেকেই সন্দেহে ঘেরা ছিল। তবু সিদ্ধার্থ অনেক চেষ্টা করেছিলেন। বাণিজ্যিক সংস্থার অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি প্রকাশ্যে সঞ্জয়ের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেছিলেন। সঞ্জয়ের পরিবারের সঙ্গে সিদ্ধার্থ রায়ের পরিবারের পুরনো সম্বন্ধের কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি হয়তো পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে বাঁচিয়ে রেখে নিজের পিঠের চামড়া বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিলেন। এমনকি নয়াদিল্লিকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তিনি বাঙ্গালীদের প্রশংসাও হয়ত সাময়িকভাবে কুড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। শ্রীমতী গান্ধী ও সঞ্জয় মিলে যে সব মুখ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করবেন বলে স্থির করেছিলেন, সিদ্ধার্থর নামও তার মধ্যে ছিল।

রায়ের গোষ্ঠী বারবার একটা যুক্তিই দেখিয়েছেন যে নেহরু পরিবার কোন দিন কোন বাঙ্গালী নেতাকে উঠতে দিতে চায় নি। আর রায় বিরোধী গোষ্ঠী অভিযোগ করেছে যে রায় পশ্চিমবঙ্গে 'বাংলাদেশ' সৃষ্টি করতে চাইছে।

এদিকে রায় ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন, তাঁকে হটাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেবার চক্রান্ত হচ্ছে। ঐভাবে গণ্ডগোল পাকিয়ে রায় ব্যর্থ বলে প্রমাণ করে পদচ্যুত করাই হল তাদের লক্ষ্য। রায় বলেন ১৯৬৯ সালে আমেদাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল হিতেন্দ্র দেশাইকে সরাবার জন্য আবার উত্তরপ্রদেশের পুলিশবাহিনীতে 'বিদ্রোহ'ও একটি তৈরী ঘটনা। তার সাহায্যে হটানো হয়েছিল ত্রিপাঠীকে। এবার তাঁর নম্বর।

ইন্দিরা রায়কে হটালেন না—দেবরাজ আর্সকেও স্বপদে রেখে দিলেন। কেননা শ্রীমতী গান্ধীর মনে তখন আবার এক অন্য চিন্তা প্রবাহ ঢুকে পড়েছিল। কেননা একদিন যদি সঞ্জয়কে প্রধানমন্ত্রী করতেই হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীদের সমর্থনই যথেষ্ট নয় সংসদ সদস্যদের সমর্থন হল বড় কথা। তাঁদের দেখতে হবে যে কোন কোন এম-পি নীরবে এমারজেন্সী মেনে নিয়েছিলেন এবং কারা সঞ্জয় ও ইন্দিরার মধ্যে কোন তফাৎ করেন না।

গোয়েন্দা বিভাগ এবং 'র' হিসাব করে বলে দিয়েছিলেন যে এক্ষুণি যদি নির্বাচন হয় তাহলে কংগ্রেস লোকসভায় ৩৫০-য়েরও বেশী সীট পাবে। একমাত্র সি বি আইয়ের ডিরেক্টর ডি সেন অন্য কথা বলেছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে বিরোধী নেতাদের মুক্তিদানের অন্ততঃ ছয়মাস পরে

নির্বাচন হওয়া উচিত। কেননা ততদিনে বিরোধী নেতাদের জনপ্রিয়তা অনেকটা থিতিয়ে যাবে।

শ্রীমতী গান্ধীর সচিব দারও নির্বাচনের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। তাঁর অবশ্য অন্য যুক্তি ছিল। এমারজেন্সীর ফলে যে অসুবিধাগুলি সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার এটাই একমাত্র উপায়। বাঘের পিঠে চড়া হয়তো সোজা কিন্তু নামা খুব কঠিন। জরুরী অবস্থায় সুফল কিন্তু পাওয়া গেলেও আর্থিক সমস্যাগুলি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। বিশদফা কর্মসূচীর সুফলের মধ্যে কাজের দিন ক্ষতির সংখ্যা ১৯৭৪ সালের চারকোটি তিরিশ লক্ষ থেকে কমে ১৯৭৫ এর জুলাই ও ডিসেম্বরের মধ্যে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৪৫ লক্ষে। সরকারী কলকারখানাতে এই ক্ষতির সংখ্যা ছিল ১৬ লক্ষ হাজার সেটা কমে গিয়ে হয় ১ লক্ষ ২০ হাজার। মুদ্রাস্ফীতির হারও ১৯৭৩-৭৫ সালের ২৩'৪ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে ১৯৭৫-৭৬-য়ে ৩'৩ শতাংশে দাঁড়ায়।

ব্যর্থতার চিত্র আরও ভয়াবহ। শীতকালে অনাবৃষ্টির জন্য কৃষি উৎপাদন একেবারেই ভালো হয় না। ফলে এই বছর ইইসি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৪১ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করতে হয়। শ্রমিকরাও হাঁপিয়ে উঠেছিল, উৎপাদনের হার কমে যাচ্ছিল।

এমারজেন্সীর সুযোগে সঞ্জয় যে সংবিধানবহির্ভূত ক্ষমতা ভোগ করেছে সামরিক ব্যারাকের মেসে জুনিয়ার আফসাররা পর্যন্ত তা খোলাখুলি আলোচনা করতেন। পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচী নিয়ে যে বাড়াবাড়ি হয়েছিল জওয়ানরা সে বিষয়েও প্রকাশ্য আলোচনায় যোগ দিতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে এ রিপোর্ট ও এল যে ওদের আলোচনায় ভুট্টো নির্বাচন ঘোষণা করে খুব ভালো কাজ করেছেন বলে প্রশংসা পেতে লাগলো। তারা একথাও বলতে লাগলো যে শ্রীমতী গান্ধী যদি নির্বাচন ঘোষণা না করেন তাহলে লোকে তাঁকে গণতন্ত্র বিরোধী বলে আখ্যা দেবে।

আরও রিপোর্ট এল যে ভোটের ব্যাপারে লোকে খুব ভীত। তাদের ধারণা যে তারা নিজেদের ইচ্ছামত ভোট দিতে পারবে না। কেননা জরুরী অবস্থা এই সময় একটু শিথিল করা হবে মাত্র, একেবারে তুলে নেওয়া হবে না এবং শ্রীমতী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের হয়তো সবশেষে মুক্তি দেবেন।

আরেকটা সুবিধা ছিল যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি তখনও ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। যদিও এ কথা ঠিক যে ১৬-১৭ ডিসেম্বর বিরোধীদের বৈঠক ভারতীয় জনতা কংগ্রেস নামে একটি নতুন দল ও তার প্রতীক স্থির

হয়েছিল একটি চক্রের মধ্যে লাঙল ও চরকা। কিন্তু ঐ দলের নেতা কে হবেন? এ নিয়ে তখনও সমস্যা ছিল। শ্রীমতী গান্ধী ধরেই নিয়েছিলেন যে এ সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।

প্রকৃত পক্ষে বিরোধী দলগুলি সমস্ত বিষয়টা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইছিল। করুণানিধির প্রস্তাব অনুসারে ১৫ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধীদের আলোচনায় বসার কথা। জেপিও এই প্রস্তাবে খুশী হলেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করার এটাই সব চেয়ে ভালো পদ্ধতি। বিরোধীরা জানালো যে তাদের আস্থা আছে অহিংসা, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রে।

অপর দিকে বিদেশের সমালোচনা শ্রীমতী গান্ধীকে বেশ কিছুটা ক্ষুব্ধ করেছিল। পশ্চিমী দুনিয়া মনে করতো তিনি 'বেআইনী ভাবে' শাসন ক্ষমতা দখল করে বসে আছেন। তিনি এর জবাব দিতে চাইছিলেন এবং সেইজন্য মে মাসে ফ্রান্স সফরের একটা কর্মসূচী স্থির করলেন। কেননা তাঁর ধারণা ছিল ততদিনে তিনি এটা প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে দেশের জনগণ তাঁর পিছনেই আছে। তিনি শুধু জনগণের সমর্থন দিয়ে নয়—পৃথিবীর সামনে তিনি প্রমাণ করে দেখবেন যে, তাঁর প্রতি ভারতীয় জনগণের সমর্থন প্রশ্নাতীত।

সঞ্জয় এবং বংশীলালের মনে কিন্তু খটকা ছিল। তাত্ত্বিক আলোচনায় যা যুক্তিযুক্ত ও ভালো বলে মনে হয় বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে তা তত ফলপ্রসূ না-ও হতে পারে। সেইজন্য তারা নির্বাচনের খুব বিরুদ্ধে ছিল। সঞ্জয়ের মনে হয়েছিল যে নির্বাচনের এই 'ফালতু ধারণাটা' তার মায়ের মাথায় নিশ্চয়ই কম্যুনিস্টরা ঢুকিয়েছে। তার ধারণা খুব ভুল ছিল না। কেননা বড়ুয়াও নির্বাচনে সমর্থন করেছিলেন।

শ্রীমতী গান্ধীর মনে হয়েছিল যে সঞ্জয়, বংশীলাল ও অন্যান্যরা নির্বাচন নিয়ে বৃথাই দুশ্চিন্তা করছে। তাঁর মতে ব্যবস্থা যা করার তা তো আগেই করা হয়ে গেছে। মোটামুটি ভাবে এমারজেন্সী জনিত অবস্থায় যে সব আইনকানুন তৈরী হয়েছিল সেগুলি যাতে স্থায়ীভাবে থাকে তার ব্যবস্থা তো হয়েই গিয়েছিল। এখন যদি জরুরী অবস্থা উঠেও যায় তাহলেও প্রেস সেন্সরশিপ থেকেই যাবে, ট্রান্সফার ইত্যাদির ফলে বিচারপতিরাও ঠাণ্ডা 'আচরণ' করতে শুরু করেছেন এবং করবেন। তাছাড়া গোখলের উপর দায়িত্ব দেওয়াই আছে যে বিচারপতিদেরও আইন মন্ত্রক যাতে পদচ্যুত করতে পারে তার একটা সংস্থান করা।

নির্বাচনের ব্যাপারে সঞ্জয় আপত্তি করায় শ্রীমতী গান্ধী দ্বিতীয় দফায় এ

নিয়ে আরেকটু খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করলেন। দিল্লিতে যে সব মুখ্যমন্ত্রী আসতেন তাঁদের কাছেই তিনি নির্বাচন হলে তার ফলাফল কী হতে পারে সে বিষয়ে মতামত জানতে চাইতেন। কিন্তু কোন্ মুখ্যমন্ত্রীর ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে, তারা মুখের উপর উল্টো কথা বলবে। প্রত্যেকেই বলতে লাগলেন, নির্বাচন হলে তাঁর রাজ্যে কংগ্রেস অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করবে। নির্বাচন এখন হলে ভালো, না এক বছর পরে হলে ভালো? তাতেও সবাই বললেন, নির্বাচন এখনই হোক।

শ্রীমতী গান্ধী এ খবরও পাচ্ছিলেন যে গোপন কাজকর্মও থামে নি। বরং তারা এখন একটি সংগঠিত শক্তিতে পরিণত হয়েছে। টেলিফোনে নিয়মিত তাদের যোগাযোগও আছে। সাংকেতিক ভাষা ও গুপ্ত নাম ব্যবহার করে তারা আবার কোন কোন সময় আন্তর্জাতিক টেলিফোন লাইনেও কথা বলে থাকে।

যাই হোক তিনি তাঁর গোয়েন্দা দপ্তরকে বললেন, তারা যেন আবার খুব ভালোভাবে এবং নির্ভুলভাবে জনসাধারণ কী চায় তার সমীক্ষা করে রিপোর্ট দেন। এবারও গোয়েন্দা দপ্তর যে রিপোর্ট দিলেন তাতে বলা হল যে কংগ্রেস অনায়াসেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দখল করবে এবং তাদের আসন সংখ্যা দাঁড়াবে ৩২০ অর্থাৎ পুরনো হিসাব থেকে ৩০টি আসন কম। সঞ্জয় কিন্তু তখনও নির্বাচনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল এবং শ্রীমতী গান্ধী ঠিক এর বিপরীত, নির্বাচন অনুষ্ঠানের পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন।

শ্রীমতী গান্ধী বহু এম, পির সঙ্গেও আলোচনা করেন। তাদের কেউ-ই কিন্তু পুরনো নির্বাচনী এলাকায় ফিরে যেতে চায় না। জরুরী অবস্থা ভোটদাতাদের কাছে তাদের আর মুখ রাখে নি। কিন্তু তাঁর কাছে সেটা হচ্ছে ইন্সটিটুট অব পলিসি রিসার্চ, নয়াদিল্লির সমীক্ষা রিপোর্ট যা শ্রীমতী গান্ধীর সচিব দার তার নজরে এনেছিলেন। সেই রিপোর্টেও বলা হয়েছিল শ্রীমতী গান্ধীর জনপ্রিয়তা এখন শীর্ষে পৌঁছেছে। নির্বাচনের জন্য এটাই তাঁর পক্ষে সব চেয়ে ভালো সময়।

কী ভুলই না প্রমাণিত হল। অতীতে সময় নির্ধারণে শ্রীমতী গান্ধী ভুল কখনও করেন নি। প্রতিটি কাজ তিনি সঠিক ভাবে করেছেন। কিন্তু এবার তিনি নিজে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় আসল নাড়ীটা তিনি ধরতেই পারেন নি। গোয়েন্দা রিপোর্ট তাঁর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী হওয়ায় আসল সত্য চাপা পড়ে গেছে। তাঁকে ঘিরে রেখেছিল যে সব তাঁবেদার

তারা বলতো, জরুরী অবস্থা বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। দেশের মানুষ এত সুখী এর আগে কখনও হয়নি।

গোয়েন্দা বিভাগের লোকদেরই তিনি সব চেয়ে আগে জানিয়ে দিলেন যে আগামী মার্চে কিম্বা এপ্রিলের প্রথম দিকে তিনি নির্বাচন চান। সুতরাং তারা যেন 'প্রস্তুত' থাকে। এতে কোন ঝুঁকি আছে একথা তিনি ভাবলেনই না। কারণ তিনি তো জেনে বসে আছেন যে তিনি জিতবেনই।

নির্বাচনের কথা তিনি যে জন্যই ঘোষণা করে থাকুন না কেন, তাঁর একটা বিশ্বাস ছিল যে জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কোন কাজই চলতে পারে না। এক দিক থেকে দেখতে গেলে তিনি জনসাধারণের ধৈর্য ও দুঃখের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। কেননা চূড়ান্ত পর্যায়ে জয় তো হল তাদেরই—সেই অশিক্ষিত, গরীব এবং পিছিয়ে পড়া মানুষগুলিই তো শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলো।

## ৪। বিচার

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
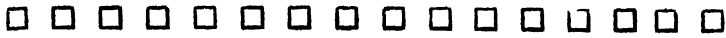
১৮ জানুয়ারী, ১৯৭৭। অন্যান্য দিনের মত সেদিনও মোরারজী খুব ভোরে উঠেছেন। তারপরই তিনি পায়চারী করতে বেরিয়েছেন গত বেশ কয়েক মাসের অভ্যাস মত। এদিনটাও ছিল আর দশটা দিনের মতই।

রোজকার এই একঘেয়ে রুটিন। তবে সোনাতে প্রথম যখন তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল সে অবস্থার চেয়ে এটা তবু অনেক ভালো। তাঁকে প্রথমে রাখা হয়েছিল এক ছোট, অন্ধকার ও জানালাহীন ঘরে। অনেক প্রতিবাদ করার পর রাতে তাঁকে উঠোনে পায়চারী করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে উঠোনও সাপখোপ এবং বিছায় ভর্তি। অতএব উনি খাটের চারিদিকে পায়চারী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এতেই তাঁর একটু ব্যায়াম হত। বাইরে যে কী ঘটছে সে সম্পর্কে তাঁর কোন ধারনা ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলেন। এমন কি তাঁকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়তে দেওয়া হত না।

সোনার অদূরে ক্যানাল গেস্ট হাউসে যখন তাঁকে স্থানান্তর করা হয় তখন তাঁকে খবরের কাগজ দেওয়া হত এবং পরে পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হয়। সেদিন ১৮ জানুয়ারি, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে তিনি একটি খবর দেখলেন যে, মার্চের শেষে লোকসভার নির্বাচন হতে পারে। এ খবর তিনি বিশ্বাস করেন নি। এজন্য তার কিছু নিজস্ব কারণও ছিল।

ইতিমধ্যে তিনি দেখেন কয়েকজন প্রবীণ পুলিশ আফসার তার ঘরে এসে হাজির হয়েছেন। মোরারজী নিরাসক্ত ভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁরা বললেন, আপনাকে বিনা সর্তে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। আমরা সঙ্গে গাড়ি এনেছি, আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসবো।

বিরোধী নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্যদেরও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। একটা সময়ে আটক বন্দীদের সংখ্যা এক লক্ষ পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। এখন ঐ সংখ্যা নেমে এসেছিল দশ হাজারে।

বাড়িতে পৌছনোর পর মোরারজী শুনলেন যে শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা ভেঙ্গে দিতে এবং নতুনভাবে নির্বাচন করতে চেয়েছেন। তিনি এতে বিস্মিত হন নি। তিনি পরে আমাকে বলেছিলেন, 'আমি ভালো করেই জানতাম যে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিলেই তিনি আমাকে ছেড়ে দেবেন।'

কিন্তু আরও অনেকে ছিলেন যাঁরা এই সিদ্ধান্তে হতচকিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেক কেবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীও ছিলেন। সেদিন বিকালেই তারা এ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নিজেই তাদের বৈঠক ডেকে এই খবর দিয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী বল্লেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারকে মাঝে-মাঝেই নির্বাচক মণ্ডলীর সম্মুখীন হতে হয়। তিনি স্বীকার করেন যে তিনি একটি বড় রকমের ঝুঁকি নিয়েছেন।

কোন মন্ত্রীই কিছু বললেন না। বংশীলাল আগে থেকেই ব্যাপারটা জানতেন, তাই তাঁর মুখে চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ। জগজীবন রাম এবং চ্যবন নীরব ছিলেন। জরুরী অবস্থা জারির আগে যেমন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নি ; এবার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেবার আগে তেমনি তাঁদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করা হয় নি। তবে অন্য কয়েকজন মন্ত্রীর মত তাঁরাও ব্যাপারটা আঁচ করেছিলেন কেননা সঞ্জয় মাত্র দুদিন আগে বোম্বাইয়ের এক জনসভায় বলেছিল, খুব শীঘ্র নির্বাচন হতে পারে। এসব খবর যে সঞ্জয়ের ভালোমত জানা থাকে সে তো তারা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বুঝতে শুরু করেছিলেন।

তাঁরা যা জানতেন না তাহল বর্তমান মন্ত্রিসভার বেশীর ভাগই লোকসভা নির্বাচন থেকে বাদ পড়ছেন। শ্রীমতী গান্ধী বাস ভবনের সকলেই জানতেন যে, নির্বাচনের পর জগজীবন রামকে আর মন্ত্রী করা হচ্ছে না। লোকসভায় কারা যাবে এবং কারা যাবে না সে বিষয়ে সঞ্জয়ের নিজস্ব মতামত আছে। সে একটি তালিকাও তৈরী করে ফেলেছিল যে নির্বাচনে কাদের কংগ্রেসী টিকিট দেওয়া হবে। সেই তালিকায় বেশীর ভাগ বর্তমান সদস্যেরই নাম ছিল না। তাদের পক্ষে এই সময় বিদ্রোহ করা এবং নিজের ভরসায় আলাদা ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চিন্তাও ছিল অকার্যকর।

যদিও কংগ্রেস সভাপতি রাজ্যশাখাগুলিকে লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থী তালিকা তৈরী করতে বলেছিলেন, তবু সকলে অচিরেই এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে এটা ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সঞ্জয় চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা তৈরী করেই ফেলেছিল এবং শ্রীমতী গান্ধীও অভ্যাস বশে ঐ তালিকা অনুমোদন করেছিলেন।

নির্বাচনের ঘোষণায় খুশী হলেও বিরোধীরা বুঝতে পারছিলেন যে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারা তাদের পক্ষে ভীষণ অসুবিধাজনক। মাত্র কয়েকদিন আগে পর্যন্ত বিরোধী দলগুলির সকল নেতা ছিলেন কারাভ্যন্তরে। তাদের সঙ্গে জনগনের কোন সংযোগ ছিল না। এখনও বহু কর্মী মুক্তি পায় নি। এইসব মিলিয়ে দেখতে গেলে, সময় তাদের কাছে খুব অল্পই ছিল। কিন্তু আর বেশী কালক্ষেপ করতে তাঁরা চাইছিলেন না। যেদিন মোরারজী মুক্তি পেলেন সেদিনই সংগঠন কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ, বিএলডি এবং সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দ তাঁর বাসভবনে এলেন। তাদের আলোচনা ছিল নির্বাচনের ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার। পরের দিন আবার তাঁরা এলেন। ততক্ষণে শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচনের কথা বেতারে প্রচার করে ফেলেছেন এবং জনগনের শক্তিতে পুনরায় বিশ্বাস করার সুযোগ এনে দিয়েছেন।

বিরোধী নেতৃবৃন্দের সামনে তখন জে-পির একটি চিঠি রয়েছে। সমাজতন্ত্রী নেতা এস এম যোশী পাটনা থেকে ঐ চিঠি নিয়ে এসেছিলেন। জে-পি লিখেছিলেন তাঁরা যদি এক পার্টিতে পরিণত না হন তাহলে তিনি নির্বাচন থেকে দূরে থাকবেন। এর আগে তিনি টেলিফোনেও ঐ কথা জানিয়েছেন।

বিরোধী দলগুলির সামনে একদলে পরিণত হয়ে যাওয়ার কোন সমস্যা ছিল না। কেননা জেলে থাকার সময় এ নিয়ে তাঁরা বার বার আলোচনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কংগ্রেসী জগদ্দল পাথরকে হটাতে গেলে তাদের একদলে পরিণত হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। পৃথক আলোচনায় এবং সামগ্রিক আলোচনায় শেষ পর্যন্ত সকলে ঐ এক সিদ্ধান্তেই আসছিলেন। তাহলে 'মাজারের' ব্যাপারটি আটকাচ্ছিল কোথায়? আটকাচ্ছিল নেতা কে হবে এই প্রশ্নে। ১৬ ডিসেম্বর যখন বিরোধীদের সভা হয় (মোরারজী তখনও জেলে ছিলেন) তখন একবার মনে হয়েছিল যে, চরণ সিং-ই হয়তো এই নতুন দলের নেতা হবেন। মোরারজী বন্দীশালা থেকেই লিখেছিলেন যে, তিনি 'মিলনে' আগ্রহী, নেতৃত্বে নয়।

যাই হোক নির্বাচন ঘোষণার পর বিরোধী দলনেতাদের সভা মোরারজী যেভাবে পরিচালনা করলেন তাতে তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে কারও মনেই আর কোন সন্দেহ রইল না। সব দলই মোরারজীকে চেয়ারম্যান এবং চরণ সিংকে ডেপুটি চেয়ারম্যান করার প্রস্তাবে রাজী হলেন।

শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদেই চারটি বিরোধী দলের মিলনে একটি দল তৈরী হল—উদ্দেশ্য নির্বাচনে লড়াই করা। এই যুক্তফ্রন্ট গোছের যে দল

নাম হল জনতা পার্টি, নির্বাচনে এদের একই প্রতীক এবং একই পতাকা। যুক্তফ্রন্ট বলা হল এইজন্য যে তখনও পর্যন্ত শরিক দলগুলি তাদের নিজ নিজ অস্তিত্ব বিসর্জন দিতে পারেনি। কেননা এজন্য প্রয়োজনীয় যে দলগত অধিবেশন তা অনুষ্ঠানের সময় ছিল না। কেননা তাঁরা খুব ভালোমতই জানতেন যে তাঁদের যদি বিরাট রকমের পরাজয় হয় তাহলে শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর ছেলে বলে বেড়াবে যে ভারতে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগনই তাদের সমর্থন করেছে। কিন্তু তারা যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রার্থীকে জিতিয়ে এনে লোকসভায় একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী তৈরী করতে পারেন তাহলে হয়তো শ্রীমতী গান্ধী ঐ রকম কিছু একটা দাবি করতে পারবেন না।

বিরোধীরা একদলে পরিণত হলে আরেকটা সুবিধা হবে। তাহল বিরোধী ভোটগুলি ভাগাভাগি হবে না। এপর্যন্ত দেখা গেছে যে কংগ্রেস সব সময়েই ৫০ শতাংশের কম ভোট পেয়েই গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এমন কি ১৯৭১ সালে কংগ্রেস যে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছিল তখনও তারা ভোট পেয়েছিল মাত্র ৪৬.২ শতাংশ।

জেপি এই মিলনকে স্বাগত জানালেন। জনসাধারণের সামনে তিনি খুব সহজ ভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করলেন। বললেন, আপনারা কী চান বেছে নিন গণতন্ত্র না স্বৈরতন্ত্র, স্বাধীনতা না দাসত্ব। শ্রীমতী গান্ধীর জয় হলে হবে স্বৈরতান্ত্রিকতার জয়। এই কথাটাই বিরোধীদের যুক্তফ্রন্ট সবার সামনে তুলে ধরেছিল—তারা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর কথা বেশী বলেনি।

অপর দিকে শ্রীমতী গান্ধী বললেন যে, নির্বাচন ঘোষণার মাধ্যমেই তিনি একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তিনি ডিক্টেটার নন। নির্বাচন যে স্থগিত করা হয়েছিল তার জন্য দায়ী বিরোধী দলগুলি। তারাই এমন একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যে, নির্বাচন স্থগিত রাখতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। আজ এই সকল 'বাধাদানকারী শক্তিগুলি' একত্রিত হয়ে একটি নতুন দল গড়েছে।

বিরোধী দলগুলি এই প্রশ্নে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে যায় নি। ২৩ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে তারা জনতা পার্টির অভ্যুদয় ঘটায়। ২৭ জনের একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। এরাই সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি হিসাবে চিহ্নিত হয়। জে পি নিজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন বহুসংখ্যক আঞ্চলিক দলকে একত্রিত করার কাজে। জে পি তাদের আঞ্চলিক স্বার্থবোধকে জাতীয়

স্বার্থবোধের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে বলেন। আসলে বিখ্যাত কার্টুনিস্ট রাজিন্দার আঞ্চলিক দলগুলিকে একত্রিত করার প্রস্তাব রেখেছিলেন।

জনসাধারণের কাছে পৌঁছনোর মত লোকবল বিরোধীদের ছিল না। তাদের বেশীর ভাগ কর্মী তখনও জেলে। বিরোধী দলনেতারা প্রথমে ওম মেহতা ও শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন। উভয়েই রাজবন্দীদের দ্রুত মুক্তিদানের কথা স্বীকার করলেন। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলির কাছে তাঁরা নির্দেশ পাঠালেন যে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে তারপর তাকে মুক্তি দেওয়ার কথা কেন্দ্র থেকে বলা হল। এ কথাও বলা হল যে, কাকে কাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে সে কথা যেন কেন্দ্রকে আগেই জানানো হয়। এটা আর কিছুই নয়— বিরোধী দলের কর্মীদের যত বেশী সংখ্যায় এবং যত বেশীদিন সম্ভব জেলে রাখার এটা একটা পদ্ধতি মাত্র। যাতে সরাসরি একথা কেউ বলতে পারবে না যে বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে শাসক দল দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে।

জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার এবং সেন্সর ব্যবস্থা তুলে নেওয়ার ব্যাপারেও সরকার এই রকম উৎসাহশূন্য ব্যবস্থা নিলেন। উদ্যত খোলা তলোয়ারখানা একটু অবনমিত করা হল ঠিকই কিন্তু সেটাকে খাপে পুরে ফেলা হল না। তলোয়ারখানা এমন অবস্থায় রাখা হল যাতে লোকে সেটা দেখতে পায় এবং দেখে ভয় পায়। আতঙ্কের অবস্থা তখনও এতদূর বিস্তৃত ছিল যে, জনসঙ্ঘ এতদূর পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিল। জরুরী অবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার না করলে, সকল আটক বন্দীকে মুক্তি না দিলে এবং সংবাদপত্রের উপর থেকে সেন্সরশিপ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে না নিলে তাঁরা নির্বাচন বয়কট করতে পারেন।

এমার্জেন্সী এবং প্রেস সেন্সরশিপ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যে আলোচনা শুরু হত তার যেন আর শেষ ছিল না। প্রত্যেকেই একটা কথা স্বীকার করতেন যে সেন্সরশিপ পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেওয়ার কোন মানেই হয় না। নির্বাচনের সময় পুরো স্বাধীনতা যদি সংবাদপত্র পায় তাহলে কংগ্রেসের পক্ষে সেটা খারাপই হবে। সংবাদপত্রে তখন সরাসরি কংগ্রেসের সমালোচনা হতে থাকবে। তেমন ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। যেটুকু শিথিল করা হবে তাও নির্বাচনের পর আবার চাপিয়ে দেওয়া যাবে। কেননা কংগ্রেসীরা তখনও বিশ্বাস করতেন যে, নির্বাচনে তাঁরা জিতবেই। তাছাড়া সেন্সরশিপ এখন যদি পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তাহলে তা পুনরায়

আরোপ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। কেননা তখন আবার সেই সংসদের উভয় কক্ষে এটি পাশ করানোর প্রশ্ন থাকবে।

সেন্সরশিপ ব্যবস্থা শিথিল করার অর্থ এই যে সংবাদপত্র যা খুশী তাই ছাপতে পারে। কেননা আপত্তিকর বিষয় প্রকাশ নিরোধ আইনের খোলা তলোয়ার তো তখনও ঝোলানোই ছিল। শুক্লা তখনও সেন্সর ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙ্গে ফেলেন নি। সেন্সর অফিসারদের তিনি দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে একটা কথা তাদের বুঝিয়ে দেবার জন্ম বললেন। তা হ'ল তারা যেন সঠিকভাবে 'আচরণ' করেন। আর সত্যিসত্যিই কিছু সংবাদপত্র শুক্লার আকাঙ্খিত 'আচরণ' করতে থাকেন।

পাটনা থেকে মোরারজীর বাড়িতে এসে জে পি তার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, নিবাচনে কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত। তার কারণ এই নয় যে কংগ্রেস খুব জনপ্রিয়। তার কারণ হল বিরোধী দলগুলির কাছে কর্মী একত্রিত করার মত সময় নেই, পর্যাপ্ত অর্থ নেই এবং সেইজন্য জনসাধারণের কাছে পৌছে নিজেদের কথা বলবার মত সুযোগও তাদের নেহ। জে পি'র— স্বপ্ন ছিল এই নতুন দল জাতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের একটি বিকল্প শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারবে। এই দল যে সরকার গঠনের উপযুক্ত অবস্থায় আসবে এটা জে পি সেদিন ভাবতেও পারেন নি।

জনতা পার্টি আকালী দলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্ম প্রস্তাব পাঠালেন এবং দেখা গেল আকালী দল হাতে হাত মিলিয়ে চলতে রাজী। সি পি আই (এম) জানিয়ে দিল যে তারা এই নতুন দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে না, কিন্তু নির্বাচনী আঁতাত তারা করতে পারে। কেননা তাদের বিশ্বাস, নাগরিক স্বাধীনতা না থাকলে আর্থিক কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের ভেতরই অন্যান্য সহযোগী বন্ধুর সঙ্গে আলোচনাসূত্রে— শ্রীচন্দ্রশেখরও ঐ একই ধরনের কথা বললেন। তিনি তাঁর সহযোগীদের উদ্দেশ্যে লিখলেন, 'দুটি পথ খোলা আছে, একটা হল কংগ্রেসের মধ্যে থেকে ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধি করা এবং একটা কৃত্রিম জগতের অধিবাসী হয়ে সমাজের উত্থান-পতন সম্পর্কে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা। আরেকটা হল তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা, যারা মৌল স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারকে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করেছে।

তামিলনাড়ুতে ডি এম কে সংগঠন কংগ্রেসের সমঝোতা করার ইচ্ছ প্রকাশ করেছিল। এদিকে সকল পার্টি তাদের নিজ নিজ প্রতীক নিয়ে লড়তে চাইছিল। কেননা নির্বাচন কমিশন নতুন দলকে কোন প্রতীক দিতে রাজি হন না। অন্যান্য দল বি এল ডি'র প্রতীক 'চক্রের মধ্যে হলধর' প্রতীক চিহ্ন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছিল না।

ওদিকে কংগ্রেসও তামিলনাড়ুতে বন্ধু খুঁজছিল। সিপিআই এবং এ ডি এম কে কংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিল। সিপিআইয়ের সঙ্গে সমঝোতা করায় সঞ্জয়ের আপত্তি ছিল। সে সমাচারের মাধ্যমে সিপিআই বিরোধী প্রচারও চালিয়েছিল। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী সঞ্জয়কে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে কংগ্রেসের দেওয়া সর্তেই সিপিআইয়ের সঙ্গে সমঝোতা হবে। সিপিআই কর্মীরা অন্ততঃ কিছুটা উপকারে আসবে। যদিও সিপিআইয়ের সাহায্যের কোন প্রয়োজনই তাদের হবে না—কেননা কংগ্রেস তো নিজ শক্তিতেই জয়লাভ করবে। গত বিশ মাসে যে ভয় জনসাধারণের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে তা দুই-তিন মাসের মধ্যে উবে যাবে এমন ওরা মনে করতে চায় নি। সুতরাং তারা যেভাবে বলবে জনসাধারণ সেইভাবেই ভোট দেবে।

কিন্তু খুব শীঘ্রই কংগ্রেসের এই দিবাস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। খবর আসতে লাগলো যে জনসাধারণ ভয়-ডরকে ঝেড়ে মুছে ফেলে প্রকাশ্যে মনের কথা বলছে। তাতে নিজে আলাদা হয়ে যাবার ভয়েও ভীত হচ্ছে না। জনতা পার্টি ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর শহীদ দিবসে নিজেদের প্রচার অভিযান শুরু করলো। সেখানে উপস্থিত জনগণের মনোভাব থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে সাধারণ মানুষের মনে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব খুব জোরদার। দেশের সবত্র জনতা নেতৃবৃন্দকে এই ভাবে আপামর জনতা স্বাগত জানালো যা নেতারা নিজেরাও কল্পনা করতে পারেন নি। দিল্লি, পাটনা, জয়পুর, কানপুর এবং অন্যান্য বহু জায়গায় জনতার জনসভায় এই রকম প্রচণ্ড ভীড় হল। জনসাধারণের এই স্বতঃস্ফূর্ত ভিড় থেকে সরকারী কর্তৃপক্ষও হতবাক হয়ে গেলেন।

দিল্লীর রামলীলা গ্রাউণ্ডে সরকারী হিসাবেই বলা হচ্ছে যে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়েছিল। অথচ অফিসাররা আগে হিসাব করে বলেছিলেন যে এই ভীড় দশ থেকে বিশ হাজারের মধ্যেই সীমিত থাকবে। সমাবেশে বক্তৃতা করেন মোরারজী। ১৯৭৫য়ের ২৫ জুন এই রামলীলা গ্রাউণ্ডেরই বিরাট সমাবেশে বক্তৃতা দিয়েছিলেন জেপি এবং তার কয়েক ঘণ্টা পরেই সমস্ত বিরোধী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখন ছিল গরম কাল আর এখন শীতকাল।

লোকে ঐ কনকনে শীতের মধ্যেও গভীর মনোযোগ সহকারে মোরারজীর বক্তৃতা শুনছিল। তার চেয়েও বড় কথা তারা বক্তৃতা শেষে লাইন দিয়ে জনতাপার্টির নির্বাচনী তহবিলে অর্থদান করছিল।

পাটনায় জেপি সমবেত বিরাট জনসমাবেশকে দিয়ে একটি শপথ বাক্য পাঠ করান, 'মৌলিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার কাজে যে কোন ত্যাগ স্বীকারই বড় কিছু নয়।' জুনে সেই বিখ্যাত দিল্লি মিটিংয়ের পর এই ছিল তাঁর প্রথম জনসভা। শপথ গ্রহণের জন্য হাজার হাজার হাত উপরে উঠেছে দেখে জেপি অভিভূত হয়ে পড়েন।

চরণ সিং কানপুরে এবং চন্দ্রশেখর জয়পুরে জনতার নির্বাচনী অভিযানের উদ্বোধন করেন। প্রতিটি জায়গাতেই অস্বাভাবিক রকম ভিড় হচ্ছিল। পরের দিন সকালেই শ্রীমতী গান্ধীর কাছে আসছিল গোয়েন্দা রিপোর্ট। ইন্দিরা গান্ধী রিপোর্ট পড়েই বিমূঢ় হয়ে পড়ছিলেন। যদিও গোয়েন্দা রিপোর্টগুলিতে ঐ ধরণের ভীড়ের প্রকৃত চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে খুশী করার প্রয়াস ছিলই। যাই হোক এমারজেন্সীজনিত বিধি নিষেধের পর এমন হওয়া স্বাভাবিক। এমারজেন্সীর সময় একমাত্র সঞ্জয়ের সম্বর্ধনাতেই সভা হয়েছিল। তাই শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও বিরাট বিরাট জনসমাবেশ করার কথা বললেন।

শ্রীমতী গান্ধী আরেকটা বিষয়ও লক্ষ্য করলেন যে, তাঁদের দলের 'বুড়ো হাবড়ারা' নিজ নিজ নিবাচন কেন্দ্রে পর্যন্ত পরিত্যক্ত হচ্ছে। এইসব বুড়ো এম-পিদের এবার বাদ দেওয়া দরকার। তাছাড়া এরা সবাই যে তাঁর সঙ্গে আছে সেটা আনুগত্য বশতঃ নয়, তারা আছে ভীতি বশতঃ। তাছাড়া ওদের হটিয়ে দিতে পারলে সঞ্জয়ের পক্ষেও কিছুটা সুবিধা হবে। কেননা সে তখন ঐ শূন্য-স্থানগুলিতে নিজের বিশ্বাসী লোককে ঢোকাতে পারবে। যুব কংগ্রেস প্রকাশ্যেই জানিয়ে দিল যে, তারা ১৫০ থেকে ২০০ সদস্যকে কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় স্থান করে দেবে। অম্বিকা সোনী ঘোষণা করলেন যে যুব কংগ্রেসই হল আসল কংগ্রেস।

শ্রীমতী গান্ধী সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন যে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত। বিভিন্ন রাজ্য কমিটি এর পর সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে নিজ নিজ রাজ্যের প্রার্থী মনোনয়নের দায়িত্ব প্রধান মন্ত্রীর উপর ছাড়তে থাকলেন। আসলে প্রার্থীদের তালিকা তৈরী করতে থাকলো সঞ্জয়। সেই জন্যই বোধ হয় সেইসব লোকের বাড়ীতে প্রার্থীদের বেশী ভিড় হতে লাগলো।

যাদের সঙ্গে সঞ্জয়ের যাতায়াত কথাবার্তা ও ঘনিষ্ঠতা আছে উদ্দেশ্যটা খুব সোজা, তিনি যদি একটু সঞ্জয়কে বলে দেন। কেননা প্রার্থী মনোনয়নে সঞ্জয়ের একচ্ছত্র ক্ষমতা তখন প্রশ্নাতীত রূপ নিয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় ইন্দিরা বা তাঁর পরিচিতদের বাড়ীতে মনোনয়নের জন্য প্রার্থীদের এত ভীড় হয়নি। সঞ্জয় প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্য নিত। প্রার্থীর নিজস্ব এলাকায় তার প্রভাব কেমন আছে এসব খোঁজ খবর সে গোয়েন্দা দপ্তরের কাছ থেকেই নিত। তাছাড়া ব্যক্তিগত আরও অনেক খোঁজ খবর পেত বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিজের অধীন করে রাখার বিশেষ সুবিধাও তার হত। লোকসভার মোট ৫৪২ টি আসনের মধ্যে—প্রতিটির জন্য মনোনয়ন পেতে গড়ে ২০০ জন হিসেবে আবেদন করেছিল।

বংশীলাল হরিয়ানায় যে তালিকা ঠিক করেছিলেন সেটা দেখে ছোটখাট রদবদল করে দেয় সঞ্জয়। মহারাষ্ট্রের তালিকাও সঞ্জয়ের পরামর্শক্রমে ঘোষিত হয়। সব কিছুই সঞ্জয়ের পরিকল্পনা মত হচ্ছিল।

তারপরেই এই মহান পরিকল্পনার ভিত হঠাৎ খসে গেল। ঘটলো একটা রাজনৈতিক বিস্ফোরণ। জগজীবনরাম কংগ্রেস এবং সরকার থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করলেন। কংগ্রেসের ভেতর কেউ-ই এজন্য প্রস্তুত ছিল না।

তিনদিন আগেই গোয়েন্দা বিভাগ ওম মেহতাকে একটা গুজবের কথা জানিয়েছিলেন যে জগজীবনরাম হয়তো বিদ্রোহ করতে পারেন। কিন্তু এর উপর কোন গুরুত্বই আরোপ করা হয় নি। জগজীবনরাম নিজে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে একদিন আগেই দেখা করেছিলেন। সেখানে এসব বিষয়ে কোন কথাই হয়নি। শ্রীমতী গান্ধীকে তিনি জরুরী অবস্থা বলবৎ রাখার বিরুদ্ধে নিজের অভিমতের কথা জানিয়েছিলেন। পরে তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের বলেছেন যে আমি যদি সেদিন দলত্যাগের কোন ইঙ্গিতও দিতাম, তাহলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হত।

যেদিন জগজীবনরাম পদত্যাগ করেন সেদিন তিনি তাঁর বাসভবনের বিস্তৃত ল'নে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ প্রেস কনফারেন্সে বলেন যে তিনি সকল কংগ্রেসীকে তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন যাতে জরুরী অবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য এবং অন্যান্য যে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাদি সম্প্রতি এদেশের রাজনীতির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলি বাতিলের জন্য সংগ্রাম করা যায়। তিনি বলেন, কংগ্রেসের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এখন গণতন্ত্র বলে কিছু নেই।

কংগ্রেসের মূল সংগঠন ও তার-সংসদীয় শাখায় ওপর থেকে বিশৃঙ্খলা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুই পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশের এইচ, এন, বহুগুণা এবং ওড়িশার নন্দিনী শতপথী জগজ্জীবনরামের দুই পাশে বসেছিলেন। তাঁরা এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে আর গণেশও ওখানেই ঘোষণা করলেন যে, তাঁরাও কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরা সকলে একযোগে বললেন, 'আমরা নতুন কংগ্রেস নই—আমরা সকলেই সেই পুরনো কংগ্রেসী।' এগুলি অনেকটা সেই একই ভাষা যা শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সমর্থকরা ১৯৬৭ সালে ব্যবহার করতেন। তার পরেই তারা পৃথক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে।

আমি জগজ্জীবনরামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি কেন পদত্যাগ করলেন। এর উত্তরে তিনি বললেন, কোন একটা কারণ পৃথকভাবে দেখানো সম্ভব নয়। গত বেশ কিছু মাস ধরে যে সব ঘটনা ঘটছে তারই পরিণতি এই পদত্যাগ। তাছাড়া শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর ছেলে ক্ষমতার যেরকম নগ্ন অপব্যবহার শুরু করেছিলেন তাতে ওখানে টিকে থাকা অসম্ভব ছিল।

কংগ্রেসের 'লেজুড়' সংবাদপত্রগুলি ছাড়া সকলেই জগজ্জীবনের পদত্যাগ সংক্রান্ত খবর নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলো। অপরদিকে কংগ্রেসীরা রাগে ফেটে পড়লো। জগজ্জীবনরাম ও তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা পদত্যাগ করেছিলেন তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হল। কংগ্রেস পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির সর্বসম্মত প্রস্তাবে জগজ্জীবনের নিন্দা করা হল। বড়ুয়া একে 'একজন ব্যক্তির' পদত্যাগ বলে বর্ণনা করলেন। শ্রীমতী গান্ধী বললেন, এটা খুবই আশ্চর্যের যে এত মাস তিনি কী করেছিলেন। সরকারী সংবাদ সংস্থা সমাচার এই পদত্যাগকে দলত্যাগ বলে বর্ণনা করলো।

কংগ্রেসীরা জগজ্জীবনের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা দিলেও শ্রীমতী গান্ধী বিশেষভাবে বিচলিত হলেন। এত বছর ধরে তিনিই কেবল চমক সৃষ্টি করে এসেছেন। তাঁর জীবনে এই প্রথম যখন জগজ্জীবন রাম চমক সৃষ্টি করলেন। যখন তিনি নির্বাচন ঘোষণা করেন তখন জানতেন যে নির্বাচনী যাঁতাতে সি পি আইকে পাশে পাওয়া যাবে, কিন্তু জগজ্জীবন রামের পদত্যাগ তাঁর পক্ষে এক সাংঘাতিক আঘাত স্বরূপ। রামের কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসী হল কংগ্রেসের বহু বিক্ষুব্ধ সদস্যকেই টেনে নেবে। কেননা তিনি জানেন যে এই ধরনের বিক্ষুব্ধদের সংখ্যা কংগ্রেসে কিছু কম নেই। তাছাড়া এখন সমস্যাটা একটু ঘুরে গেল বুড়োদের বাদ দিয়ে সঞ্জয়ের বিশ্বস্ত যুবদের প্রার্থী তালিকায় ঢোকাবার

চেষ্টাতেও এবার খানিকটা ভাঁটা পড়বে। কেননা আগে কাউকে বাদ দিলেও তার বাইরে কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। এখন বাবুজীর সি-এফ-ডি রয়েছে। কাউকে মনোনয়ন না দিলেই সে গিয়ে সোজা ঢুকে পড়বে ঐ দলে।

ফলে 'বুড়ো হাবড়াদের' বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা তাঁকে ত্যাগ করতে হল। বাধ্য হয়েই তাঁকে পুরনো এবং বিশ্বস্ত লোকদের উপর নির্ভর করতে হল। সঞ্জয়ের তালিকা তাই এক কথায় অকেজো হয়ে গেল। জগজীবন রামের পদত্যাগের ফলে তাই প্রথম শহীদ হল যুব কংগ্রেস। বেশীর ভাগ বর্তমান সংসদ সদস্যই আবার টিকিট পেলেন। কংগ্রেসে তখন নতুন শ্লোগান 'পুরনোদের সঙ্গে থাকুন'। তখন দিল্লিতে একটা দারুণ রসিকতা চলতো। তাহল পুরণো এম-পি'রা সকলেই বাড়ীতে জগজীবন রামের ছবি রেখে সকাল সন্ধ্যে প্রণাম করতেন।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জগজীবন রামের আরেকটা বড় অভিযোগ ছিল যে ওখানে বড্ড বেশী 'মনিব সুলভ' আচরণ হয়। কংগ্রেসকে এই অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেক কিছু করতে হয়। আগের মত কোন এক ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থী তালিকায় আর হেরফের করা হয় না। লোক দেখানোর জন্য হলেও একটি মিটিং অন্ততঃ এই ব্যাপারে হত। এ আই সি সি দপ্তর থেকে একদিন এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে একটা ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সকলকে বলা হল যে রাজ্যগুলির প্রার্থী তালিকা প্রধানমন্ত্রী একা স্থির করছেন না, এজন্য যে কমিটি আছে তাঁরাই সব কিছু সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

কংগ্রেসের ভেতর আরেকটা ভয়ও ঢুকে গিয়েছিল যে হোমরা চোমরা কোন কোন নেতা রুষ্ট হয়ে গেলেও যাতে দল থেকে তিনি বেরিয়ে না যান, সেজন্যও সতর্ক নজর রাখা হল। সিদ্ধার্থ রায়ের মত লোক যিনি সঞ্জয়ের নেক নজর থেকে পড়ে গিয়েছিলেন বলে দিল্লিতে পাত্তা পাচ্ছিলেন না তাঁরও গুরুত্ব আবার বেড়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগের ভয় দেখিয়ে রাজ্যের প্রার্থী তালিকায় তিনিও নিজের প্রভাব বিস্তার করলেন।

জগজীবন রামের পদত্যাগে কংগ্রেসের তহবিল সংগ্রহেও হঠাৎ যেন ভাটার টান দেখা দিল। কোন অর্থদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করলেই জানা যেত তিনি এখন এদেশে নেই, বিদেশে গেছেন। টাকা পয়সার ব্যাপারে কংগ্রেসের অবশ্য চিন্তার কিছুই ছিল না। দলের স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করে ৩০ কোটি টাকার বিজ্ঞাপন পাওয়া গিয়েছিল। তাছাড়া নগদ 'দান' এসেছিল ২০ কোটি

টাকায়। এই পুরো টাকাটাই চেকে অথবা নগদে হয় পি, সি, শেঠীর কাছে আর না হয় ১, সফদরজং রোডে শ্রীমতী গান্ধীর বাসভবনে জমা পড়েছিল।

সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সের সেক্রেটারী টি, পি, ঝুনঝুনওয়ালা ১৬ জুলাই ১৯৭৬ ( নং ২০৩ ) সকল আয়কর কমিশনারের নামে একটি সার্কুলার ও তার কপি বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির কাছে প্রেরণ করায় কংগ্রেসের স্মারক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন সংগ্রহ খুব সহজ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৩ সালের পর এই প্রথম স্মারক পত্রিকার বাড়তি হারে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে তার দ্বারা কংগ্রেসের তহবিল পূর্ণ করার চেষ্টা করে। কেননা রাজনৈতিক দলকে দান করা কোম্পানীগুলির পক্ষে আইনতঃ সম্ভব ছিল না। তাই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই অর্থসংগ্রহ এবং এই পদ্ধতির জনক যশপাল কাপুর ও ধবন। এই স্মারক পত্রিকার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ঐ সব পত্রিকা একমাত্র বিজ্ঞাপনদাতা ছাড়া আর কারও হাতেই পড়তো না। আর কারও হাতে পড়ার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় ছাপাও হত না।

কংগ্রেস দেখলো যে জনপ্রিয়তা যখন কমে যাচ্ছে তখন সেটা পূরণ করতে হবে টাকা পয়সা দিয়ে। যদিও ১৯৭১ সালে শ্রীমতী ইন্দিরাই 'গরীবী হটাও' স্লোগান দিয়ে টাকার থলেকে কাবু করে দিয়েছিলেন। আর এবার জনগণের মন জয় করার জন্য কংগ্রেসকেই টাকার অস্ত্র ব্যবহার করতে হচ্ছে। কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ পি সি শেঠী ২, কোশিক রোড, নয়াদিল্লিতে নিজের অফিস খুলে বসলেন এবং প্রত্যেক প্রার্থীকে এক লাখ করে টাকা এবং দুখানি করে জীপ দিতে থাকলেন।

এর বিপরীত জনতা পার্টি বিরাট তহবিলের কথা চিন্তা না করেই কেবল নির্বাচনী কুপন ছেপে প্রচার অভিযানে নামলেন। জেপির চেষ্টায় সি এফ ডিও জনতার সঙ্গে এলেন। এক পতাকা তলে এবং এক প্রতীক নিয়ে তাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। জামা মসজিদের শাহী ইমাম মৌলানা সৈয়দ আবদুল্লা বুখারি যিনি মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় তিনিও তাঁর শক্তি নিয়ে বিরোধীদের পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

জনতা-সি এফ ডির জোর আরও বেড়ে গেল তখন যখন ১২ ফেব্রুয়ারি নেহরুর বোন ও শ্রীমতী গান্ধীর পিসীমা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রকাশ্যে তাঁর ভাইঝির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তিনি বললেন, 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যা আমরা ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিলাম একের পর এক তা ধ্বংস এবং ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে। আইনের শাসন এবং বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য সমাপ্ত করা হয়েছে।

সংবাদপত্রের উপরও আরোপিত হয়েছে সেন্সরশিপ।' তিনি জোর দিয়ে বললেন যে, আজ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলিকে আবার চালু করা।

প্রকৃত পক্ষে শ্রীমতী পণ্ডিতের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না। দীর্ঘদিনের মধ্যে শ্রীমতী পণ্ডিত একবার শুধু তাঁর ভাইঝির বাড়িতে গিয়েছিলেন বিদেশে যাবার অনুমতি চাইতে। সেই শেষ। শ্রীমতী বিজয়-লক্ষ্মী পণ্ডিতের মেয়ে 'তারা' একবার আমাকে বলেছিল, 'একটা সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ীর কুকুরও মামুর বাড়িতে (নেহরুজীর বাড়িতে) আদর পেত আর আজ আমাদের কথাও কেউ জিজ্ঞাসা করে না।'

এ সব ঘটনায় শ্রীমতী গান্ধীর মন স্বভাবতঃই খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। এখনও গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হচ্ছিল যে, নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু আসনের সংখ্যা পূর্বের হিসাবের চেয়ে বেশ পড়ে গিয়েছিল। বুদ্ধিজীবী মহলে আবার একটা ধাক্কা এল যখন বিচারপতি এইচ এল খান্নাকে অতিক্রম করে বিচারপতি এম এইচ বেগকে প্রধান বিচারপতি করা হল। গোখলে আমাকে বলেন যে তিনি শ্রীমতী গান্ধীকে নিষেধ করেছিলেন যে, খান্নার অগ্রাধিকার ক্ষুণ্ণ করে তিনি যেন বেগকে প্রধান বিচারপতি না করেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী গোখলের কথায় কান দেন নি। মিসা মামলায় বিরোধী মত দেওয়ার জন্যই খান্নাকে এই মূল্য দিতে হয়েছিল।

সমস্ত পরিস্থিতি ক্রমাগত কংগ্রেসের বিপক্ষে চলে যাচ্ছিল বলে গুজব রটে গেল যে, নির্বাচন হয়ত স্থগিত করে দেওয়া হবে। গুজব এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের দিনক্ষণ সমেত 'নোটিফিকেশনটাই' কাগজে প্রকাশ করতে হল। বলা হল যে ১৬ থেকে ২০ মার্চের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

শ্রীমতী গান্ধী তখনও আশা করছেন যে ২৮০টি আসন লাভ করবেন। গোয়েন্দা বিভাগও তাই বলছে, যত দিন যায় শ্রীমতী গান্ধীর ভয়ও তত বাড়ে। ক্রমে তাঁর বক্তৃতাতেও সেই ভয়ের ছাপ প্রতিফলিত হতে থাকে। তিনি বলেন, দেশের নিরাপত্তা ভিতর ও বাহির দুই দিক থেকে বিপন্ন হতে চলেছে। তিনি বলেন, বিরোধীরা আবার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি এমারজেন্সীকে সমর্থন করে বল্লেন, এর ফলে সর্বক্ষেত্রে দেশের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করতে ভুল করেন না যে তাঁর জনসভাতে পর্যন্ত শ্রোতার সংখ্যা কমছে। তখন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন, 'এ বিষয়ে কোন

সন্দেহ নেই যে ভুল আমরাও করেছি। কিন্তু তার জন্য দায়ী অফিসারকে আমরা সাসপেণ্ডও করেছি।'

ভুল তিনি একটা করেন নি, ভুল করেছেন দফায় দফায় প্রায় প্রতি পদক্ষেপে। লোকে তাঁর উপর আস্থা হারিয়েছে। এটা এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ যখন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তখন চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, তার আগের দিন রাত ছুটোর সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী রাষ্ট্রপতির বাড়িতে গিয়ে একটা অর্ডিনান্স জারি করার কথা বলেন, যার ফলে মিসায় আটক বন্দীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। এই নিয়েই নাকি উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ায় হৃদরোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। পরে আমি শ্রীমতী আমেদের কাছ থেকে জানতে পারি যে ঐ রাতে শ্রীমতী গান্ধী রাষ্ট্রপতি ভবনে আসেনই নি। শ্রীমতী গান্ধীর সিকিউরিটিরাও ঐ একই কথা বলে। তবে হ্যাঁ সে রাতে শ্রীমতী গান্ধী রাষ্ট্রপতিকে একবার ফোন করেছিলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন বিষয়ে মত বিরোধ হয় নি।

তাঁর উপর লোকের আস্থা না থাকা যেমন খারাপ তার চেয়েও বেশী খারাপ হল এই বিশ্বাস লোকের মনে গেঁথে যাওয়া যে তিনি নিজের ছেলে সঞ্জয়কে প্রধানমন্ত্রী করতে চান। তিনি অবশ্যই একথা বলেছেন যে সঞ্জয়ের কোন 'রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা' নেই। কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাস করে নি। বরং তাদের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়েছে যখন তারা দেখেছে যে সঞ্জয়কে আমেথি কেন্দ্র থেকে লোকসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তাঁর নিজের কেন্দ্র রায়বেরেলীর ঠিক পাশেই হল আমেথি কেন্দ্র। এ সব দেখে শুনে লোকে যেখানে ডিক্টেটরশিপ ভার্সাস ডেমোক্রেসী স্লোগান দিচ্ছিল তারা সেটাকে পাল্টে দিয়ে করলো ডাইনেষ্টি (বংশানুক্রম) বনাম ডেমোক্রেসী।'

প্রকৃত পক্ষে এবারকার নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে স্বৈরতান্ত্রিকতার অভিযোগটি লেগেই ছিল। প্রথম প্রথম তিনি এর প্রতি কোন নজর দেন নি। পরে তিনি উত্তর দিয়েছেন—'কংগ্রেস একজন মাত্র ব্যক্তির দল নয়' 'আমি কংগ্রেসের একজন সেবিকা মাত্র'। তবুও তাঁর বিরুদ্ধে স্বৈরতান্ত্রিকতার ঐ অভিযোগ লেগেই ছিল। তখন তিনি আবার বললেন, বিরোধীদের তো মাত্র একটিই কর্মসূচী আছে আর তাহল আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করা। ১৯৭১ সালে এই কথা বলে তিনি কংগ্রেসের জন্য লোকসভায় দুই তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে

দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার তাঁর উপর আস্থা একেবারেই ছিল না এবং আর্থিক ক্ষেত্রেও তাঁর কাজ খুব একটা উৎসাহবর্ধক ছিল না।

নির্বাচনী ঘোষণাপত্রগুলিতে বিভিন্ন দল তাদের কথা বললেন। কংগ্রেস আবার 'দারিদ্র, অসাম্য ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের' কথা বললেন। এর বিপরীত জনতা কৃষিসমস্যা ও বেকারী দূর করার কথা এবং আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বললেন। অন্যান্য দলও পছন্দসই ভালো ভালো কথা বললেন। কিন্তু ইলেকশানে যে স্লোগান টিঁকে গেল তা হল বিরোধীদের 'স্বৈরতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র' আর শাসকদলের 'গণতন্ত্র বনাম বিশৃঙ্খলা'। তারপর নির্বাচনী প্রচারে ব্যক্তিগত আক্রমণও চললো। শ্রীমতী গান্ধী বললেন, বিরোধীরা 'আমাকে ঘিরে ধরে ছুরি মারতে চায়। মোরারজী উত্তর দিলেন, 'আমাদের ইতিমধ্যেই ছুরি মারা হয়েছে।' জগজীবনরাম বললেন, 'সরকার এবং কংগ্রেস দলের গণতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতিকে অধিকতর সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।' এর মধ্যে অনেক প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ পর্যন্ত করা হল না সব বাদ পড়ে গেল। কিন্তু নির্বাচনী প্রচার এমনভাবে চলতে লাগলো যে বার বার একথা মনে হচ্ছিল যে এদেশে বোধ হয় এই প্রথম নির্বাচন হচ্ছে।

এবারকার নির্বাচনের সব চেয়ে বড় লক্ষণীয় দিক এই ছিল যে, বেশীর ভাগ আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সরাসরি। কংগ্রেস ৪৯২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল আর ৫০টি আসন দিয়েছিল সি পি আই ও এডিএমকে দলকে। জনতা পার্টির প্রার্থীসংখ্যা ছিল ৩৯১। ১৪৭টি আসন তারা সি এফ ডি, সি পি আই (এম), আকালী দল (পাঞ্জাব) এবং ডি এমকে (তামিলনাড়ু) দেয়।

১৯৬৭ সালে কংগ্রেস ৪০.৭ শতাংশ ভোট পেয়েও আসন পেয়েছিল মাত্র ২৮৩টি। ১৯৭১-য়ে কংগ্রেসের ভোট বেড়েছিল মাত্র ৩ শতাংশ অর্থাৎ মোট তারা ৪৩.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। কিন্তু সেখানে সীট পেয়েছিল ৩৫০টি। এবার বিরোধীদের আশা হল ঐ বাড়তি ভোটটা তারা নিজেদের দিকে টেনে নেবে। কেননা আরেকটা লক্ষণীয় ব্যাপার এই ছিল যে ইন্দিরা প্রবাহ নামক কোন বস্তু এবারকার নির্বাচনে ছিল না। বরং ১৯৭৫-য়ের জুন মাস থেকে এমার্জেন্সীর নামে যে দমনমূলক শাসন ব্যবস্থা এদেশে কায়েম হয়েছিল তার জন্য লোকে দায়ী করেছিল শ্রীমতী গান্ধীকেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে প্রদত্ত গোয়েন্দা রিপোর্টে এমন বহু ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছিল। যেখানে জুনিয়ার পুলিশ অফিসার

গ্রামের বহু লোককে মিসায় গ্রেপ্তার করিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে নিয়মিত অর্থশোষণ করেছে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বহু গ্রামবাসীকে নিয়মিত পুলিশকে 'পার্বনী' দিতে হয়েছে।

শ্রীমতী গান্ধী যখন দিল্লির নির্বাচনী সভায় বলেন যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়নের ক্ষেত্রে এবং বস্তী সাফ করার কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে তাঁরা অনেক ভুল করেছেন। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সভায় বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি ও ব্যঙ্গাত্মক হাসি-ঠাট্টা শুরু হয়ে যায়। মনে হয় তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ তখন শূন্যে গিয়ে ঠেকেছিল। তবু তাঁর জনসভায় কিছু লোক হচ্ছিল। কিন্তু চবনের জনসভায় লোকের সংখ্যা আঙুলে গোনা যেত।

আমি ফুলপুরে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সভার রিপোর্ট নিতে যাই। গিয়ে দেখি সভায় তেমন লোক নেই যা ১৯৭৪ সালে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও আমি দেখে গেছি। বাঁশ দিয়ে ঘেরা খোপ খোপ করা জায়গার বহু খোপই ফাঁকা ছিল। লোক এত কম ছিল যে ১৫ মিটার উঁচু মঞ্চ থেকে দেওয়া স্লোগানের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল খুব দুর্বল কণ্ঠে। হেলিকপ্টারে করে এসে মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য এখানে শ্রীমতী গান্ধী বক্তৃতা করেন এবং তাতে প্রচুর পরিমাণে আত্মপ্রচারের ঢক্কা নিনাদ করেন। বলেন, 'আমাদের পরিবারের ত্যাগ স্বীকারের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। আমার ঠাকুরদাদা স্বরাজভবন তৈরী করে জাতির উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ করেন পরে নির্মিত হয় আনন্দভবন আমি সেটি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দান করেছি। আমরা নিজেদের জন্য কিছুই চাই না। দেশের কিছু লোক আমাদের বিরোধিতা করলেও আমরা দেশের সেবা করতে চাই। আমাদের পরিবার ভবিষ্যতেও এই রকম সেবার কাজ করে যাবে।'

বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলেও আকাশে হেলিকপ্টার ওড়ার তামাশা দেখার জন্য অনেক লোক দাঁড়িয়ে থাকে। জনতার মিটিংয়ে কিংবা সি এফ ডির মিটিংয়ে এই সব চোখ ধাঁধানো ব্যাপার না থাকলেও ভিড় কংগ্রেসী সভার তুলনায় অনেক বেশী হচ্ছিল। জনতা নেতাদের সভায় আসতে দেরী হলেও লোকের মুখে বিরক্তি ছিল না। এমন কি জনতা নেতার বক্তৃতা শোনার জন্য লোকে রাতভোর অপেক্ষা করেছে। ইউ পি, বিহার, পাঞ্জাব হরিয়ানা, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, জনতা প্রার্থী হয়ে কেউ দাঁড়িয়েছে কি তার জয় এক রকম সুনিশ্চিত। ঠাট্টা করে তাই

বলা হত জনতার নামে ল্যাম্পপোস্ট দাঁড়ালেও এ সব জায়গায় তার জয়লাভ ঘটবেই।

বিরোধীরা লোকের ক্রোধকেই আরও তীব্র করার কাজে উঠে পড়ে লাগলো। জেলের মধ্যে অত্যাচারের যে সব ঘটনা ঘটেছে তার ভয়াবহ ঘটনাগুলির কথা বলা হতে থাকলো। কাল পর্যন্ত যে সব সংবাদপত্র জরুরী অবস্থা ও সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন সেই সব সংবাদপত্রই এখন প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিল যে কত বেশী অত্যাচারের কাহিনী ছাপাতে পারে। গোয়েন্দা বিভাগ ও আমলারা বিরোধীদের শক্তিকে স্বীকারই দিত না। তারাও ইদানিং বিরোধী দলের মধ্যে সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি দেখতে পাচ্ছিল। তাই তারাও এখন কংগ্রেসের বিরোধিতা শুরু করে দিল। কংগ্রেসী 'স্থিতির' চেয়ে বিরোধীদের 'অস্থিতি' অনেক ভালো—একথা তারাই প্রচার করতে লাগলো।

এই সবের পরিপ্রেক্ষিতেই কংগ্রেসের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল। 'ভাঙবে তবু মচ্‌কাবে না।' প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে তারবার্তা পাঠান হল যে তাঁরা যেন নিজ নিজ রাজ্যে যত খুশী ছাড়, ও জনগণের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রকার আর্থিক সংস্থান করেন। মুখ্যমন্ত্রীরা তখন দরাজ হাতে দিতে থাকেন। কে কত শীঘ্র কোষাগার খালি করতে পারে তার যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে রাজ্যগুলি ওভারড্রাফটও নেয় প্রচুর পরিমাণে। মাত্র কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যগুলি ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে ফেলে। কিন্তু এত করেও লোকের মন বদলানো গেল না। তারা ঘুরে ফিরে সেই জরুরী অবস্থাকালীন অত্যাচারের কথাই বলে। নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগে শ্রীমতী গান্ধী কেবিনেট মিটিং ডেকে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের বিষয়টি উত্থাপন করেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে সকলে অভিমত দেন যে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা উচিত হবে না। তা ছাড়া এখন প্রত্যাহার করলেও তার সুযোগ কংগ্রেস পাবে না —পাবে বিরোধীরা।

তা ছাড়া জরুরী অবস্থাই তো তাদের একমাত্র রাগের কারণ নয়। তাদের রাগের কারণ সঞ্জয়, তাদের রাগের কারণ বংশীলাল এবং তাদের রাগের হলেন স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী। তার কী হবে?

নির্বাচনের শেষ দিন পর্যন্ত সংবাদপত্রগুলিও একথা বলতে পারে নি যে ইন্দিরা গান্ধী বা তদর্থে কংগ্রেস এবার হেরে যাবে। পশ্চিমী দেশগুলিরই

এই ধারণাই ছিল। ছোটখাট স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলি ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনার ওপর জোর দিলেও বড় বড় পশ্চিমী দেশগুলি মনে প্রাণে চাইছিল যে শ্রীমতী গান্ধী জিতুন। একদিন ওয়েস্ট জার্মানী এমন হুমকি পর্যন্ত দিয়েছিল যে তার দেশের কোন সংবাদদাতাকে যদি বহিষ্কার করা হয় তাহলে দ্বিতীয় দিন থেকে জার্মানী ভারতকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দেবে। সেই জার্মানীই এখন বলছে যে শ্রীমতী গান্ধীই হলেন ভারতের পক্ষে উপযুক্ত নেতা। জার্মানী আরও বলেছিল পশ্চিম যদি তাঁর প্রতি বিমুখ হয় তাহলে শ্রীমতী গান্ধী রাশিয়ার দিকে ঝুঁকবেনই।

বৃটিশ হাই কমিশনার মাইকেল ওয়াকার লণ্ডনকে লিখেছিলেন, শ্রীমতী গান্ধীকে স্বীকার করাই ভাল গণতন্ত্র বরং ভুলে যান। পরবর্তী হাই কমিশনার জে, এ, টমসন লিখলেন, যুক্তির কথা হল শ্রীমতী গান্ধী হয়তো জিতবেন। কিন্তু আমার মন বলছে এর বিপরীত হলেও হতে পারে।

মার্কিণ রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি স্যাক্সবীর ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে শ্রীমতী গান্ধী যখন নৈশভোজে যোগ দেন তখন থেকেই স্যাক্সবী শ্রীমতী গান্ধীর অনুরক্ত। তিনি ওয়াশিংটনকে লিখেছিলেন, সুস্থ ভারত ও বিশৃঙ্খল ভারতের মাঝখানে একমাত্র তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন। স্যাক্সবীর সঙ্গে সঞ্জয়েরও বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি মারুতির সঙ্গে মার্কিণ সংস্থা ইণ্টারন্যাশনাল হার্ভেস্টারের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন।

সব চেয়ে মজার কথা হল সোভিয়েট রাশিয়া কিন্তু সাফ কথা মুখের উপর বলে দিয়েছিল শ্রীমতী গান্ধীর জয়ের আশা এবার খুব কম। রাশিয়ান অফিসাররা মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে জানিয়ে দেন যে, নির্বাচনের ফলাফল মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক হবে না।

নির্বাচনী প্রচার সেরে শ্রীমতী গান্ধী দিল্লি ফিরলেন ১৮ মার্চ। নির্বাচনের অনেকটাই তখন হয়ে গেছে। নির্বাচন সম্পূর্ণ হতে আর দুটো দিন বাকী। সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রচারে একমাত্র আমেথীতে সঞ্জয়ের উপর গুলি চালনা ছাড়া আর কোন ঘটনা ঘটে নি। জে পি সমেত সকলেই এই ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দেন। কেউ কেউ আবার সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন এটা ভোটারদের মনে সহানুভূতি জাগাবার উদ্দেশ্যে কোন বানানো ঘটনা নয়তো! যাই হোক ইন্দিরাজী বাড়ি ফিরেই সঞ্জয় ধবন ওম মেহতা ও বংশীলালকে বললেন, এই বাসভবন রক্ষার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই অনুযায়ী রাঁস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করা ছাড়াও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর দশ ব্যাটালিয়ান (৬,০০০)

জওয়ানকে ইতিমধ্যেই ওখানে হাজির করা হয়েছে। দিল্লির ডি আই জি, আই জি সকলকে জানানো হয় যে, 'যে ভাবেই হোক' প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনকে রক্ষা করতেই হবে। আই জি বলেন, এই 'যে ভাবেই হোক' কথাটার অর্থ হল দরকার হলে গুলি চালিয়েও রক্ষা করতে হবে।

একে কেন্দ্র করেই জোর গুজব ছড়িয়ে গেল যে, শ্রীমতী গান্ধী হেরে গেলে মার্শাল ল' জারি করা হবে। কিন্তু এর মধ্যে কোন সত্যতা নেই। তবে হ্যাঁ, মার্চ মাসে দিল্লিতে সেনাবাহিনীর প্রধানদের এক সভা হয়েছিল সেখানে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মণি মিশ্রকে সরিয়ে হরদয়াল কলকে ( টি এন কলের ভাই ) বসানো হয়েছিল। পরে সেনা বাহিনীর প্রধান টি এন রায়না রোটারী ক্লাবের বক্তৃতায় নাকি বলেছিলেন যে, শ্রীমতী গান্ধী নাকি প্রশাসনিক ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর সাহায্য চেয়েছিলেন এবং রায়না তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে জানা যায়, এটাও একটা ডাহা গুজব। আমেরিকার 'নেশন' পত্রিকা এই মর্মে একটি রিপোর্ট বের করেছিল।

তখনও প্রধানমন্ত্রীর ধারণা যে কংগ্রেস ২০০ থেকে ২২০টা আসন পাচ্ছে। বাকী কয়েকজন এম পিকে কিনতে পারলেই তাঁর পক্ষে সরকার গঠন করা হয়তো সম্ভব হবে। তাছাড়া অস্থায়ী রাজ্যপাল বি ডি জাত্তি এ ব্যাপারে তাঁকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। কেননা তিনি যে রাজনৈতিক দিক থেকে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে ঋণী একথা তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন।

তার মনে যে পরিকল্পনাই থাক না কেন সব বানচাল হয়ে গেল তখন—যখন তিনি জানতে পারলেন যে তিনি তাঁর পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনারায়ণের কাছে হেরে গেলেন। তাঁর এবং তাঁর পুত্র সঞ্জয়ের পরাজয়ের খবর যখন সাইন বোর্ডে লিখে দেওয়া হল তখন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে খোল কর্তাল বাজিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় নাচতে শুরু করে দিল। সে কি উৎসাহ! একটি দোকান তো বিনা পয়সায় লোকেদের রুটি তন্দুরি রোটি খাওয়াতে লাগলো। এ হল একজন মানুষের ইতিহাস যিনি ক্ষমতার উচ্চাসন থেকে তথাকথিত 'অশিক্ষিত' মানুষের দ্বারা তাঁকে এইভাবে নীচে নামতে হল।

শ্রীমতী গান্ধীর প্রস্থানে একটি যুগের অবসান হল যে যুগ সম্পূর্ণ ভালোও নয় আবার সম্পূর্ণ খারাপও নয়।

'ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে নির্ভর করে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখা খুব ছোট কাজ নয়। তিনি একাজ করেছেন। পুরনো রীতিনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার

যে সাহস তিনি দেখিয়েছেন তা বিরল। রাজনীতির যে পথ তিনি পরিক্রমা করেছেন অন্য যে কেউ হলে ভয়ে সেপথে পা বাড়াতো না। তাঁর কাছে পরিণামই ছিল প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কী পদ্ধতিতে সেই পরিণামে পৌছনো হল তার কোন গুরুত্বই তাঁর কাছে ছিল না। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসকে দুটুকরো করার সময়ই হোক কিম্বা ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা জারী করার সময় হোক এটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে, জয়লাভের জন্য তিনি যে কোন পথই অবলম্বন করতে পারেন। তাঁর কাছে জয়ই বড় কথা। কী করে জয়লাভ করলেন তা নয়। ১৯৬৯ সালে তিনি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। এটা খুবই প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু একথাও ঠিক যে সেদিন মোরারজীকে হটাবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

ক্রমে যত দিন যায় ততই তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে, দেশের পক্ষে কোনটা ভালো বা কোনটা মন্দ সেটা একমাত্র তিনিই জানেন। ক্রমে তিনি নিজেকে প্রশাসনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বলে মনে করতে থাকেন। নিজের প্রভূত্ব ও গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য তিনি আলাদা একটি গোয়েন্দা সংস্থা গড়ে তোলেন। কেবিনেট মিটিংয়ে তিনি স্কুলের শিক্ষিকার মত কথা বলতেন। কোন মন্ত্রী সাহস করে কোন কথাই বলতে পারতেন না পাছে শ্রীমতী গান্ধী রেগে যান। তিনি বিরোধী দলকে সব সময় বলির পাঁঠা হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সরকারী নীতিতে যখন কোন ব্যর্থতা এসেছে বা কোন কাজে গাফিলতি দেখা দিয়েছে তৎক্ষণাৎ তার দায়িত্ব তিনি বিরোধী দলগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। কোন একটি কাজের জন্য কাউকে তিনি হয়তো মাথায় তুলেছেন আবার কাজ হয়ে গেলে তাকে ছিবড়ের মত ফেলে দিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তাঁর কোন স্থায়ী উপদেষ্টা ছিল না। কেননা তিনি কাউকেই বিশ্বাস করতেন না।

এত সাহসিক হয়েও তিনি দুটি দুর্বল যষ্টির ওপর ভর দিয়েছিলেন। এর একজন হলেন বংশীলাল ও অপর জন তাঁর ছেলে সঞ্জয়। তিনি জানতেন যে এদের ছাড়াও তিনি চলতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল তা তিনি চলেন নি। এমন কি সঞ্জয় ও বংশীলাল যখন নির্বাচনের মধ্যে না যাবার কথা বলেছিলেন তখনও তিনি তাদের কথা শোনেন নি। কেননা অপরের পরামর্শ সব সময় তিনি গ্রহন করতেন না। তিনি মনে করতেন পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ধারণাই চূড়ান্ত। তিনি যে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন এই কথাটাই তিনি বুঝতেই চান নি। উল্টে তিনি সঞ্জয় বংশীলালকে দেখিয়ে দিচ্ছে

চেয়েছিলেন যে, জনগণ এখনও তাঁর পিছনেই আছে। কিন্তু তা আর তিনি দেখাতে পারেন নি।

রায়বেরেলীর নির্বাচনে তিনি হারবেন এটা তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। ওখানকার রিটার্নিং অফিসার বিনোদ মালহোত্রার উপর চাপ সৃষ্টির যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছিল। ওম মেহতা তাঁকে দুবার ফোন করেছিলেন। ধবনও তিনবার ফোন করেছিল। ঐ কেন্দ্রের ভোট যেন দ্বিতীয়বার গোনা হয়। আর কিছু না হোক ঐ কেন্দ্রের ফলাফল যেন দেরীতে ঘোষিত হয়। শ্রীমতী গান্ধী ভেবে ছিলেন কংগ্রেস গরিষ্ঠতা পেলে তিনি কোন উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হয়ে ফিরে আসবেন সংসদে।

কিন্তু জনগণ কংগ্রেসকে চাইলো না। ১৯৭১ সালে কংগ্রেস যেখানে ৩৫০টি আসন পেয়েছিল এবার সেখানে পেল মাত্র ১৫৩টি আসন। জনতা পার্টি ও তার সহযোগী সি এফ ডি পেল ২৯৮টি আসন। উত্তর প্রদেশের ৮৪টির মধ্যে কংগ্রেস একটিও আসন পেল না, বিহার (৫৪), পাঞ্জাব (১৩), হরিয়ানা (১১) এবং দিল্লি (৬) কংগ্রেসকে কোন আসন দিল না। কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশে পেল ১টি, রাজস্থানে ১টি, পশ্চিমবঙ্গে ৩টি, ওড়িশায় ৪টি এবং আসাম ও গুজরাটে দশটি করে।

কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হিসাব। ব্র্যাকেটে ১৯৭১ সালের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হিসাব দেওয়া হল : পশ্চিমবঙ্গ ২৯·৩৯ (২৮·২৩), উত্তরপ্রদেশ ২৫·০৪ (৪৮·৫৬), তামিলনাড়ু ২২·২৮ (.২ ৫১), রাজস্থান ৩০ ৫৬ (৪৫·৯৬), পাঞ্জাব ৩৫·৮৭ (৪৫·৯৬), ওড়িশা ৩৮·১৮ (৩৮·৪৬), মণিপুর ৪৫ ৭১ (৩০·০২), মহারাষ্ট্র ৪৬·৯৩ (৬৩·১৮), মধ্যপ্রদেশ ৩২·৫ (৪৫ ৬), কেরল ২৯·১২ (১৯·৭৫) কর্ণাটক ৫৬·৭৪ (৭০·৮৭), হিমাচল প্রদেশ ৩৮·৩ (৭৫·৭৯), হরিয়ানা ১৭·৯৫ (৫২·৫৬), গুজরাট ৪৬·৯২ (৪৪·৮৫), বিহার ২২·৯০ (৪০·০৬), আসাম ৫০·৫৬ (৫৬·৯৮) এবং অন্ধ্রপ্রদেশ ৫৭·৩৬ (৫৫·৭৩)।

দেখা যাচ্ছে, উত্তরের রাজ্যগুলিতে জনতার বিরাট সাফল্য লাভ হলেও দক্ষিণে তাদের শোচনীয় বিপর্যয় ঘটেছে। এর কারণ হয়তো এই যে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে এমারজেন্সীর দমন পীড়ন বেশী হয় নি, তাই হয়তো জনতা পার্টি বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করতে পারে নি।

ভারতের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং পশ্চিমীতাত্ত্বিকেরা বুঝতেই পারেন নি যে পেটে অন্ন না থাকলেও ভারতের মানুষের কাছে স্বাধীনতা অনেক প্রিয়। একটি ভোটের অমোঘ অস্ত্রে যে তারা অপ্রিয় মানুষকে হটিয়ে দিয়ে পছন্দসই

ব্যক্তিকে ক্ষমতার আসনে বসাতে পারে এবার সেটা তারা দেখিয়ে দিল। স্বৈরতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এই ভাবে তারা তাদের বিচার জানিয়ে দিল।

একটা রসিকতা এই সময় বেশ শোনা যেত—তাহল সঞ্জয় যেখানেই গেছে সেইখানেই কংগ্রেসের পরাজয় হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী এটা মোটেই স্বীকার করতে চান নি। তিনি সব সময়ই সঞ্জয়কে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। ২২ মার্চ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক। প্রথমে তিনি বৈঠকে আসতে চান নি। পরে যখন দেখলেন সকলে তাঁকে চাইছে তখন তিনি এলেন। বৈঠকে যখন সিদ্ধার্থ রায় বংশীলালকে ছয় বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের দাবি জানালেন, তখন ইন্দিরা বলে ওঠেন 'আমাকে বহিষ্কার করুন, আমাকে বহিষ্কার করুন।' তিনি জানতেন ৫, রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডে উপস্থিত কারও এ সাহস নেই যে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলে। এগারো বছর ধরে এই লোকগুলো ইন্দিরার প্রশস্তিতে এবং ইন্দিরার আদেশ পালনেই অভ্যস্ত। সুতরাং এতে বিস্মিত হবার কিছুই ছিল না যে ইন্দিরার নেতৃত্বের প্রতি এই ওয়ার্কিং কমিটি আবার তাদের বিশ্বাস স্থাপন করবেন। ১২ এপ্রিল পর্যন্ত আলোচনা স্থগিত রাখা হল।

এর পরেই শুরু হল টানা পোড়েন। সি, পি, আই পন্থী সমেত দেবকান্ত বড়ুয়া একদিকে, আরেক দিকে শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর সাকরেদরা। ইন্দিরার ওপর থেকে রাগটাকে যাতে অন্য খাতে বইয়ে দেওয়া যায় সেজন্য ইন্দিরা পন্থীরা বড়ুয়ার পদত্যাগ চাইলেন। ওদিকে চন্দ্রজিৎ যাদবের বাড়িতে বসে প্রাক্তন এম-পিদের একটি গোষ্ঠী সঞ্জয়, বংশীলাল, বিদ্যাচরণ শুকলা এবং ওম মেহতার পদত্যাগ চাইলেন। রায়, যাদব এবং তাদের লোকজন বড়ুয়াকে দিয়ে দাবি তুললেন যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও সংসদীয় বোর্ড থেকে বংশীলালকে হটাতে হবে। শ্রীমতী গান্ধী এতে খুব রেগে গেলেন। নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য তাঁর কোন সহযোগীকে পৃথক ভাবে দোষারোপ করা চলবে না এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

সমস্যা গভীর ও জটিল হতে থাকলো। তারপর একদিন শ্রীমতী গান্ধীর বাসভবনে আহূত এক বৈঠকে তিনি নিজেই তাঁর ব্যাগ থেকে বংশীলালের পদত্যাগ পত্র বের করলেন। তার আগে অবশ্য শ্রীমতী গান্ধী সকলকে দিয়ে এই প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ ওয়ার্কিং কমিটিই একযোগে পদত্যাগ করবে।

এটা আর কিছুই নয় পার্টি দখলের একটা অপচেষ্টা মাত্র। চন্দ্রজিৎ যাদব

প্রথম এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তারপর একে একে সবাই এর বিরোধিতা করলেন। ভায়লাব ববি, সিদ্ধার্থ, অ্যান্টনী প্রভৃতি সকলেই বিরোধিতা করলেন। শ্রীমতী গান্ধী এতে হুমকি দিলেন যে তিনি তাহলে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করবেন না। আমার সন্দেহ সৃষ্টি হল পার্টি হয়তো তাহলে ভেঙ্গে যাবে। বড়ুয়া এদিকে ঐ বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীদের ও প্রদেশ কংগ্রেস প্রধানদেরও আমন্ত্রণ জানালেন। শ্রীমতী গান্ধী এই সময় আবার এক চালাকি করলেন। কংগ্রেস সভাপতির কাছে এক চিঠি পাঠিয়ে জানালেন যে নির্বাচনে বিপর্যয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর একার। অন্য কারও নয়।

তিনি লিখলেন, 'সরকারী কাজ কর্মের পরিচালিকা হিসাবে আমি নির্দ্বিধায় একথা স্বীকার করছি যে এই পরাজয়ের জন্য আমিই দায়ী। আমি নিজের দোষের জন্য অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাই না। আমার সঙ্গে এমন কোন কুচক্র নেই, যাকে আমি বাঁচাতে চাই কিম্বা এমন কোন গোষ্ঠী নেই, যার বিরুদ্ধে আমি লড়তে চাই। আমি কখনও গোষ্ঠীনেতা হিসাবে কাজ করি নি।'

১২ এপ্রিল ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ শ্রীমতী গান্ধী অনুপস্থিত। তিনি ছাড়া মিটিং হবে কী করে'—সীতারাম কেশরীর জিজ্ঞাসা। ধীরে ধীরে অন্য সবাই এই মর্মে দাবি করায় বড়ুয়া, চবন এবং কমলাপতি ত্রিপাঠী গাড়ি নিয়ে গেলেন সফদরজং রোডে এবং ইন্দিরাজীকে নিয়ে এলেন। শান্তভাবেই মিটিং চলছিল। হরিয়ানার বনারসী দাসগুপ্ত নীরবতা ভাঙলেন। বংশীলাল দিল্লিতে বসে কী করে রাজ্যের সরকারী কাজকর্ম চালাতেন তার বর্ণনা করলেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর কাজ ছিল কেবল বংশীলালের জন্য জনসভার ভিড় জমা করা। প্রতি জনসভায় এক লাখ লোক জড়ো করতে হত আর প্রতিটি জনসভার ফলে কংগ্রেসের দশ হাজার করে ভোট কমে যেত। কেউ একজন বললো, 'গুপ্তাজী এসব কথা আগে বলেন নি কেন?' তিনি বললেন, 'ভয়ে বলি নি।' বিকেলে বংশীলালকে যখন দল থেকে বিতাড়নের কথা উঠলো তখন ইন্দিরাজী প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু পরের দিন বংশীলালকে ছয় বছরের জন্য দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বিতাড়িত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল। সে বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধী উপস্থিত ছিলেন না। ওম মেহতা সারাদিন সকলের কাছে ধর্ণা দিলেন ক্ষমা পাওয়ার জন্য। সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেননা সে কংগ্রেসের সদস্যই নয়। বলা হয়, শ্রীমতী গান্ধী নিজে বড়ুয়ার কাছে এসেছিলেন এই কথা বলতে যে সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে যেন কিছু করা না হয়। মাঝখান দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী নিজে সদস্যদের ক্রোধের হাত থেকে কেবল

নিষ্কৃতি পেলেন না, তাঁর প্রতি সদস্যরা নেতা হিসাবে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পোষণ করে প্রস্তাবও পাশ করলো।

পূর্ব নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী বড়ুয়ার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হল। অন্তর্বর্তী সভাপতি হলেন স্বরণ সিং। ইন্দিরার এতে মত ছিল না। মে মাসে নির্বাচন হল। ইন্দিরার পছন্দসই ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী ৩১৭ ভোট পেয়ে জিতলেন। সিদ্ধার্থ রায় পেলেন ১৬০ ভোট। রেড্ডীকে জেতানোর ব্যাপারে ইন্দিরাজীকে সাহায্য করলেন মধ্যপ্রদেশের ডি পি মিশ্র। ১৯৬৯ সালে সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়বার সময়ও ইনি ইন্দিরাকে সাহায্য করেছিলেন।

জনতা পার্টিতে এমন কোনও সমস্যা ছিল না। যদিও চার পার্টির মিলনে গঠিত এই পার্টিতে ছোট খাট খুঁত দেখা যাচ্ছিল। নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী মনোনয়নের প্রশ্ন ছিল তাদের সামনে। তিনজন প্রার্থী ছিলেন, মোরারজী, জগজীবনরাম এবং চরণ সিং। এদের মধ্যে প্রথম দুজনের নামই বেশী গুরুত্ব পাচ্ছিল।

জনসঙ্ঘ ও সংগঠন কংগ্রেস মোরারজীর পক্ষে ছিল। সমাজতন্ত্রী ও তরুণ তুর্কীরা জগজীবনরামকে চাইছিল। আর বি এল ডি'র—প্রার্থী ছিলেন চরণ সিং।

নির্বাচনের ব্যাপারটা জে-পির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনের পর তাঁর নেতৃত্ব সকলের সকল প্রশ্নের উর্ধে স্থাপিত হয়। তাঁর সমগ্র বিপ্লবের চিন্তা বাস্তবায়িত হওয়ার পথে এগোতে থাকে। জয়প্রকাশ নিজে এই নেতা-নির্বাচন পর্ব থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। মধু লিমায়ে ও অশোক মেহতাকে তিনি সে কথা জানিয়েও ছিলেন। পরে তিনি আচার্য কৃপালনীর সাহায্য চান।

নব নির্বাচিত এম-পি-জনতা পার্টির ২৭১, সি এফ ডি'র ২৮, মার্কসবাদীদের ২২, আকালীর ৮, পেজ্যান্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টির ৫, রিপাবলিকান পার্টির ২ এবং আরও প্রায় ডজন খানেক এম পিকে ২৪ মার্চ গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশনের বাড়িতে সমবেত হতে বলা হয়। বৈঠক শুরু হবার আগে বি এল ডি নেতা রাজনারায়ণ হাসপাতাল থেকে চরণ সিংয়ের একটি চিঠি আনেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে বি এল ডি প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য মোরারজীকেই সমর্থন করে। চরণ সিং ঐ পদের জন্য প্রার্থী হতে চান না।

একে একে এম পিরা এসে উপস্থিত হতে থাকলেন। ছাপানো ব্যালট পেপার এসেছে। এবার ভোট গ্রহণ শুরু হবে। সেই সময় রাজনারায়ণ প্রস্তাব করলেন নেতা নির্বাচনের বিষয়টা জে-পি'র ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক। মধু লিমায়ে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। জগজীবনরাম ও বহুগুণা হলের বাইরে

চলে গেলেন। তাঁরা ভোটের দ্বারা নেতা নির্বাচন চাইছিলেন। জে-পিও ভোটের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সেই সময় কৃপালনী বললেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মোরারজীর পক্ষেই সংখ্যাধিক্যের সমর্থন আছে। ভোট গ্রহণ স্থগিত হল এবং জে-পি মোরারজীকেই নেতা হিসাবে ঘোষণা করলেন।

২৪ মার্চ মোরারজী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন। এর আগে দু' দু'বার তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন নি। বহুদিন পরে এবার তাঁর স্বপ্ন সফল হল।

এদিকে সি এফ ডি'র জনতা দলে যোগদানের জন্য মন্ত্রিসভা গঠনে কিছুটা বিলম্ব হল। জগজীবনরাম ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী হলে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে পারেন, আবার ঐ পদটি মোরারজী চরণ সিংকে দেবেন বলে স্থির করেছেন। অতঃপর চরণ সিংই বললেন তাঁর ঐ পদের প্রয়োজন নেই। তিনি মন্ত্রিসভায় জগজীবনরামের প্রবেশের পথ প্রশস্ত করে দিলেন।

জগজীবনরাম এবিষয়ে আমাকে বলেছেন যে, মন্ত্রিত্বের জন্য তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন নি। তিনি বলেন, 'মন্ত্রিত্ব থেকে আমাকে কেউ কোনদিন হটাতে চায় নি।' তিনি বলেন যে, তাঁর দল সংসদের ভিতরে জনতাপার্টিকে সমর্থন করবে, তবে বাইরে পৃথক অস্তিত্ব তারা বজায় রাখবে।

স্থির হয় যে মন্ত্রিসভায় প্রধান শরিক দলগুলির দু'জন করে প্রতিনিধি থাকবে। যেমন বি এল ডির চরণ সিং ও রাজনারায়ণ, জনসঙ্ঘের অটলবিহারী বাজপেয়ী ও এল কে আডবনী, সি এফ ডি'র জগজীবনরাম ও বহুগুনা, সংগঠন কংগ্রেসের রামচন্দ্রা ও সিকন্দর বখত, সমাজতন্ত্রীদের জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ও মধু দণ্ডবতে, তরুণ তুর্কীদের মোহন ধারিয়া ও পুরুষোত্তমলাল কৌশিক এবং আকালীদের প্রকাশ সিং বাদল। অর্থাৎ অশুভ সংখ্যা ১৩।

পরে এই তালিকায় আরও ছয়টি নাম যুক্ত হয়। এঁরা হলেন, এইচ এম প্যাটেল, বিজু পট্টনায়েক, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, রবীন্দ্র বর্মা, শান্তিভূষণ এবং নানাজী দেশমুখ। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে জগজীবনরাম মোরারজীকে ফোন করে জানান যে তিনি মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে পারছেন না।

জগজীবনরাম বলেন নতুন যাঁরা এলেন তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর কিছু বলার নেই। তিনি শুধু ক্ষুব্ধ এইজন্য যে প্রার্থীদের সঙ্গে এ বিষয়ে একবার আলোচনা করা হল না কেন। বহুগুনা এবং জগজীবনরাম কেউ-ই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন না। ফার্নাণ্ডেজও শপথ নিলেন না। তিনি জগজীবনরামকে পরিস্থিতি বোঝাবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। নানাজীও জগজীবনের খুব

কাছের মানুষ। তিনিও নিজের পরিবর্তে মন্ত্রিসভায় ব্রিজলাল বর্মাকে দিলেন। বাবুজীকে বোঝাবার তিনিও চেষ্টা করেন। অবশেষে জে-পি এসেই আবার সঙ্কট থেকে সকলকে মুক্ত করলেন। তিনি জগজীবনরামকে বললেন, আপনি একজন ব্যক্তি মাত্র নন, আপনি একটি শক্তির প্রতীক স্বরূপ। আপনার শক্তি ছাড়া নতুন ভারত গড়া যাবে না। তারপর সকলে শপথ নেন।

মন্ত্রিসভা গঠনের নাটক এখানেই শেষ হয়, কিন্তু যবনিকা পাত হয় না। সি এফ ডি'র পক্ষে বার বার এই ধারণাই মনে স্থান পেতে থাকে যে তারা 'পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছে', কেননা জনতার পক্ষ থেকে বার বার 'আদেশ এসেছে।'

কিন্তু এজন্য সরকারী কাজ ব্যাহত হয় নি। কয়েকটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি খুব দ্রুত প্রতিপালিত হয়। যেমন নাগরিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়, বহির্দেশীয় এমারজেন্সী (১৯৭১-এ বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় আরোপিত) বাতিল হয় (উল্লেখযোগ্য অভ্যন্তরীণ এমারজেন্সী কংগ্রেস সরকারই তুলে দিয়ে যায় ২১ মার্চ তারিখে যেদিন তারা দেখে যে বিরোধীরা দুই তৃতীয়াংশের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লোকসভায় পেয়ে গেছে)। আকাশবাণী ও টি-ভি'র জন্য স্বয়ং শাসিত করপোরেশন গঠিত, মিসা বন্দী যারা তখনও জেলে ছিল তাদের মুক্তি দান— আর্থিক অপরাধীরাও এই সুযোগ পায়। প্রথমে নক্সালপন্থীরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। পরে জে-পির হস্তক্ষেপে তারা কিছুটা সফল হয়।

বরোদা ডিনামাইট মামলার প্রধান আসামী ফার্নাণ্ডেজ সম্পর্কে সি বি আই ডিরেক্টর ডি সেন নিজে প্রধানমন্ত্রী মোরারজীকে বলেন, এ মামলায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। ফলে ফার্নাণ্ডেজ ও অন্য ২৪ জনকে এই মামলা থেকে রেহাই দেওয়া হয়।

গত এক দশকে এই প্রথম সর্বাত্মক স্বাধীনতা অর্জন করলো সংবাদপত্রগুলি। এর উপর থেকে সব রকমের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। স্পষ্ট কথা বলতে গেলে বলতে হয় এমারজেন্সীর আগে সংবাদপত্রগুলি যেন সরকারকে খুশী করার দিকেই বেশী নজর দিত। কেননা সরকারের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে, এমন খবর তারা নিজের থেকেই ছাপাতো না।

বিচার বিভাগের উপরও আর চাপ সৃষ্টি করা হয় না। ঘোষণা করা হয়েছে যে যেসব বিচারপতিকে এমারজেন্সীর সময় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে নীচু পদে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে কিম্বা ট্রান্সফার করা হয়েছে, তাদের আবার পূর্বস্থানে ফিরিয়ে আনা হবে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ২৮ মার্চ সংসদের যুক্ত অধিবেশনে

বলেন, এরপরও মৌলিক অধিকারের উপর যদি কোন রকমের নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাহলে জনতা সরকার সেগুলি প্রত্যাহার করে নেবে।

আর এস এস, জামাত-ই-ইসলামী, আনন্দ মার্গ প্রভৃতি সংস্থার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

জনতা সরকার এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে যে যথা শঙ্খ মিসা, আপত্তিজনক বিষয় প্রকাশ নিরোধ আইন, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের জনবিরোধী সংশোধনগুলি —এসবই বাতিল করা হবে।

কংগ্রেসকে এই প্রথম বিরোধী দলের আসনে বসতে হল। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর অনেকদিন পরে স্বাভাবিক অফিসের ন্যায় কাজ শুরু করলো। 'র' কে নিয়ন্ত্রিত করা হল এবং পারিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীতে রূপান্তরিত হল। যেসব অফিসার প্রত্যক্ষভাবে সঞ্জয়ের হাতের পুতুল হয়ে কাজ করছিলেন তাদের সকলকে দিল্লি থেকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হল।

অপরদিকে এমারজেন্সীর নায়ক নায়িকারা কিন্তু ভুল স্বীকার করতে রাজী নন। শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বাস করেন নির্বাচনের সময়টা একটু এদিক ওদিক হয়ে গেল তাই এত পরাজয়। তাছাড়া সংবাদপত্র অত্যাচারের কাহিনী বড্ড বেশী অতিরঞ্জিত করে ছেপেছে বলে এত হার হয়েছে এমন কথাও তিনি বিশ্বাস করেন। সঞ্জয় রাজনীতি থেকে অবসর নিতে চেয়েছে, কিন্তু মনে মনে তার আশা যে এক বছরের মধ্যেই সে এবং তার গোষ্ঠী আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে। সঞ্জয় বলেছে, মোরারজী যে প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছেন এটা জনতার পক্ষে ভাগ্যের কথা। জগজীবন প্রধানমন্ত্রী হলে অবস্থার আরও অবনতি হত। অম্বিকা সোনী যুব কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং প্রকাশ্যে সঞ্জয়ের সমালোচনা করেন। ধবন আগেই তার পদত্যাগপত্র পেশ করে ছিল। সে বলেছে সে কোন অন্যায় করে নি এবং তদন্ত হলে তাকে স্বাগত জানিয়েছে। ইউনুস বলেছেন সে দিনের আর বেশী দেরী নেই যখন আমরা আবার ফিরে আসবো। শ্রীমতী গান্ধী চলে গেছেন উইলিংডন ক্রিসেন্টে— দিল্লির উপকণ্ঠে এক বাসভবনে। বংশীলাল বলেছেন, 'তাদের চক্রান্তে' পড়ে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। ওম মেহতা এমন আচরণ শুরু করেছেন যেন এমারজেন্সী বলে কিছু হয়ই নি। বিদ্যাচরণ শুক্লা এখনও নিজের স্টাইলে আছেন। সিদ্ধার্থও কোনপ্রকার অনুশোচনা করেন নি। ইন্দিরার শিবির ছেড়ে দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন যে, এমারজেন্সী বা উনিশ মাসের এই অত্যাচারের সঙ্গে তাঁর কোনই সম্পর্ক ছিল না। শুধুমাত্র

শ্রীমতী গান্ধী ও ধবন ছাড়া সকলেই সঞ্জয়কে দোষারোপ করেছে। শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিরাও সঞ্জয় সম্বন্ধে বলেছেন, 'সেই ছিল আসল খলনায়ক।' এমারজেন্সীর সমর্থক সি পি আই—যারা লোকসভায় মাত্র সাতটি আসন পেয়েছে তারাও 'সঞ্জয় ও তার কুচক্রের' বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে।

যাই হোক এ সবই হল অতীতের কথা, এখন চারদিকে কেবল আনন্দ আর আনন্দ। আকাশে বাতাসে স্বাধীনতার স্পর্শ। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটায় যেমন আনন্দ পাওয়া গিয়েছিল, এবারকার আনন্দ তার যে কিছু পৃথক ছিল।

জনতা সি এফ ডি সরকার এই পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করে যে সব রাজ্যে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে, সেখানে আবার বিধানসভার জন্য নির্বাচনের কথা বলেছে। এই রাজ্যগুলি হল ইউ পি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ। বিরোধী কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা চবনের কাছে এজন্য সহযোগিতা চাওয়া হয়। কেননা বিধান-সভাগুলির আয়ু পুনরায় পাঁচ বছর করার জন্য আবার সংবিধান সংশোধন প্রয়োজন এবং সেজন্য প্রয়োজন দুই তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ওদিকে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই চবনের কাছে সহযোগিতা চাওয়া যাতে সংশ্লিষ্ট সংশোধনটি তাঁরা সমর্থন করেন। চবন সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

তিনি প্রথমে জনতা সরকারের প্রস্তাব ততটা খতিয়ে দেখেন নি। তা ছাড়া জনতা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার কথা তিনি অপর কারো সঙ্গে পরামর্শ করেও বলেন নি। ফলে পার্টির লোকেরা চেপে ধরলে, তিনি বলেন যে, তিনি কেবল বিলটি উত্থাপনের ব্যাপারে সহযোগিতা করার কথা বলেন।

জনতার পক্ষে সমস্যা জটিল হয়ে দাঁড়ায়। কেননা ১২ আগস্টের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পর্ব সমাধা করতেই হবে, তার আগে বিধানসভাগুলির নির্বাচন না করা গেলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থাও করা যাবে না। অবশেষে তারা স্থির করলেন যে 'এমারজেন্সী পাওয়ার্স'-এর সুযোগ গ্রহণ করেই রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে বিধানসভাগুলি ভেঙ্গে দেবেন এবং নতুন করে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করবেন, যদি না কংগ্রেস এই বিল পাশের ব্যাপারে সাহায্য করে। এ নিয়ে খুব উত্তপ্ত আলোচনা চলে। শেষ পর্যন্ত ১৮ এপ্রিল বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার কেবিনেট সিদ্ধান্তের কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন। যে নয়টি রাজ্য বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয় সেগুলি হল—

বিহার, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, ইউ পি ও পশ্চিমবঙ্গ। চরণ সিং বললেন, যেহেতু লোকসভা নির্বাচনে এই রাজ্যগুলির মানুষ কংগ্রেসকে বর্জন করেছে সেই হেতু ঐ রাজ্যগুলিতে শাসন ক্ষমতায় কংগ্রেসের থাকায় আর কোন অধিকার নেই।

এই আদর্শগত চ্যালেঞ্জ ছাড়াও যে সব সরকার এমারজেন্সী চলা কালে বিনা বিচারে সমালোচকদের কারাগারের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করেছে, তাদের উপর চালিয়েছে অকথ্য অত্যাচার—কী অধিকার আছে সেই লোকগুলোর গদী আঁকড়ে থাকার?

তবে চরণ সিং একটু অন্য পথে গিয়ে সাংবিধানিক জালে জড়িয়ে পড়েন। সেজন্য জে-পি পর্যন্ত বলেছিলেন যে, যে বিধান সভাগুলির পাঁচ বছরের আয়ু শেষ হয়নি সেগুলি ভেঙ্গে দেওয়া উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর মনে উত্তর প্রদেশ ও ওড়িশার কথাই ছিল। অন্যতম প্রবীণ মন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও (পররাষ্ট্র মন্ত্রী) প্রধানমন্ত্রী মোরারজীকে চিঠি লিখে জানান, নয়টার মধ্যে সাতটা বিধানসভা ভেঙ্গে দিলেই উচিত কাজ হবে। এই প্রসঙ্গে জনতা সরকারের যে সমালোচনা হচ্ছিল তাতেও বাজপেয়ী বিশেষ চিন্তিত ছিলেন।

কয়েকটি রাজ্য এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে ইনজাংশন চেয়ে আবেদন করেন। ২৪ এপ্রিল সুপ্রীম কোর্ট তাদের আবেদন নাকচ করে দেন। কিন্তু নাটক এখানেই শেষ হয় না। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জাত্তি বিধান সভা বাতিলের আদেশ পত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন। ইন্দিরা দূরে বসে নাটক দেখছিলেন। খবরের মাধ্যমে যশপাল কাপুর যখন জানান যে জাত্তি ইচ্ছা করলে বিধানসভা বাতিলের আদেশ আটকে দিতে পারেন তখন তাঁরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। শ্রীমতী গান্ধী এবং চবন ফোনে জাত্তির সঙ্গে কথা বলেন। জাত্তি নিমন্ত্রণ পত্র দেবার অজুহাতে গোখলের সঙ্গে দেখা করেন এবং এর আইনগত খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ করেন।

জাত্তি নিজের যুক্তিতে অটল। তাঁর সঙ্গে কোন কথাই আর চলে না। চরণ সিং, শান্তিভূষণ সমেত আরও অনেক মন্ত্রী চেষ্টা করে বিফল হলেন, তাঁকে বোঝানো গেল না। এমন কি তাঁকে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি করার টোপ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তা গিললেন না। মোরারজী এবং জগজীবন রাম দেখলেন এর পর আবার জনতার আদালতে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এই প্রশ্নে তাঁরা আবার লোকসভা নির্বাচন চাইছিলেন।

কিন্তু জাত্তির মাথায় অন্য প্ল্যান ছিল। তিনি মনে মনে ঠিক করে

রেখেছিলেন যে, জনতা সি এফ ডি সরকার পদত্যাগ করলেই তিনি কংগ্রেসও তার নেতৃত্বদের সরকার গঠন করার জন্য ডাকবেন। ফার্নাণ্ডেজ এই চক্রান্তের গন্ধ পেয়েই সচকিত হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, সরকারের কোন মতেই পদত্যাগ করা চলবে না। কেননা জাত্তির মাথায় আছে অন্য পরিকল্পনা। জাত্তির ব্যবহারে প্রত্যেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন। প্রত্যেকে দেখলেন যে, এমন ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে।

কেবিনেট বৈঠক বসলো। গভীর চিন্তার পর তাঁরা কংগ্রেসের সেই বিসদৃশ আইনটির সাহায্য নেবার কথা স্থির করলেন যার নাম ৪২তম সংশোধন। ঐ সংশোধন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য এবং তিনি যদি তা না করেন তাহলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। কেবিনেট মিটিংয়ে একটি চিঠি তৈরী করা হল। তাতে ঐ ৪২তম সংশোধনের বিষয়টিও উল্লেখ করে দেওয়া হল।

কেবিনেট সেক্রেটারী ঐ চিঠি নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে গেলেন। রাষ্ট্রপতি ভয় পেয়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া সংক্রান্ত আদেশ পত্রে স্বাক্ষর দিলেন।

৩০ এপ্রিল ঐ আদেশ জারি করা হল। ভেঙ্গে দেওয়া নটি রাজ্য বিধান-সভার জন্য দ্রুত নির্বাচনের দিন স্থির করতে নির্বাচন কমিশনারকে বলা হল। কংগ্রেস একে 'স্বৈরতান্ত্রিক কাজ' আখ্যা দিলেও বাকী সকলে একে স্বাগত জানালো।

সই করার ব্যাপারে জাত্তির টালবাহানাতে জগজীবন রাম দেখলেন সি এফ ডির পক্ষে আলাদা অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখা উচিত হবে না। তিনি জানতেন সি এফ ডিও জনতার মধ্যে সমঝোতা বা মিলন না হলে ইউ পি বিহারে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হবে। সি এফ ডিকে জনতার মধ্যে মিশিয়ে দিলেন। তবে এর পিছনে জগজীবন রামের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তাহল তিনি তাহলে জনতা পার্টির প্রধান হতে পারবেন। কেননা বি এল ডির কেউ জনতার প্রধান হোক এটা তিনি চাইছিলেন না। পরে অবশ্য পরিষ্কার চরিত্রের লোক চন্দ্রশেখর জনতা পার্টির প্রেসিডেন্ট হন সকলের সম্মতিতে।

এখন জনতা সি এফ ডি একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি। যদিও এরজন্য এক মাসের উপর সময় লেগে গেল, তবু একে একটা সুন্দর উদাহরণ হিসাবে সকলে প্রশংসা করলো।

কিন্তু এর পরেই যা ঘটলো লোকে তা মোটেই আশা করে নি। বিধান

সভা নির্বাচনের জন্য টিকিট বণ্টনে গণ্ডগোল, দলত্যাগীদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া তার চেয়েও খারাপ হল কালবাজারী মন্ত্রণ, হীন স্তাবক, বাস্তু ঘুঘু জনতার গুরুত্বপূর্ণ পদে কী করে চলে এল এটা কেউ ভেবে পেল না। কংগ্রেস যে ভাবে করতো ঠিক সেই ভাবেই শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থার কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হতে থাকলো। আমলারা সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করলো। কি করে এ সব হচ্ছে লোকে তো বিস্ময়ে হতবাক।

জে-পিই একমাত্র আশার স্থল। তিনি গ্রাম পর্যায় থেকে নয়াদিল্লি পর্যন্ত জনতা কমিটি গঠনের কথা বলেছেন—যারা প্রহরী হিসাবে কাজ করবে। কোন সরকারকে এই ধরনের প্রহরী পছন্দ করবে? সাধারণ মানুষের সামনে আজ সেটাই বড় প্রশ্ন।

জনতা পার্টি দেশের নৈতিকবোধকে উপরে তুলেছে। বহু বছর পর দেশে আবার আদর্শের কথা হচ্ছে শ্রীমতী গান্ধী যা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। জনতা যা করছে তাকে জনসাধারণ সমর্থন করে না এমন নয়। জনসাধারণ চিন্তিত এইজন্য যে প্রথম দিকে জনতা যে আদর্শের ও নৈতিকতার কথা বলেছে তা যেন শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে।

তারা আনন্দিত যে সর্বব্যাপী ভয়ের রাজত্ব সমাপ্ত হয়েছে। পুলিশের ভয়, গোয়েন্দাদের ভয়, সরকারী অফিসারদের ভয়, দমনমূলক আইনের ভয়, বিনা বিচারে আটক থাকার ভয়।

তারা এই জন্যও আনন্দিত যে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিও শাস্তির হাত থেকে নিস্তার পান না। শ্রীমতী গান্ধীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং এ সম্পর্কে তদন্ত কমিশন বসেছে। প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তিও দেওয়া হবে।

তারা কিন্তু এই সঙ্গে এ বিষয়েও সচেতন যে আবার যেন ঐ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি না হয়। ভবিষ্যতের জন্য এটা যেন একটা শিক্ষা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের মধ্যে আর্থিক বিষয়ের সংযোগ ঘটিয়ে সেই মহান সমাজ গঠন করা হয়তো সম্ভব যা হয়তো পৃথিবীকে একটা নতুন রাস্তা দেখাবে।

তারা চায় না যে জনতা কংগ্রেসের পথ গ্রহণ করুক। অথবা জনতা নেতারা ক্ষমতার গদীতে এমনভাবে ডুবুক যেখানে তাদের পূর্বসূরীদের সঙ্গে তাঁদের চেহারারও অদ্ভুত মিল ঘটে যায়। লোকের সামনে আদর্শের প্রশ্নটাই বড়। তারা জানে যে, সমঝোতা অনেক সময় আদর্শের বড়প্রাণী শিকারের চেয়ে

বেশী ফলপ্রসূ। কিন্তু কতকগুলি জিনিস যা জনতা নিজস্ব হিসাবে চিহ্নিত হবে তা যেন কখনই পরিবর্তিত না হয়।

কোন লোকই এটা আশা করে না যে বছরের পর বছর ধরে যে পাপ জমা হয়েছে তা দুই অথবা তিন মাসে শেষ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে জনতা ঐ বিরাট কাজ করার পথে পা বাড়িয়েছে তা সাধারণ মানুষকে এখন থেকেই হতাশ করে তুলেছে।

লোকে কংগ্রেসকে নাকচ করেছে যে কংগ্রেস এখনও সেই পুরনো কুচক্রকে আঁকড়ে পড়ে আছে। এক্ষেত্রে জনতাও যদি তাদের হতাশ করে তাহলে তারা কি করবে?

তারা অপেক্ষা করতে রাজি আছে। তারা মনে করে এত শীঘ্র আশা ত্যাগ করা উচিত হবে না, এবং এত শীঘ্র তাদের বিচার জানিয়ে দেওয়াটাও উচিত হবে না।

-শেষ-